আঁধারের যাত্রী

শরীফুল হাসান

অচেনা একটি ফোন কল পেয়ে দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরতে হলো তুষারকে, দেখা হলো পুরনো বন্ধুদের সাথে, জানা গেল অচেনা নাম্বার থেকে ফোন কল তারাও পেয়েছে। তারপর এক এক করে খুন হতে লাগল বন্ধুরা। কোথাও কোন ক্লু নেই, নেই কোন মোটিভ। এদিকে দূর্ঘটনায় মারা গেল দেশসেরা এক লেখক। দিশেহারা হয়ে পড়ল হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। আবু জামশেদ তার নতুন যোগ দেয়া সহকারিদের নিয়ে নেমে পড়ে মাঠে। হার না মানা জামশেদ দিশেহারা, এই কেসের উপর নির্ভর করছে পুরো ডিপার্টমেন্টের ভবিষ্যত, তার দীর্ঘদিনের সুনাম।

বন্ধুত্ব, প্রেম, ঘৃনা আর প্রতিশোধের গল্প নিয়ে *সাম্ভালা* ট্রিলজিখ্যাত শরীফুল হাসানের উপন্যাস *আঁধারের যাত্রী*।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872990-9

9 789848 729908

শরীফুল হাসানের জন্ম ময়মনসিংহে, বেড়ে ওঠাও সেখানেই, পরবর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তিনি।

শুরুটা অনুবাদ-সাহিত্য দিয়ে হলেও তার প্রথম মৌলিক উপন্যাস *সাম্ভালা* পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তিতে তা ভারত থেকেও ইংরেজিতে অনূদিত হয়। *সাম্ভালা* ট্রিলজির বাকি দুটো উপন্যাস হচ্ছে *সাম্ভালা দ্বিতীয় যাত্রা* ও *সাম্ভালা শেষযাত্রা*। এছাড়াও গতবছর প্রকাশ হয় *ঋভু* নামে একটি উপন্যাস।
তার কিছু গল্প বিভিন্ন সংকলনে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *থৃলার গল্পসংকলন* ১, ২ ও ৩ উল্লেখযোগ্য।

Facebook: https://www.facebook.com/shariful.hasan

আঁধারের যাত্রী

আঁধারের যাত্রী

শরীফুল হাসান

বাতিঘর প্রকাশনী

আঁধারের যাত্রী

শরীফুল হাসান

Andharer Jatri

Copyright©2016 by Shariful Hasan

স্বত্ব © নিপা হাসান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, কম্পোজ : লেখক

মূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সেইসব বন্ধুদের, যাদের সাথে কথা হয় না, দেখা হয় না।

নিশাত আনোয়ার চৌধুরি, মোঃ হাবিবুর রহমান, রাশেদ হাসান, উক্য সিং মারমা, লাসা থোয়াই চাক, প্রদীপ বিশ্বাস, এরশাদুল ইসলাম, ফিরোজ হোসেন, জাহিদ পারভেজ, সাজিদ ওয়াশিক এবং সাইফুল ইসলামকে...

বর্তমান

রাত হলেই যে ঘুমাতে হবে এমন কোন কথা নেই, রাতেই অনেক রহস্যের সূচনা, অনেক রহস্যের অবসানও হয় রাতে। ঘোর লাগা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে যতোদূর যাওয়া যায়, যায় সে, যেতে ভালো লাগে। অন্ধকার মানেই সুখ, নিষিদ্ধ সুখ, এই সুখ উপভোগ করতে হয় তারিয়ে তারিয়ে।

গভীর রাতে ঢাকার রাজপথে তেমন কেউ হাঁটে না, যারা হাঁটে তাদের ভালো চোখে দেখা হয় না। চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারি, নেশাখোর আর পাগল ছাড়া কে রাতে ঘর থেকে বেরুয়! অথচ সে এগুলোর কোনটাই নয়। রাতে ঘুরতে তার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, পুলিশ তাকে কিছু বলে না, কেন বলে না সেটা কোন রহস্য নয়, পুলিশের মুখ বন্ধ করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি তার মাথায় সবসময়ই বিদ্যমান।

যাই হোক, আজ রাতে যে এলাকায় হাঁটছে সে জায়গাটা শহরের অভিজাত এলাকা। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো আকাশের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে যেন। দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙটার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। গেটে চমৎকার পাহারার ব্যবস্থা। এমনকি সিসি ক্যামেরাও বসানো একপাশে, নিজেকে যতোটা সম্ভব ক্যামেরার আওতা দেখে দূরে রেখে দশতলার ডানদিকের ফ্ল্যাটটার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। সবগুলো রুমের বাতি জ্বলছে, দারুন মচ্ছব হচ্ছে নিশ্চয়ই।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল, চাঁদের আলোয় কাগজে লেখা নাম্বারগুলো পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা নাম্বার, মোবাইল ফোন বের করে প্রথম নাম্বারটায় ডায়াল করলো। ফোন রিসিভ করবে কি না জানে না, তবে কাজ শুরু করার সময় হয়ে গেছে।

চৌদ্দ বছর আগে

দৃশ্যটা ভয়াবহ, ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠে আক্কাস, কোন কুক্ষনে যে বের হয়েছিল মাছ ধরতে!

বাসায় বৌ নেই, ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে, কবে আসবে জানা নেই, আদৌ আসবে কি না তারও ঠিকঠিকানা নেই। বৌকে ফিরিয়ে আনার কোন তাগাদা অনুভব করে নি, বরং আগামি কয়েকদিন ভালো কাটবে, কথায় কথায় খোঁটা শুনতে হবে না, এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। তবে সমস্যা একটাই, আনন্দ একা একা করা যায় না। বন্ধু-বান্ধব সবাই বিবাহিত, বাচ্চা-কাচ্চার বাপ, সবাই তার মতো ঘুরে-ফিরে সময় কাটায় না।

কোন কাজ নেই, অঢেল সময় হাতে, অথচ বন্ধু-বান্ধবদেরও কাছে পাওয়ার উপায় নেই, সবাই ব্যস্ত। একটু আড্ডা দেয়া, দু'দান তাশ খেলা কিংবা রাত-বিরেতে মাছ ধরতে যাওয়ার সঙ্গিই পাচ্ছিল না সে। সন্ধ্যার দিকে মনটা খারাপ ছিল, তাই রাতের খাবারটা পাশের রহমানিয়া হোটেলে সেরে ন'টার একটু পরপর বেরিয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা।

মাছ ধরা আক্কাসের নেশা, সেই ছোটবেলা থেকেই, বাবারও একই নেশা ছিল, গভীর রাতে মাছ ধরতে বের হতো, দু'একবার আক্কাসও সাথী হয়েছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা ছিপ ফেলে বসে থাকার মধ্যে যে কী আনন্দ আর সুখ, তা সে ছোটবেলাতেই উপলব্ধি করেছিল।

বয়স ত্রিশ পার হয়েছে বেশ আগে, শুকনো পটকা আক্কাসের চুল নিয়ে বেশ বাতিক আছে, চুল সবসময় তেল চুপচুপে হওয়া চাই, জুলফি আর গোঁফের যত্ন নিতেও সে ভালোবাসে। এমনিতে সবসময় ফিটফাট থাকলেও মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ঝামেলা এড়াতে সদ্য ধোঁয়া সাদা লুঙি আর একটা শার্ট পরে নিল।

এখন আশপাশে বিল-পুকুর নেই যেখানে মাছ ধরা যাবে, একটা নদী আছে, তবে অনেকটা পথ যেতে হয়। তাতেও আপত্তি নেই আক্কাসের, বাসায় একা একা বসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে ছিপ ফেলে তাজা মাছ ধরা অনেক আনন্দের।

রাত ন'টার পরপর বেরিয়ে পড়েছিল আক্কাস, সাথে মাছ ধরার কিছু সরঞ্জাম, একটা ছাতা, পাউরুটি, ফ্লাস্কে করে চা, এক প্যাকেট সিগারেট। নদীর পাড়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে আরাম করে বসল, আশপাশে তাকাল, অনেকসময় তার মতো মৎস শিকারি কয়েকজনকে চোখে পড়ে, তবে আজ রাতে আর কেউ নেই। একা একাই সময় কাটবে। ছাতাটা একপাশে ভাজ করে রাখতে গিয়েই টের পেল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই, প্রকৃতির এমন অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হলো আক্কাস,

সিগারেটের প্যাকেটটা একটা পলিথিনে মুড়িয়ে রাখল, মাথার উপর কায়দা করে ছাতাটা মেলে ধরল।

এই অসময়ের বৃষ্টি বেশিক্ষন থাকবে না, মাঝখান থেকে নদীর পাড়টাকে কাদা কাদা করে রেখে যাবে। ঢাল বেয়ে উপরে উঠাও কঠিন হয়ে যাবে।

একটু আগে শুধু জোনাকির মিটিমিটি আলো চোখে পড়ছিল, বৃষ্টি শুরু হওয়াতে ওরাও আশ্রয় নিয়েছে কোথাও সম্ভবত, এখন চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। নদীর ঢালটা ঝোপঝাড়ে ভরা, সাপ-খোপের ভয় আছে। গত বছর একজনকে সাপে কামড়ে ছিল। ভোরের আগে এখান থেকে উঠবে না বলে ঠিক করল আক্কাস।

জায়গাটা এখন শুনশান, নদীর ঢাল সংলগ্ন হাইওয়ে, এমনিতে সারাদিন বাস-ট্রাক চললেও আজকে যেন যানবাহনের শব্দও পাচ্ছিল না আক্কাস। পুরো পৃথিবী যেন চুপ মেরে গেছে, শুধু আছে বৃষ্টির গুনগুন শব্দ, শুরুতে মনে হয়েছিল অল্পতেই থেমে যাবে, কিন্তু বৃষ্টির বেগ বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে এবং এই প্রথম আজ রাতে মাছ ধরতে আসাটা বোকামি হয়েছে বলে মনে করতে লাগল আক্কাস। একটা সিগারেট ধরাল কোনমতে, গুনগুন করতে করতে বরশিতে চারা বসিয়ে নদীতে ছিপ ফেলল।

এখন অপেক্ষার পালা, ধৈর্যের পরীক্ষা।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, সিগারেট শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, বরশিতে এখন পর্যন্ত একটা টোকাও পড়েনি। চোখ বন্ধ করে নিজের কথা ভাবছিল আক্কাস, বয়স ত্রিশ পার হয়েছে, অথচ জীবনে মাছ ধরা, তাশ খেলা, আড্ডা মারা ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। জীবনধারনের মতো টাকা আয় হয়, বেশ কয়েকটা দোকান আছে বাজারে, ওগুলো থেকে ভাড়া তুলেই চলে যায়, নিজের চেষ্টায় কিছু করার তাগিদ এখন পর্যন্ত অনুভব করে নি, আর ঠিক এ ব্যাপারটা নিয়েই বৌয়ের সাথে ঝগড়া। চলার মতো টাকা যেখন আসছে তখন কষ্ট করে আয়-রোজগার বাড়াতে যাওয়ার মানে নেই।

এসব অপ্রিয় চিন্তা বাদ দিয়ে আরেকটা সিগারেট শেষ করল আক্কাস, প্রায় ঘন্টা দুয়েকের বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছে, অথচ মাছের দেখা নেই। সব মাছ পালিয়েছে, যেভাবে নদীর আশপাশে ফ্যাক্টরিগুলো হচ্ছে, তাতে ওদের শ্বাস নেয়ার জায়গাও নেই, পানি অনেক জায়গায় কালো আর ঘোলাটে।

ছিপটা কোনমতে ধরে রেখে ঝিমুচ্ছিল আক্কাস, বৃষ্টির মধ্যে কোন মানুষ এভাবে বসে বসে ঝিমাতে পারে তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। হঠাৎ বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো, দারুন এক আতংক ভর করল, কারন শব্দটা আসলে বজ্রপাতের নয়, গুলির শব্দ, এতো রাতে এখানে গুলির শব্দ আসবে কোত্থেকে? ঢালের উপর দিকে তাকাল, কিছুক্ষন আগেও অন্ধকার ছিল, এখন মনে হচ্ছে কোন একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, হেডলাইটের আলো ঝাপসা দেখাচ্ছিল

নীচ থেকে। দুজন মানুষ ঢালের ঠিক কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে, লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, পরনে শার্ট-প্যান্ট।

হঠাৎ মনে হলো ঢাল বেয়ে কিছু একটা নেমে আসছে হুড়মুড় করে। ছিপটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আক্কাস, ভয়ে গায়ের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে গেছে। ধুপধাপ শব্দ করে পাঁচ-ছয়ফুট দূরে যে জিনিসটা নীচে এসে পড়ল তা আর কিছু নয়, একজন মানুষ। এক দেখাতেই বুঝে গেছে মানুষটা জীবিত নয়, টর্চের আলো ফেলল মানুষটার মুখ বরাবর, মুখটা একদম থেতলে গেছে, ডান হাতটা ভাঙা, সাদা হাড় বেরিয়ে আছে একপাশ দিয়ে।

এরকম একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না আক্কাস, সবকিছু ফেলে দিয়ে ঢালের উপরে উঠার জন্য দৌড় দিল। ঢালটা বেশ খাড়া, এছাড়া ঝোপ-ঝাড় আছে, সাপ-খোপের ভয় আছে, কিন্তু আতংকিত আক্কাসের এসব কিছুই মাথায় নেই, সবকিছু ফেলে দিয়ে হাচড়ে পাচড়ে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এলো।

রাস্তা একদম ফাঁকা, কোন গাড়ি নেই, জনমানবের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একটু আগে ঢালের কিনারে দাঁড়ানো লোক দুজন এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে হাওয়া হয়ে গেল বুঝতে পারল না। পুলিশে খবর দেয়া ঠিক হবে কি না ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকল আক্কাস, বৃষ্টি এখনো পড়ছে, পুরোপুরি ভিজে গেছে, প্রায় মাইলখানেক হাটার পর পুলিশের একটা টহল গাড়ি চোখে পড়ল, হাত দেখিয়ে ওদের থামাল।

*

থানায় একটা রুমে বসিয়ে রাখা হয়েছে আক্কাস আলীকে। একজন তরুন অফিসার এসে তার জবানবন্দি নিয়ে গেছে একটু আগে। বৃষ্টিতে ভিজে এরমধ্যেই ঠান্ডা লেগে গেছে, কাল সকালেই শশুড়বাড়িতে গিয়ে বৌকে নিয়ে আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। একা একা থাকলেই সমস্যা, মাথায় শুধু কু-চিন্তা ঘোরাঘুরি করে। কাল রাতে বৌ বাড়ি থাকলে নিশ্চয়ই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়তো না সে।

তরুন অফিসার চিন্তিত চেহারায় এসে বসল তার সামনে। বুকের নেমপ্লেটটা পড়ল আক্কাস, 'আবু জামশেদ।'

"লাশের বুকে বুলেটের চিহ্ন আছে, আপনি কোন গুলির শব্দ পেয়েছিলেন?"

"জি, না," আক্কাস আলী বলল, যতো তাড়াতাড়ি হয় ঝামেলা থেকে মুক্তি চায়, একবার পুলিশের চক্করে পড়লে তা থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল, অবশ্য চক্করে সে পড়েই গেছে, এরা সহজে তাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

"লাশের চেহারা চেনা মুশকিল, আমরা কাল পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেব," আবু জামশেদ বলল।

উত্তরে বোকার মতো হাসল আক্কাস আলী।

"আগামি একমাস অন্তত আমাদের নজরে থাকবেন আপনি, শহর ছেড়ে কোথাও যাবেন না, গেলেও আমাদের জানিয়ে যাবেন।"

"জি, আচ্ছা।"

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে থানা থেকে বেরিয়ে এলো আক্কাস আলী। আগামি একমাস বাসা থেকেই বের হবে না বলে ঠিক করল, চোখ বন্ধ করলে এখনো মানুষটার থেতলে চাওয়া চেহারাটা চোখে ভাসে।

মৃতদেহের কিছু ছবি তোলা হয়েছে পত্রিকায় দেয়ার জন্য, থানার ফটোগ্রাফারের বাসায় ডার্করুম আছে, সেখানে ছবিগুলো ওয়াশ করে একটু পরে আবু জামশেদের হাতে দিয়ে যাবে। অবশ্য ছবি দিয়ে লাভ হবে না, পরিচয় যাতে বের করা না যায়, সেজন্য মুখ থেতলে ফেলা হয়েছে, পত্রিকার মৃতদেহের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যায়, দেখা যাক কোন প্রতিক্রিয়া আসে কি না। নিজের চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল আবু জামশেদ। মৃত ব্যক্তির বয়স সম্ভবত পঞ্চাশের কিছু উপরে, মাথায় চুল কম, তারমধ্যে বেশিরভাগই পাকা, পরনে খুব সাধারন শার্ট-প্যান্ট, টাকা-পয়সা কিংবা ম্যানিব্যাগ পাওয়া যায়নি সাথে। ম্যানিব্যাগসহ অন্যান্য কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, এই কেসটার কোন সুরাহা হবে না। খুব সাধারন একটা সড়ক দূর্ঘটনার কেস হওয়ার কথা এই কেসটার, তবে লাশের বুকে বুলেটের চিহ্ন ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছে।

পরপর দুদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার পরও যখন কেউ কেউ লাশ নিতে এলো না, ময়না তদন্ত করতে বলা হলো। বুলেট উদ্ধার করা হলো মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে, একটাই, খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।

একটা অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হলো, আঞ্জুমান মফিদুলের মাধ্যমে লাশ দাফন করা হলো আজিমপুর গোরস্থানে। আবু জামশেদ কেসটা নিয়ে কাজ করছিল, তবে কিছুদিনের মধ্যেই বদলি হয়ে গেল পার্বত্য এলাকায়, টাকা-পয়সা লেনদেনে খুব বেশি অনাগ্রহ থাকায় এই বদলি। ফলে থানায় হাজার হাজার ফাইলের মাঝে অমিমাংসিত একটা কেস হিসেবে ফাইল বন্দি হয়ে রইল কেসটা।

অমিমাংসিত ফাইলগুলোর একটা হিসেবে প্রায় চৌদ্দ বছর পর ফাইলটা পাঠানো হলো নতুন এক ডিপার্টমেন্টে, নাম হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। সেখানে যোগ দিয়েছে আবু জামশেদ, এখন আর সে তরুন পুলিশ অফিসার নয়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বদমেজাজি, রগচটা হিসেবে ডিপার্টমেন্টে দারুন সুখ্যাতি (!) আছে তার।

তবে আপাতত অমিমাংসিত ফাইল নিয়ে ব্যস্ত নয় আবু জামশেদ। তার ব্যস্ততা ডিপার্টমেন্টকে নতুন করে সাজানোর কাজে। কোন কেস আর অমিমাংসিত থাকবে না, নিজের কাছে তার প্রতিজ্ঞা এতোটুকুই।

অধ্যায় ১

বর্তমান

ড্রইং রুমের একপাশে কিং সাইজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে আজমল চৌধুরি, বয়স সাইত্রিশ-আটত্রিশের কাছাকাছি, মাথার চুল কালো কুচকুচে, ব্যাকব্রাশ করে রাখে, গত দু'বছর হলো মাঝখানে পাতলা হতে শুরু করেছে, চেহারায় কেমন বুড়োটেভাব চলে এসেছে, গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, মুখটা গোলগাল, চোখের নীচটা ফোলা, স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভালো ছিল, এখন আরো ভালো হয়েছে, লম্বায় সে গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে এগিয়ে আছে, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, তবে, সবকিছুর পরও নিজের মাঝে পুরানো টগবগে ভাবটা আর খুঁজে পায় না। সেই আবেগের খোঁজেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করার চেষ্টা চলে, তবে তাতে ইদানিং কোন মজা পাচ্ছে না। বরং জীবনটা দিনদিন বিস্বাদ হয়ে আসছে।

তার রাত জাগার অভ্যাস, বাসায় কখনো ফেরে, কখনো ফেরে না, আজ ফেরার ইচ্ছে থাকলেও খুব বেশি ড্রিংকস করা হয়ে গেছে, এই অবস্থায় বাসায় গেলে নিলুফারের সাথে ঝগড়া হবেই, বিয়ের এতো বছর পরও স্বামির এইসব কার্যকলাপ মেনে নিতে পারে নি, কখনো পারবে বলে মনেও হয় না। এ নিয়ে মোটেও আপত্তি নেই আজমলের, এক নিলুফারকে নিয়ে তার জীবন কাটছে না, টাকা-পয়সার অভাব নেই, নিজের জীবনে কোন ধরনের অপূর্নতা রাখতে রাজি নয় সে।

রাত একটার পর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কমতে শুরু করল, গুলশানের এই ফ্ল্যাটটা নিজের আনন্দ-উৎসবের জন্যই রেখেছে আজমল। সপ্তাহে দুদিন নিয়ম করে এখানে পার্টি হয়, অনেক উচু শ্রেনীর ভন্ডরা আসে, ফ্রি খেয়ে যায়, হৈ-চৈ করে, ফষ্টিনষ্টি করে। এটাকে আনন্দ-উৎসবের পাশাপাশি ব্যবসায়িক ইনভেস্টমেন্ট হিসেবেও দেখে আজমল। এই সব লোকদের অনেকেই তার ব্যবসায়িক পার্টনার, অনেকের সাথেই তার বড় রকমের লেনদেন আছে।

আয়নার সামনে থেকে সরে এসে নরম ইম্পোর্টেড সোফায় হেলান দিয়ে বসল, সামনে টেবিলে রাখা বিয়ারের ক্যান খুলে চুমুক দিতেই হেঁচকি খেল আজমল, মোবাইল ফোন বেজে উঠেছে। এতো রাতে নিলুফার ছাড়া আর কেউ ফোন দেয়ার সাহস পাবে না।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল, অচেনা নাম্বার থেকে ফোন। গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষগুলো এখনো এই ভুল করে, রঙ নাম্বার বলার পরও রাখতে চায় না। রিসিভ করবে কি না ভাবতে ভাবতে লাইনটা কেটে গেল।

পাশে এসে বসেছে আজকের পার্টির প্রান, তার খুব প্রিয় বন্ধু, জানে আলম। চোখ লাল করে ফেলেছে এরমধ্যেই, উল্টাপাল্টা কথা বলছে, বাকি সবাই তা উপভোগ করছে। দু'একজন আনন্দের অতিশয্যে হাততালিও দিয়ে ফেলছে। বিরক্ত মুখে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল আজমল, ইচ্ছে করছিল সবগুলোকে লাথি দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিতে, মাঝে মাঝেই তার এমন ইচ্ছে হয়। পাশে বসে থাকা মানুষের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে, কিংবা লাথি দিতে ইচ্ছে করে। অদ্ভুত সব ইচ্ছে, পূরন করার উপায় নেই। সমাজে বিত্তবানদের তালিকায় প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই থাকবে, এই বিত্ত সে নিজে তৈরি করে নি, বাবা লুতফর রহমান চৌধুরির পরিশ্রমের ফসল উপভোগ করছে আর চেষ্টা করছে এই বিত্ত যেন অন্তত টিকে থাকে। একটাই ছেলে ফারহান, বড় হয়ে হয়তো উপভোগ করবে ঠিক তার মতো করেই, যদিও ছেলেটা হয়েছে মায়ের মতো, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে মেয়ে বিয়ে করায় এই একটা সমস্যা হয়েছে, ফালতু কিছু মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে ছেলের মধ্যে। পড়াশোনা আর খেলাধুলা ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই ছেলের।

"ঐ জানে আলম, চুপ থাক," হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আজমল, চারপাশের কোলাহল তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যন্ত্রনা হচ্ছে খুব।

জানে আলম, মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে, বন্ধুর মর্জি বুঝে সাথে সাথে চুপ করে গেল। ফ্ল্যাটে আগত অন্যান্য অতিথিরাও বুঝে গেল আজকের মতো আনন্দ-উৎসবের এখানেই সমাপ্তি।

আরো প্রায় মিনিট দশেক পর, পুরো ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে এলো, সোফায় গা এলিয়ে বসে থাকল আজমল। ফ্ল্যাটে এখন মোখলেস ছাড়া আর কেউ নেই, ছেলেটা এখানেই থাকে, ঘুমায়, সবকিছু গোছগাছ করে রাখে, অনেকটা কেয়ারটেকারের মতো ব্যাপার-স্যাপার। মোখলেস ড্রয়িং রুমের দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, তাকে না ডাকা পর্যন্ত সামনে আসবে না। মালিক বাসা থেকে বের হয়ে গেলেই ফ্ল্যাট পরিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে বসে আছে আজমল, খুব কৌতুহল হচ্ছিল, এতো রাতে ভুল করে তার নাম্বারে কারো কল করার কথা নয়। নিজেই কল করবে কি না ভাবতে ভাবতে আবার এলো কল, সেই একই নাম্বার থেকে।

"আজমল চৌধুরি," ওপাশ থেকে ভারি গলায় বলল এক পুরুষ কণ্ঠ।

"হু, কে বলছেন?" নিজের কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভির রাখার চেষ্টা করল আজমল।

"আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি, হাড়ে হাড়ে চিনি," ওপাশ থেকে বলল।

"ফাইজলামি করিস, তুই চিনিস আমারে?" উত্তেজিত হয়ে পড়ল আজমল, তাকে

হুমকি দেয়ার মতো বুকের পাটা কারো নেই।

"আপনাকে চিনি বলেই তো বলছি, আপনার পাপের লিস্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে।"

মেজাজ চড়ে গেল, এই সুরে তার সাথে কথা বলার সাহস পেল কি করে লোকটা, আজমল চৌধুরি কেমন মানুষ কোন ধারনাই নেই সম্ভবত। একটানা কিছুক্ষন গালাগালি করল আজমল, অনেকদিন এভাবে গালাগালি করা হয় না কাউকে, বুকটা একটা হাল্কা লাগল অনেকদিন পর, তবে ওপাশ থেকে গালাগালির কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না, চুপচাপ শুনছে লোকটা।

"ঠিক সাতদিন সময় দেয়া হলো আপনাকে, উপভোগ করুন, ঠিক এখন যেমন করছেন, রাখছি," বলে ফোন রেখে দিল ওপাশ থেকে।

মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরে রইল কিছুক্ষন আজমল, অচেনা নাম্বারটায় ডায়াল করল পরপর কয়েকবার। কাজ হলো না। মোবাইল সুইচড অফ। রাগের চোটে ফোনটা মেঝেতে ছুড়ে মারল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল নিমিষেই।

হাতের কাছে যা পেল ছুড়ে ফেলল আজমল, মাথায় আগুন ধরে গেছে। সাতদিন সময় দেয়া হয়েছে, তারপর কী হবে! কী করবে এই লোক! মেরে ফেলবে! এই লোকটা কে! যার এতো বড় সাহস!

এই নাম্বারটার খোঁজ লাগাতে হবে, তার স্মৃতিশক্তি অসাধারন, যে কয়েকবার ডায়াল করেছে তাতেই নাম্বারটা মাথায় গেথে গেছে। তবে জানা কথা, এই নাম্বার আর খোলা পাওয়া যাবে না। সিমটা ভূয়া কারো নামে নিবন্ধন করা, কাজেই সাতদিনের আগে এই লোক নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে একে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

লাইসেন্স করা রিভলবারটা বাসায় থাকে, সেটা সবসময় সাথে রাখতে হবে। দুজন দেহরক্ষী অবশ্য আছে, এই মুহূর্তে দরজার বাইরে দাঁড়ানো, ওদের সাথে অস্ত্র থাকে, তবে কাউকে বিশ্বাস করে না আজমল চৌধুরি, টাকা দিয়ে সব কেনা যায়, বিশ্বাস, ভালোবাসা, আবেগ, সত্য-মিথ্যা, সব।

তবে তার এই ধারনা আগামি সাতদিনের মধ্যেই বদলে যাবে নিশ্চিত।

* * *

একা একা বিদেশে আসার স্মৃতিটা এখনো পরিস্কার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কয়েকজন থাকলেও নিজেকে একা করে নিয়েছিল তুষার আহমেদ, কারো সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনবোধ করে নি, যারা তাকে চেনে খুব অবাক হয়েছিল, এমনিতে তুষার বন্ধুবৎসল, সামাজিক একজন মানুষ, তুমুল আড্ডাবাজ, পরোপকারি

হিসেবে পরিচিত আত্মীয় আর বন্ধু মহলে, সেই তুষার বিদেশে এসে কারো সাথে যোগাযোগই করলো না। ভালো স্কলারশীপ পেয়েছে, পিএইচডি করে দেশে ফিরে আসবে এমন আশা করেছিল তার পরিবার, কিন্তু সেসবের ধারকাছেই গেল না তুষার, পিএইচডি করে বিদেশিনীকে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ি হয়ে গেল। টেক্সাসের একটা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে কাজ শুরু করল, এখনো সেখানেই আছে। নড়াচড়ার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

চৌদ্দ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে আমেরিকায় গিয়েছে তুষার, তারপর, একবারও দেশে ফেরার নাম নেয়নি। বাবা নেয়ামত উল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, দু'দুবার হার্ট অ্যাটাকও হলো, মায়ের ডায়াবেটিস, ছোট বোনের বিয়ে, কোন কিছুতেই তাকে দেশে আনা গেল না। মনে হচ্ছিল অদৃশ্য কোন অভিমান আছে তার দেশের উপর, দেশের মানুষের উপর, তবে সেটা যে কী কোন ধারনাই ছিল না কারো। শুরুতে অনেকে ডাকাডাকি করলেও একসময় তারা হাল ছেড়ে দিল। এখন আধুনিক যুগ, ই-মেইল, স্কাইপিতে সহজে যোগাযোগ করা যায়, চাইলে দেখাও যায়। কাজেই দূরত্বটা খুব প্রকট হয়ে দেখা দিল না এবং তুষারও খুব আনন্দে তার বিদেশি স্ত্রি, ক্রিস্টিনাকে নিয়ে বেশ আনন্দেই বাস করছিল।

তবে, সবকিছুরই বোধহয় শেষ আছে, চিরশান্তির দেশেও একসময় অশান্তি নেমে আসে, সাগরের স্রোত কোনও না কোন সময় তীরে এসে ধাক্কা খায়। কাজেই তুষারেরও গত কিছুদিন ধরে বুকের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলো, এই ব্যথা শারীরিক ব্যথা নয়, মানসিক একটা কষ্ট। এই কষ্টের কথা কাউকে বলা যায় না, ক্রিস্টিনাকে বললে হাসে, বলে দেশ থেকে একবার ঘুরে আসতে আর একান্তই খুব বেশি সমস্যা হলে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাতে। সাইক্রিয়াটিস্ট দেখানোর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, আবার দেশে ফেরার চিন্তাটাও কেমন যেন হাস্যকর, মাস তিনেক আগে নেয়ামত সাহেবের যখন দ্বিতীয়বারের মতো হার্ট আটাক হলো তখনই উপযুক্ত সময় ছিল ঢাকায় যাওয়ার, এখন আর কোন উপলক্ষ্য নেই, সবাই সুস্থ আছে, সহি-সালামতে আছে।

দুপুরের একটা ক্লাস শেষ করে টিচার্স লাউঞ্জে এসে বসল তুষার, বাইরে রোদ্রকরোজ্জল দিন, এখানকার আকাশ যেন বেশি নীল, ভাবল সে, ঢাকার আকাশ এতো নীল না হলেও মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগতো, বিশেষ করে বৃষ্টি শেষে বিকেলের রোদটায় বাসার ছাদে গিয়ে দাঁড়াতে খুব ভালো লাগতো, মাঝে মাঝে উল্টোদিকের ছাদে দেখা যেত শ্যামলা একটা মেয়েকে। উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকতো তুষার, তবে কথা বলার সাহস হয়নি কখনো। এখানে কলেজ ক্যাম্পাসে ছেলে-মেয়েরা ঘুরছে, কথা বলছে, কী চমৎকার নিশ্চিন্ত জীবন ওদের।

লাউঞ্জ রুমটা প্রায় ফাঁকা, যে দু'একজন শিক্ষক আছে তাদের দিকে তাকিয়ে

সৌজন্যের হাসি দিল, ব্যস, এতোটুকুই, সহকর্মিদের সাথে তার যোগাযোগ নেই বললেই চলে, এমনও কয়েকজন আছে যাদের বছরের পর বছর মুখ চেনে কিন্তু নাম জানে না এবং জানার প্রয়োজনও বোধ করে না, যদিও সে এমনটা কোনকালেই ছিল না, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা বিজ্ঞান সাময়িকী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর্টকেলটা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক হলেও কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। জীবনটা কেমন যেন ফাঁকা আর খুব বেশি অর্থহীন লাগে ইদানিং, বয়স প্রায় আটত্রিশ, দেখতে যথেষ্টই সুদর্শন, ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, মাথাভর্তি চুল আর পেটানো স্বাস্থ্য, ক্রিস্টিনা বলে তার চোখ দুটো নাকি সবচেয়ে সুন্দর, এমন কালো মায়াকাড়া চোখ কোন পুরুষের হতে পারে ওর নাকি ধারনাই ছিল না।

ক্রিস্টিনা তার প্রেমে পড়েছিল, সেই দশ বছর আগে, যখন পিএইচডির কোর্সটা নিয়ে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছিল সে। কোনদিকে তাকানোর সময় ছিল না, তখন একদিন হুড়মুর করে এই মেয়ে এসে হাজির, আমেরিকান বলেই হয়তো লাজ-লজ্জার তেমন বালাই ছিল না, একদম সরাসরি বলে বসলো, তুষারকে সে ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায় এবং সেটাও খুব শিঘ্রই। পশ্চিমে সাধারনত এরকম ঘটে না, প্রেমিক-প্রেমিকারা দিনের পর দিন একসাথে থাকে, বছরের পর বছর চলে যায়, তারা তাদের সম্পর্কের বোঝাপড়াটা ঝালাই করে নিতে চায় এই সময়টায়, দেখতে চায় কোন ভুল করতে চলেছে কি না, এমনও হয়েছে বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার পর অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা বাধ্য হয়ে বিয়ের চিন্তা কওে কিংবা আলাদা হয়ে যায়। সেখানে ক্রিস্টিনার এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই আসে না, কিন্তু তুষার সাড়া দিল। কেন সাড়া দিল তার কারন এখন পর্যন্ত বের করতে পারে নি, তবে এখন মনে হয়, সাড়া দিয়ে ভুল হয়নি, ক্রিস্টিনার মতো কেউ তাকে ভালোবাসে নি, বাসবেও না, ক্রিস্টিনা আর দশটা পশ্চিমা মেয়ের মতো নয়, গত দশটা বছর পাশাপাশি কাটানোর পর এখন দুজনের প্রতি দুজনের নির্ভরশীলতা আরো বেড়েছে।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল আনমনে, ফোন বেজে উঠল তখন, নাম্বারটা অপরিচিত। এই ধরনের নাম্বার বাংলাদেশেই হয়। ফোন ধরবে কি না বুঝতে পারছিল না, গত কিছুদিন ধরে দেশ থেকে এক মামাতো ভাই বারবার টাকা চেয়ে ফোন দিচ্ছে, লাখ দুয়েক টাকা চাইছে, ছোট ভাই বিদেশে থাকে, ডলারে রোজগার করে, তার কাছে অনেক অনেক দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই টাকা চাইতেই পারে এবং সে টাকা একবার দেয়া হয়ে গেলে কোনদিন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই জানার পরও ছোট ভাই টাকা দিতে বাধ্য এমন এক ভাবসাব এই মামাতো ভাইটার। গত কিছুদিন ধরে সেই নাম্বার থেকে আসা কল ধরা বন্ধই করে দিয়েছে তুষার, বিরক্তিকর ব্যাপার।

সেই মামাতো ভাই-ই হয়তো, কারন বাবা-মা বাসার টিএনটি ফোন থেকে কল

করেন, কিংবা ছোটবোন বাসায় গেলে স্কাইপিতে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। কাজেই অচেনা নাম্বার থেকে তাদের কেউ ফোন করবে না। ফোন বেজেই যাচ্ছিল দেখে সাইলেন্ট মুডে দিয়ে দিল তুষার, ম্যাগাজিনের আর্টিকেলটা আরো মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত, শিক্ষক মানুষদের ওয়াকিবহাল থাকতে হয় সবকিছু নিয়ে।

তবে মনোযোগ বসানো যাচ্ছিল না, ফোন বেজেই চলেছে, বোঝাই যাচ্ছে মামাতো ভাইটা নাছোড়বান্দা, টাকা আদায় না করে ছাড়বে না, কড়া কিছু কথা বলার উদ্দেশ্যে ফোনটা রিসিভ করলো তুষার।

"হ্যালো?"

"তুষার আহমেদ?" কণ্ঠস্বরটা ভারি, অপরিচিত, মামাতো ভাই এই টোনে কথা বলে না এবং তুষার আহমেদ বলেও সম্বোধন করে না।

"জি, বলছি, আপনি?"

"আপনি তো অনেকদিন দেশে আসেন না, অথচ আপনার মতো মেধাবি লোকদের খুব প্রয়োজন এখানে।"

কথাবার্তা কী প্রসঙ্গে হচ্ছে বুঝতে পারছিল না তুষার, আশপাশে তাকাল, কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই, টিচার্স লাউঞ্জ, এখানে উঁচু গলায় কিংবা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলা একজন শিক্ষকের জন্য অশোভনীয় ব্যাপার। ফোন হাতে নিয়ে লাউঞ্জের বাইরে চলে এলো।

"আপনি কেন ফোন করেছেন সেটা বলুন," তুষার বলল।

"আপনার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে আপনি খুবই উদ্বিগ্ন, ভয় পাবার কিছু নেই," ওপাশ থেকে ভারি কণ্ঠস্বরটা বলল, "শুধু একটা কাজ করবেন?"

"কি?"

"ঢাকায় ফিরে আসুন। তাহলেই হবে।"

"ঢাকায় ফিরবো মানে? বুঝলাম না," গলা একটু চড়ে গেল তুষারের।

"আপনার বাবা-মা দুজনেই বৃদ্ধ, শেষ সময়ে পাশে থাকবেন না!"

"তাদের শেষ সময় ক'বে আপনি কিভাবে জানেন, ফাজলামি করছেন?"

"সাতদিনের বেশি লাগবে না, বাকিটা আপনার ব্যাপার।"

"সাতদিন মানে? কিসের সাতদিন? আপনি কে? আপনার সমস্যা কী?" এক নাগাড়ে প্রশ্নগুলো করে গেল তুষার, তবে উত্তর এলো না, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সময় এখন রাত একটার কাছাকাছি, এতো রাতে ফোন করে কে তাকে হুমকি দিচ্ছে? এটা তো হুমকিই! প্রচ্ছন্ন হুমকি। মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বাবা-মা বৃদ্ধ হয়েছেন, তারা একসময় মারাও যাবেন, চরম এই সত্যটা জানা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় তারা বেঁচে থাকুক বছরের পর বছর, সুস্থভাবে, আনন্দের সাথে।

একমাত্র ছেলে হিসেবে কিংবা একজন সন্তান হিসেবে বাবা-মা'র প্রতি তেমন কোন দায়িত্বই পালন করে নি তুষার, মাঝে মাঝে সেজন্য অনুশোচনা হয়, নিজের এক অদ্ভুত গোয়ার্তুমির কারনে দিনের পর দিন তাদের ছেড়ে বিদেশে আছে, এবার হয়তো সত্যি সত্যি ফেরা দরকার। এই দুজনের কিছু হলে নিজের কাছে সারাজীবনের জন্য ছোট হয়ে থাকবে।

লাঞ্চের পর আরেকটা ক্লাস আছে। ক্লাসটা না করালেই নয়, কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না, এই এক ক্লাস না করালে পুরো কোর্সটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে। তবে কিছু করার নেই, সারাজীবন এইসব ছোট ছোটখাট সমস্যা খুঁজে বেড়ালে চলবে না। পার্কিং লটের দিকে এগুল তুষার। বাসায় যেতে হবে, টিকিট কাটতে হবে, ক্রিস্টিনাকেও সাথে নিতে হবে, বেচারির খুব শখ বাংলাদেশ দেখার, বাবা-মা'ও কখনো ছেলের বউকে সামনাসামনি দেখে নি, এইসব ছোটখাট না-হওয়া ব্যাপারগুলো এখনই মিটিয়ে নেয়া ভালো।

হুমকিটা যেই দিয়ে থাকুক, মন থেকে একটা পাথর সরে গেছে হঠাৎ করেই। এবার দেশে যাওয়া যাক, কলেজে একটা মেইল পাঠিয়ে রাখলেই হবে, অনেক অনেক ছুটি জমা আছে, সব এবার একসাথে কাটিয়েই ফিরবে কিংবা ফিরবে না।

অধ্যায় ২

দুই বছর আগে

বাংলাবাজারে নিজের অফিস রুমে চুপচাপ বসে আছে প্রকাশক মোফাজ্জল হোসেন, কাছের লোকজন যাকে সবাই হোসেন ভাই বলে ডাকে। দুপুরে খাওয়ার পর চেয়ারে বসেই ছোটখাট একটা ঘুম দিয়ে এইমাত্র জেগে উঠেছে সে। অন্তত ঘন্টাখানেকের এই ঘুমটা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারনে মেজাজ খিটখিটে হয়ে আছে। ঘুম সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারন আর কিছুই না, দুঃস্বপ্ন দেখা। দুপুরের ভারি খাবার খেয়ে ঘুমালে প্রায়ই দুস্বপ্ন দেখে মোফাজ্জল হোসেন, তার কারন কী কে জানে। আজকের দুস্বপ্নটা ছিল ভয়াবহ রকমের বাস্তব। স্বপ্নটা এতোই বাস্তব ছিল যে গায়ের লোমগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

একজন প্রকাশকের অফিস রুম যেমন হওয়া দরকার তার রুমটাও সেরকম। এখন পর্যন্ত বের হওয়া বইগুলোর এক কপি করে দু'পাশের দেয়ালে আলাদা করে তৈরি করা শেলফে ভর্তি। এই বইগুলো ছাড়াও আছে জ্ঞানগর্ভ কিছু বই যা এখন পর্যন্ত হাতে নিয়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করে নি সে। ময়রা নিজের দোকানের মিষ্টি ছোঁয় না, ব্যাপারটা বোধহয় এমনই। একসময় বই পড়ার নেশা ছিল, বই ছাপানো শুরু করার পর থেকে নেশাটা কিভাবে কিভাবে যেন কেটে গেল। সে জায়গাটা দখল করে নিলো কিছু আজে-বাজে অভ্যাস, যার মধ্যে একটা হচ্ছে কঠিন পানীয়র নেশা। রুমে ছোট একটা ফ্রিজার আছে, সেখানে কয়েক বোতল রাখা থাকে সবসময়, তবে আজ ফ্রিজ খুলে বোতল বের করতে ইচ্ছে করছে না। দরজার বাইরেই তার ম্যানেজার কাম পিয়ন কুদ্দুস উৎ পেতে বসে আছে সে জানে। ডাক দেয়া মাত্রই চলে আসবে ভেতরে। ডাব খেতে ইচ্ছে করছে হঠাৎ। ঢাকা মেডিক্যালের সামনে ডাব পাওয়া যায়, বাংলাবাজারেও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, তবে আকারে ছোট।

"কুদ্দুস, অ্যাই কুদ্দুস," চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হাক দিলো সে।

কুদ্দুস চোখের পলকে ঢুকে পড়ল রুমে, সত্যি সত্যি যেন ঘাপটি মেরে বসেছিল দরজার কাছে।

"ডাব নিয়ে আয়, একদৌড়ে যাবি আর আসবি," বলল সে।

"জি।"

"আজকের কালেকশন কেমন?"

"ভালো।"

"আচ্ছা, যা," মোফাজ্জল বলল, "পরে হিসাব নেবো। যা।"

কুদ্দুস হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলে সামনের টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপের খোলা স্ক্রিনের দিকে তাকাল।

হু, দিনে-দুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখার মানে খুঁজে পেয়েছে সে। এরকম মাথা-খারাপ করা লেখা পড়লে যে কেউ দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। ভ্রু-কুচকে মনোযোগ দিয়ে ল্যাপটপে থাকা লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। অক্ষরগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এর আগে কোনদিন অচেনা কারো লেখা এতো মনোযোগ নিয়ে পড়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। অবশ্য এই লেখাটা শুরুতেই দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল অন্য একটা কারনে।

বারোটার পরপর কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটা খাম দিয়ে যায় মোফাজ্জল হোসেনের নামে। খাম খুলে ছোট একটা পেন ড্রাইভ পায়। একজন প্রকাশক মানুষের কাছে লেখা আসবেই, তবে এ পদ্ধতিতে এর আগে কখনো লেখা পায় নি, লোকজন ই-মেইল করে, হাতে লেখা দিস্তা দিস্তা কাগজ নিয়ে অফিসে এসে হাজির হয়, বাসায় যায়, আরো কতো কী করে। তবে এই আইডিয়াটা অদ্ভুত।

কুরিয়ারে প্রেরকের নাম ছিল না কোন, এভাবে লেখা পাঠানোর মানে কি? নাকি লেখা পাঠায় নি! পেন ড্রাইভটা ল্যাপটপে ঢোকানোর আগে হাজারবার চিন্তা করেছে মোফাজ্জল। এমনও হতে পারে পেন ড্রাইভ ল্যাপটপে ঢোকান মাত্র বড় একটা বিস্ফোরন ঘটলো, সেই বিস্ফোরনে সে মারা গেল। হতেই পারে। আধুনিক এই যুগে কতো কী-ই যে ঘটে যায়! অথবা পেন ড্রাইভ ভাইরাসে ভর্তি, ল্যাপটপে ঢোকান মাত্র পুরো ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম ক্রাশ করলো। হতেই পারে। এই ল্যাপটপে অনেক লেখা, অনেক প্রচ্ছদের সফট কপি জমা আছে। ফাইলগুলো অন্য কোথাও ব্যাক-আপ রাখার কথা প্রথমবারের মতো মাথায় এসেছিল এই পেন ড্রাইভটা হাতে নিয়েই। প্রকাশক হিসেবে মোফাজ্জল হোসেনের প্রতিষ্ঠান এখন বাংলাদেশে প্রথম কাতারেই আছে। এজন্য তাকে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি।

শুরুতে কবিতার বই, বিশুদ্ধ গবেষনার বই নিয়ে কাজ করলেও এই উপলব্ধি আসতে দেরি হয়নি যে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হতে হলে প্রেমের উপন্যাস বের করতে হবে। ইদানিংকালে প্রেম বিষয়ক উপন্যাস বলতে বাংলাদেশের প্রেমিক পাঠক সমাজ এখন 'ফুলকলি প্রকাশনি'-কেই চেনে। এধরনের উপন্যাসে ঝামেলা কম, কারো শত্রু হওয়া লাগে না এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার বিক্রিও ভালো। গত সাত বছরে দু'হাতে টাকা রোজগার করেছে মোফাজ্জল হোসেন, ঢাকায় ফ্ল্যাট, গাড়ি, সুন্দরী স্ত্রি, ছেলে-মেয়েদের ভালো স্কুলে পড়াশোনা কোন কিছুতেই কমতি নেই। এর পেছনে বিশেষ একজন লেখকের অবদান সবচেয়ে বেশি। তার বই বের হওয়া মাত্রই হটকেকের মতো বিক্রি হয়ে যায়, বইমেলায় লাইন পড়ে যায়। লেখককে ঠকায়নি মোফাজ্জল হোসেন, প্রাপ্য টাকার চেয়েও বেশি দিয়েছে গত সাত বছরে। চুক্তি একটাই, অন্য কোথাও লেখা ছাপাতে পারবে না, মৌখিক এই চুক্তির বরখেলাপ এখনো করে নি সেই লেখক, করবেও না। তবে একজন লেখকের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা প্রকাশনির এখন অন্যান্য দিকেও চোখ পড়েছে। ফুলকলি প্রকাশনি থেকে এখন নিয়মিত অনুবাদ, থৃলার, কবিতার বই, সবই বের হয়, তবে সেগুলো কোনটাই

এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখাতে পারেনি তাকে।

নানা রকম চিন্তা করতে করতে অবশেষে ল্যাপটপে পেন ড্রাইভ ঢোকাল সে। আশংকা করার মতো কিছু ঘটল না, খুব স্বাভাবিকভাবেই পেন ড্রাইভ কাজ করল। একটা মাত্র ওয়ার্ড ফাইল আছে ড্রাইভটাতে। ফাইলটা 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং ওয়ান' নামে সেভ করা। দ্বিধা ছিল, তারপরও কৌতুহলের জয় হলো।

শুরুতেই উপন্যাসের টাইটেল, 'রক্তনীল সুখ,' লেখকের নাম নেই। এধরনের অদ্ভুত নামের মানে কী, জানার কৌতুহল হচ্ছিল। প্রায় তিনশ পৃষ্ঠার কাছাকাছি লেখাটা যেন টানছিল তাকে। নাম না জানা একজন লেখক কী লিখেছেন জানতে ইচ্ছে করছিল খুব। একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই যে শুরু করেছিল অর্ধেকে এসে থামতে হয়েছিল, বাসা থেকে একের পর এক ফোনই এই থামার কারন।

দুপুরের খাবার পাঠানো হয়েছে, এই খবরটা বলার জন্য এতোবার ফোন করার কী আছে! লাঞ্চ, উটকো কিছু লোকের আগমন আর ভাতঘুম, সব মিলিয়ে মাঝখান দিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হলো। লেখাটা প্রথম লাইন থেকেই আটকে ধরে রেখেছে তাকে, লুতুপুতু প্রেমের গল্প নয়, থৃলার উপন্যাস, তবে দেশিয় আবহে এধরনের কিছুও যে লেখা যায় তা হয়তো এখনকার লেখকরা কেউ চিন্তাও করে না। এমন একটা লেখা হাতে চলে এসেছে, একে সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলা ঠিক হবে না। প্রেমের উপন্যাস দিয়ে বাজার মাতিয়ে রাখা ফুলকলি প্রকাশনি এখন ভিন্ন ধারার কিছু আনবে পাঠকদের জন্য, মোফাজ্জলের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

তবে যতোটুকু পড়েছে, একটা কথাই মনে হয়েছে বারবার। এই লেখা এখনই প্রেসে পাঠাতে হবে, প্রচ্ছদ আকাঁতে হবে, লেখকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অন্য কাউকে একই লেখা পাঠানো হয়েছে কি না কে জানে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

লেখক নিজেকে আড়ালে রেখে তার প্রতিক্রিয়ার আশা করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু লেখককে সেই প্রতিক্রিয়া জানানোর উপায় কী! কোন না কোনভাবে প্রতিক্রিয়া জোগাড়ের ব্যবস্থা লেখক নিশ্চয়ই করে রেখেছে। সহজ একটা উপায় হাতের কাছেই আছে। ফেইসবুক। সদ্য পড়া উপন্যাসটা নিয়ে দু'এক লাইন লিখলেই লেখক বুঝে যাবে। তার বন্ধুতালিকায় প্রায় চারহাজার আইডি আছে, এদের অধিকাংশকেই চেনে না মোফাজ্জল। এদের মধ্যে সম্ভবত লুকিয়ে আছে এই রহস্যময় লেখক।

লেখাটা নিয়ে খুব ছোট কিন্তু পজিটিভ একটা প্রতিক্রিয়া ফেইসবুকে পোস্ট করা যায়। খুব বেশি ভালো বলা যাবে না, বেশি বললেই লাই পেয়ে যাবে। একবার লাই পেয়ে গেলে মাথায় চড়ে বসবে, পাঁচ টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকা দাবি করবে।

কুদ্দুস যখন বড়সড় একটা ডাব নিয়ে হাজির হলো অফিস রুমের দরজায়, তখন ফেইসবুকে একটা পোস্ট দিয়েছে মোফাজ্জল। খুব বেশি কিছু লেখে নি, তবে যেটুকু লিখেছে তা রহস্যময় লেখকের বোঝার কথা। এখন অপেক্ষার পালা, নক আসবেই।

অধ্যায় ৩

বর্তমান

রাত একটা পর্যন্ত জেগে থাকার উপায় নেই ইফতেখার উদ্দিন রুবেলের, সকালে অফিস। সাতটার মধ্যে উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। ব্যাংকের চাকরিটা একদম নাভিশ্বাস তুলে ফেলছে। তবু নিশ্চিন্ত একটা জীবন, মাস শেষে ভালো বেতন, চব্বিশ ঘন্টা গাড়ির সুবিধা, ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়াশোনা, স্ত্রিকে মাঝে মাঝে দামি গয়না কিনে দেয়া, এই কাজগুলো করতে পারছে ব্যাংকে চাকরি করেই। কাজেই চাকরির বাইরে আর কিছু নিয়ে ভাবার সময় নেই, বিনোদন বলতে কিছু নেই, মাঝে মাঝে রাত জেগে টিভিতে ভালো কোন সিনেমা কিংবা খেলা দেখতে ইচ্ছে করলেও উপায় নেই, তাহলে সারাদিন অফিসে বসে ঢুলতে হবে। একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেটা খুব একটা শোভন নয়। অথচ একসময় একটা ব্যান্ডে ড্রামস বাজাতো, মাথায় ছিল ঝাকড়া চুল, হাতে ব্রেসলেট, মুখে সবসময় সিগারেট, সে অনেকদিন আগের কথা, তখন তারুন্য ছিল, মাথায় সবসময় অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরাঘুরি করতো, নিজের এবং চারপাশের পৃথিবী নিয়ে কোন আবেগ অনুভূতি কাজ করতো না, পুরো পৃথিবীটাকে ভেঙেচুরে ফেলতে ইচ্ছে হতো। তারপর একসময় ব্যান্ডটা ভেঙে গেল, যে যার মতো পেশা বেছে নিল। এখনও মাঝে মাঝে হাত-পা নিশপিশ করে, হাতের কাছে কিছু পেলে টুকটাক চলতে থাকে নিজের অজান্তেই।

আজকেও যথারীতি বারোটার আগেই বিছানায় চলে এসেছে রুবেল এবং শোয়ামাত্র ঘুম। মাথার কাছে ছোট টেবিলে অ্যালার্ম হিসেবে মোবাইল ফোনটা থাকে। সেই ফোনটা বেরসিকের মতো বেজে উঠল। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছিল। কাঁচা ঘুম। এতো রাতে মোবাইলে কল আসা মানে খুব গুরুত্বপূর্ন কিছু। কষ্ট হলেও তাই উঠে মোবাইল ফোনটা হাতে নিল। অচেনা নাম্বার থেকে ফোন, না ধরার কোন কারন নেই। রঙ নাম্বার হলে কয়েকটা গালি দিয়ে রেখে দেয়া যাবে।

"হ্যালো, কে?" রুবেল বলল।

"উত্তরার জমি, ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাট, স্ত্রি'র একশ ভরির উপর গয়না, ঘটনা কী রুবেল সাহেব?" ওপাশ থেকে ভারি গলায় কথাগুলো বলল কেউ।

"ঘটনা জেনে আপনার কি দরকার?" রুবেল বলল, উত্তরায় জমি আছে, বেশ কয়েক কাঠা, অনেক দামি জমি, ধানমন্ডির ফ্ল্যাটটার দামও এককোটির কম হবে না, এগুলো সব সাবিহা'র নামে কেনা। আর গয়না তো অনেক কিনে দিয়েছে, একশ ভরি হয়ে গেছে কি না জানা নেই।

"খাটি কথা বলেছেন, আমার কি দরকার? গুড," ওপাশ থেকে হাসল লোকটা।

"ফোন রাখছি," রুবেল বলল, গলাটা যতোটা সম্ভব নীচু রাখল, পাশে সাবিহা শুয়ে আছে, জেগে গেলে একটার পর একটা প্রশ্ন করে জান শেষ করে দেবে।

"আর মিরপুরের ফ্ল্যাটে যে একজনকে রেখে দিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যাটা কাটানোর জন্য, সেটা?"

"আপনি কি চান?"

"গুড, এবার আসল প্রশ্নে চলে এসেছেন। আপনাকে আমি সময় দিচ্ছি, আগামি সাত দিন। এরমধ্যে সবকিছু ঠিক করে ফেলুন।"

"ঠিক করে ফেলবো মানে?"

"কুড়ি ভরি স্বর্ন আপনার শ্বশুর দিয়েছিল, সেগুলো রেখে বাকিগুলো আমাকে দেবেন, ধানমন্ডির ফ্ল্যাট, উত্তরার জমি বিক্রি করার ব্যবস্থা করুন, ঐ টাকা কোথায় দিতে হবে আমি বলে দেবো।"

"আপনি বললেন আর আমি রাজি হয়ে গেলাম, এতো সোজা!"

"অবশ্যই সোজা। এনিওয়ে, অনেক রাত হয়ে গেছে, কথা বাড়াবো, না, গুড নাইট। তবে মনে রাখবেন, সাতদিন।"

ফোন রেখে দিল রুবেল। ঘুমটা হঠাৎ করেই মাটি হয়ে গেছে। সাতদিন পর কী করবে লোকটা, কী করার আছে! পুলিশকে বলে দেবে? দূর্নীতি দমন কমিশনকে জানিয়ে দেবে? স্ত্রিকে বলে দেবে মিরপুরে তার একজন প্রেমিকা আছে, সপ্তাহের একটা দিন যার জন্য বরাদ্দ? কেউ একজন থ্রেট দিয়েছে, শত্রুর অভাব নেই, টাকা কামাতে গেলে শত্রু হবেই। ব্যাংকে কাজ করে তার মতো অঢেল টাকা খুব কম লোকই বানিয়েছে, মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে থেকে কাজ করেছে ধীরে ধীরে, যা সবাই পারে না। একা একা কোন টাকা খায় না সে, সাথে আরো অনেক রাঘব-বোয়াল জড়িত। কাজেই হুমকি দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না, সামান্য কিছু টাকা দিয়েই এসব হুমকিধারীদের ঠান্ডা করা যায়। নইলে তার কাস্টমারের অভাব নেই, বিভিন্ন ধরনের কাস্টমারের মধ্যে কাউকে দিয়ে এই ব্যাপারটাকে ঠিক করাতে হবে।

এককালের রক ব্যান্ডের ড্রামার শুকনো-পটকা, লম্বাচুলো রুবেল এখন দেখতে নরম-সরম ভদ্রলোক গোছের মাঝবয়েসী একজন মানুষ, তা হলে কী হবে, শরীরের রক্ত এখনো টগবগে, বিশেষ করে স্বার্থে আঘাত লাগলে তা আরো টগবগ করে উঠে, নিজের কোন কিছুতেই একবিন্দু ছাড় দিতে রাজি নয়। তার পেছনে লাগার আগে ঐ লোকটার একশবার হিসেব করে নেয়া উচিত ছিল।

অচেনা নাম্বারটায় ডায়াল করল রুবেল। মোবাইল সুইচড অফ। হাসি ফুটে উঠল মুখে। চিন্তার কিছু নেই। এই ধরনের হুমকি পেয়ে অনেকদিন পর নিজেকে জীবন্ত মনে হচ্ছিল, জীবন থেকে উত্তেজনা একেবারেই হারিয়ে যেতে বসেছিল। অনেকদিন পর উত্তেজিত হয়ে ভালো লাগছে।

* * *

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করছিল আরিফের। সেই সন্ধ্যার পরপর বসে একটানা কাজ করছে, এখন রাত একটার একটু বেশি বাজে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, কিন্তু তবু কম্পিউটারের সামনে থেকে নড়ার উপায় নেই। একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে, এখানে এসে থামলে পরে আর কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। এর আগেও এরকম হয়েছে, গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে রেখে দিয়েছে পরে লিখবে বলে, পরে লিখেছেও, কিন্তু ঘটনা যেভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে শেষ হয়নি, দেখা যায় গল্প নতুন মোড় নিয়ে নতুন কিছু হয়ে গেছে, প্রতিবার লিখতে বসার সময় সাধারন একটা প্ল্যান নিয়ে লেখা শুরু করে, কিন্তু লেখা শুরু হওয়ার পর সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেখানে তার কোন হাত নেই। চরিত্রগুলো যেন নিজের মতো কথাবলা শুরু করে, কাজ করে তার অনুমতি ছাড়াই, একদম নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। নয় বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে এবং সামনেও এমনই হবে। কিন্তু এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, লেখক হিসেবে চরিত্র থাকবে তার নিয়ন্ত্রনে, ঘটনা সেভাবেই ঘটবে যেভাবে সে ঘটাতে চাইবে, তবেই না সে লেখক।

একপাশে রাফ খাতাটা খোলা, গত কিছুদিন ধরে আউটলাইন করে লেখার চেষ্টা করছে আরিফ, এতে পুরো গল্পটা একনজরে দেখা নেয়া যায়, তবে তাতেও কাজ হয়নি, এভাবে লিখতে গেলে মনে হয়, তার হাত কেউ বেঁধে রেখেছে, সীমানা দিয়েছে লেখার চৌহদ্দিতে, এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। লেখক হিসেবে এই পরাধীনতাকেও মানতে নারাজ আরিফ। কাজেই, লেখালেখি হচ্ছে, কিন্তু কিছুই গতি পাচ্ছে না, নিজের মধ্যকার দ্বিধা-দ্বন্ধ সামনে পাঠককেও প্রভাবিত করবে এটা নিশ্চিত। সবচেয়ে ভালো হয় লেখালিখি ছেড়ে দিলে। গত কয়েক বছরে যথেষ্ট টাকা জমা হয়েছে, যা দিয়ে আগামি কয়েকবছর শান্তিতেই কাটানো যাবে। দেশে লেখালিখি করে টাকা রোজগার করে টিকে থাকাটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, এই অসম্ভবটাকেই সম্ভব করে চলেছে আরিফ প্রতিনিয়ত, আর এজন্যই তাকে সবসময় লিখতে হয়। পাঠকের দাবি, প্রকাশকের আবদার মেনে তাকে লিখতে হয়, রাত জেগে, দিনে ঘুমিয়ে, ভাবতে ভাবতে, ঘুমাতে ঘুমাতে।

মোবাইল ফোন বাজছে, সাইলেন্ট করে রাখা, টেবিলের উপর ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, এতো রাতে কারো ফোন করার কথা নয়।

এখন কল রিসিভ করা অসম্ভব, কাজের গতিটাই থেমে যাবে, মোবাইল ফোন বাজুক, কিছু যায় আসে না। আর এক প্যারা লিখেই শেষ করবে লেখাটা, না আরো দু'এক পাতা লিখবে বুঝতে পারছিল না আরিফ। চাইলে এখানেই শেষ করে দেয়া যায়। তার উপন্যাসটা খুব সাধারন একটা গল্প, শেষ করে দিলেও পাঠকের আপত্তি

করার কিছু নেই। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো, ভালো একটা গল্পের শেষটা ভালো না হলে সব মাটি।

মোবাইল ফোনটা আবার বাজছে। এবার হাতে নিলো ফোনটা আরিফ, অচেনা নাম্বার, বিরক্তিতে ভ্রু কুচকে গেল তার। একটাই সমাধান আছে, ফোনটা বন্ধ করে রাখল। আজকের এই লেখাটা শেষ করার পর আগামি কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে। অবশ্য সবসময় সে বিশ্রামের উপরই আছে, একটা হুইলচেয়ারে বসা মানুষ কতোটাই বা পরিশ্রম করতে পারে।

গত কয়েকবছর ধরে ঢাকা ছেড়ে গাজীপুর নিবাসি হয়েছে আরিফ, এর পেছনে একটাই কারন, ঢাকায় নিশ্ছিদ্র নিরবতা বলে কোন ব্যাপার নেই, সারাদিন চারপাশে হৈ-চৈ, হট্টগোল লেগেই থাকে। কিছু টাকা জমতেই নিজের জন্য ছোট এক টুকরো জমি কিনে নিয়ে চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে। আশপাশে লোকবসতি নেই বললেই চলে, এমন একটা পরিবেশই চেয়েছিল সে সবসময়, যেখানে কেউ তাকে কখনো বিরক্ত করতে আসবে না।

মাঝখানে তৈরি হয় তার নিজস্ব নিবাস, একতলা একটা বাড়ি, সবমিলিয়ে পাঁচটা রুম, দুটো বাথরুম, বারান্দা, পুরোটা কাঠ দিয়ে তৈরি, বেশ খরচ হয়েছে বাড়িটা বানাতে গিয়ে, ভালো কাঠ, ভালো মিস্ত্রি পাওয়া অনেক কঠিন, সময় বাঁচানোর জন্য নীচের অংশটা কাঠ দিয়ে বানালেও উপরে দিয়েছে টিনের চাল। সামনে ছোট একটু উঠান, একপাশে বাগান, শাক-সব্জির চাষ হয়, নিজের হাতেই করে আরিফ।

বাইরের গেট সবসময় তালাবদ্ধ থাকে, বাসায় থাকে মানুষ মাত্র দু'জন, আরিফ নিজে আর তার সবসময়ের সঙ্গি, তাহের। তাহের হচ্ছে ম্যানেজার। এমন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া খুবই কঠিন। ওর হাতে পুরো দায়িত্ব, চলাফেরা, বাজার, ব্যাংক-আকাউন্টের হিসেব, প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ, এ সব কাজই করে তাহের এবং খুব ভালো মতোই করে। তাহেরের একটাই সমস্যা রাত জাগতে পারে না, বারোটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়ে। একা একা নিজের রুমের এককোনায় বসে আরিফ যখন লিখতে থাকে তখন শুনশান পৃথিবীতে খুব একা লাগে। বাসায় একজন মানুষের উপস্থিতি তাকে সামান্য হলেও সান্তনা দেয়, তবে তা খুব বেশিক্ষনের জন্য নয়।

একটা সিগারেট ধরালো আরিফ। একটু ব্রেক দরকার, গল্পের শেষ পর্যায়ে নিকোটিন খুব ভালো কাজে দেয়, নার্ভ শান্ত করে, সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়। গল্পের নায়ক-নায়িকার মিল কিংবা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটা এই সময়েই নেয় আরিফ। গত কয়েকটা উপন্যাসের বিয়োগান্তক পরিনতিতে পাঠক সমাজ তার উপর কিছুটা ক্ষিপ্ত, এই তথ্য জানিয়েছেন প্রকাশক, কাজেই এই উপন্যাসে একটা মিলনান্তক সমাধান চান তিনি। লোকটাকে বোঝানো যায় না, চাইলেই গল্পের শেষে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল বলা যায় না। বাস্তবতা এতো সহজ না, বাস্তবে রোমিওর সাথে জুলিয়েটের কখনও দেখাই হয় না, কিংবা দেখা হলেও প্রেম হয় না, কিংবা প্রেম

হলেও মিল হয় না, কিংবা...

গত কয়েক বছরে দেশের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় লেখক আরিফুল হক, তার পাঠকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, এর পেছনে দায়ি তার প্রেমের উপন্যাসগুলো, খুব জটিল কোন গল্প নয়, ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ প্রেমের গল্প একের পর এক লিখে যাচ্ছে সে এবং সবগুলোই দারুন গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে, বেশ কিছু গল্প থেকে নাটক-সিনেমাও হচ্ছে। তবে এটাই শেষ, নতুন ধরনের কাজ করার ইচ্ছে মনের মধ্যে বেড়ে উঠছে গত কিছুদিন ধরে। শুধু কয়েকদিনের বিশ্রাম দরকার।

আরো প্রায় ঘন্টাখানেক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে চুপচাপ বসে থাকল আরিফ, কিবোর্ডে হাত তার চলে নি এই দীর্ঘসময়, প্রায় আড়াইশ পাতা জুড়ে লেখাটা শুরু থেকে কিছুদূর পড়েছে এতোক্ষন, একদম রাবিশ একটা জিনিস হয়েছে, এই গল্প শেষ করার মানে নেই, কম্পিউটারে লেখার এই একটা সুবিধা, চাইলেই খুব সহজে সব মুছে ফেলা যায়। ফাইলটা সিলেক্ট করে ডিলিট বাটনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরিফ, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শিফট ডিলিটে চাপ দিল।

ফাইলটা একদম মুছে গেছে।

আবার নতুন করে লেখা শুরু করতে হবে, নতুন বোতলে পুরানো মদ আর কতোদিন চলবে, এবার অন্য ধরনের কিছু লেখা যাক, একদম নতুন ধরনের কিছু। পাঠককে চমকে দিতে হবে, পাঠককে চমকে দেয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা আর কোথাও নেই। তবে আজকের উপন্যাসটা বাদ দেয়ার সিদ্ধান্তে সে নিজেই খুব বেশি চমকিত হয়েছে, এটাও খুব আনন্দের কথা।

ঘুমে চোখ বুজে আসছিল, কম্পিউটারটা কোনরকমে শাটডাউন করে বিছানার কাছাকাছি চল এলো আরিফ। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে, হুইলচেয়ার ছেড়ে নিজে নিজে বিছানায় যাওয়াটা খুব কষ্টের, অথচ একসময় এই কষ্টটা তার ছিল না।

চোখ ভিজে এলো অনেকদিন পর, সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে সম্পূর্ন অন্যরকম একটা জীবন হতো, পাশে থাকতো ভালোবাসার মানুষ, নিজের যোগ্যতা, সামর্থ্যের প্রমান দিয়ে অনেকদূর চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে জীবন পাল্টে গেছে একেবারে, লেখালেখিটা তার একটা অবলম্বন, ঢাল, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না, এই বিশাল পৃথিবীতে নিজের একাকীত্ব ঘোচানোর জন্যই আশ্রয় নেয়া কম্পিউটার আর কি-বোর্ডে। নিজেকে অসহায় ভাবতে ভালো লাগে না, কিন্তু একাকী একজন মানুষ হিসেবে তারচেয়ে অসহায় এই পৃথিবীর আর কেউ হয়তো নেই।

* * *

মশিউর ভালো ক্রিকেট খেলতো একসময়, প্রথম বিভাগেও খেলেছে কিছুদিন, তবে

তখন খেলাটাকে পেশা হিসেবে নেয়ার চিন্তা মাথায় আসে নি, খেলা হিসেবে ক্রিকেট ছিল শৌখিন একটা ব্যাপার। পড়াশোনায় খারাপ ছিল না, তবে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় আড্ডাবাজিতেই বেশিরভাগ সময় চলে যেত, এই বন্ধুদের সাথেই একসময় নেশায় হাতে খড়ি, শুরু হলো গাঁজা দিয়ে, তারপর ফেন্সিডিল। প্রতিদিন ফেন্সিডিলের টাকা জোগাড় করা ছিল দারুন মুশকিল, বেশিরভাগ সময় বন্ধু-বান্ধবের উপর ভর করেই চালিয়ে যেত, গ্রুপে দু'একজন বন্ধু ছিল যারা এসব ব্যাপারে উদার হস্ত, কিন্তু একসময় সবারই চোখে পড়ে গেল যে মশিউর ফ্রি খায়। ব্যাপারটা লজ্জাস্কর। লজ্জা কাটাতে এরপর নিজেই টাকা জোগাড় করতো এবং এই টাকা জোগার করতে গিয়ে দেখতে দেখতে সে একদম নীচুতে নেমে এলো। পড়াশোনায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও কোনমতে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছিল, তারপর আর পড়াশোনা হয়নি। বাবা মারা গিয়েছিল অনেক আগেই, বড় ভাই সফিউর সব আগলে রেখেছিল, দুবাই থেকে যে টাকা পাঠাতো, তাতে ছোট সংসার সুন্দর চলে যেত। বড় ভাইয়ের পাঠানো সংসারের খরচের টাকা হিসেবের টাকা, সেই টাকা থেকে ফেন্সিডিল খাওয়া যায় না, তবু মায়ের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে টাকা আদায় করতো মশিউর। তারপর একসময় মা মারা গেলেন, সেটা প্রায় সাত বছর আগের কথা। বড় ভাই সফিউর খবর পেয়েছিল ছোট ভাই 'ডাইল' খেয়ে খেয়ে উচ্ছন্নে গেছে, কাজেই সেও খরচ পাঠানো বন্ধ করে দিল। উপায় না পেয়ে বাসার আসবাব কিছু বিক্রি করল, তারপর গ্রামের জমি বিক্রি করল। কিছু টাকা হাতে আসার পর বেশিরভাগটাই নেশার পেছনে উড়াল।

হাত খালি হওয়ার পথে এক বন্ধুর বুদ্ধিতে শেয়ার মার্কেটে ঢুকল। বাকি টাকাটা সেখানে উড়ে গেল সহজেই। একদম চোখের নিমিষে। কাজেই একদম কপর্দকশুন্য হয়ে গেল মশিউর। এইসময় একটা কাজই করার ছিল, সেটা হচ্ছে চুরি-চামারি করা।

চুরি-চামারি করতেও ভাগ্য লাগে আর লাগে বুদ্ধি। যেখানে সেখানে চুরি করা যায় না, বন্ধুর বাসায় গিয়ে সেখান থেকে কিছু চুরি করে আনতে আত্মসম্মানে লাগত, একসময় বুঝতে পারল, ছোটবেলা থেকে যেসব বড়লোক বন্ধুদের সাথে বড় হয়েছে ওরা যদি একটু সাহায্য করে তাহলেই হয়। চুরি-চামারি করা কিংবা বিদেশ পাঠানোর কথা বলে কারো টাকা মেরে দেয়া এইসব ফালতু কাজগুলো আর করতে হয় না।

কাজেই খুব বেশি চিন্তাভাবনা না করে ছোটবেলার এক বন্ধুর কাছে হাত পাতল, একটা ব্যবসা শুরু করবে, পুঁজি দরকার। বন্ধু-বান্ধবরা আড্ডা, গল্পবাজিতে বড়লোক হলেও টাকা ধার চাওয়ার পরেই মনে হলো সবাই একসাথে গরীব আর দুস্থ হয়ে গেছে, কারো কাছে কোন টাকা নেই, সব টাকা ব্যবসায় খাটানো, সহজে উঠবে না, আর উঠলেও সেই টাকা ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বুঝে গিয়েছিল মশিউর।

একটাই উপায় ছিল, বড় রকমের একটা চুরি করা, যাতে একবার চুরি করে বেশ কয়েকবছর শান্তিতে কাটানো যায়। তবে বড় চুরি করতে সাহস লাগে, তাই দেরি না করে ছোট একটা চুরি করল মশিউর, এক বন্ধুর ভরা ম্যানিব্যাগ গায়েব করে দিল,

বন্ধুটি বুঝেছে কি না জানে না, কিংবা বুঝলেও হয়তো অস্বস্তির কারনে কিছু বলে নি, কিন্তু ঘটনা চাপা থাকলো না, ঐ বন্ধুটি সময় সুযোগ বুঝে একদম ভরা মজলিশে অপমান করে ছাড়লো তাকে। বন্ধুটি বিশাল ধনী, সামান্য ক'টা টাকা না হয় বাধ্য হয়েই নিয়েছে, তাই বলে বাকি সব বন্ধু-বান্ধবের সামনে তাকে অপমানটা না করলেও পারতো, ঘটনাটা এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়, মনে পড়লেই শরীর শক্ত হয়ে যায়। সেদিন সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই অপমানের শোধ নিয়ে ছাড়বে। শোধ নেয়া হয়নি, উল্টো এরপরের ঘটনা হলো আরো ভয়াবহ, টানা তিনবছর জেল খাটতে হলো, বন্ধুর বেইমানীর কারনে। বছর খানেকের উপর হলো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে সে, কিন্তু জেলফেরত একজন মানুষের সমাজে সেই আগের মর্যাদা থাকে না, পুরানো বেশিরভাগ লোকই তাকে এড়িয়ে চলে, নতুনরাও জেনে যায়, মাদকব্যবসার কারনে জেল খাটা ঘাঘু মশিউর, লেনদেনে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।

জীবনটাই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে, সব কিছুর শোধ একসময় না একসময় নেয়া হবে, অপেক্ষা শুধু ভালো একটা সময়ের।

কিছু কিছু মানুষের জীবনে ভালো সময় কখনই আসে না, যেমন মশিউরের জীবনে ভালো সময় আসে নি কখনো। চুরি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, চোরাকারবারি, শেয়ার বাজারে ব্যবসাসহ এমন কিছু বাদ নেই যে সে চেষ্টা করে দেখে নি, তবে কিছুতেই কিছু হয়নি, হবেও না। এখন বয়স প্রায় আটত্রিশ, এমনিতে লম্বা, স্বাস্থ্য মোটামুটি, গায়ের রঙ শ্যামলা আর কথাবার্তায় পাকা বলে এখনো টিকে আছে, তবু এই বয়সেও তাকে প্রতিদিন চিন্তায় থাকতে হয় কিভাবে কালকের দিনটা কাটবে। আজকেও এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এনেছে, সেই টাকা শেষ হতে সময় লাগে নি, পাওনাদারের সংখ্যা তো আর কম না। এক একজনকে ঋন শোধ দিয়ে ঠান্ডা রাখতে হয়, নাহলে পরে ধার পাওয়া যাবে না। বিকেলের দিকেই বাসায় ফিরেছে, ক্লান্ত লাগছিল, সোজা বিছানায় গিয়ে একটা ঘুম দিয়েছিল মশিউর, উঠেছে ঠিক রাত এগারোটায়। বাসায় এক বুয়া এসে রান্না করে দিয়ে যায়, সেই ভাত-তরকারি টেবিলে বাড়া, খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, নেশা করার বন্ধু-বান্ধবদের সবাইকে কোথায় পাওয়া যাবে ভালো করেই জানে, তবে শরীরটা ভালো লাগছিল না, এক ঘুমে রাত কাবার করে দিতে পারলে ভালো লাগতো।

নেশা করতেও ইচ্ছে করছিল না বলে টিভি ছেড়ে পুরানো দিনের ইংরেজি সিনেমা দেখা শুরু করল। সাদাকালো ছবি, তবে দেখতে গিয়ে এমনভাবে ডুবে গেল

যে রাত একটার দিকে মোবাইল ফোনটা যখন বেজে উঠল তখন প্রায় চমকে উঠেছিল মশিউর, এই রাত-বিরেতে ফোন করতে পারে একজনই, তার পাওনাদার, মোহসিন ভাই। ছয়মাসের কথা বলে এক লাখ টাকা নিয়েছিল, এখনো ফেরত দেয়নি। ফেরত দেবে কী করে, সেই টাকা এখন শেয়ার মার্কেটের আইটেমে আইটেমে ঘোরাঘুরি করছে। এই টাকা এখন তুলে ফেললেই লস, এটা কে বোঝাবে

মোহসিন ভাইকে।

অচেনা নাম্বার থেকে অবশ্য ফোন দেয়ার কথা না মোহসিন ভাইয়ের। অন্য কেউ হতে পারে।

কল রিসিভ করল মশিউর।

"কে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"কেমন আছো, মশিউর?"

"আপনে কে?"

"কেমন চলছে তোমার, মশিউর?"

বিরক্ত হলো মশিউর, পুরানো কোন বন্ধু হবে, রাত-দুপুরে ফোন দিয়ে আলগা মজা নেয়ার চেষ্টা করছে।

"আমার তো ভালোই চলে, তোমার কি অবস্থা?"

"তোমার সাথে একটা লেনদেন বাকি আছে, মনে পড়ে মশিউর?"

"কতো লোক যে আমার কাছে টেকা পায় আমি নিজেই জানি না, তয় ওরা আমারে ফোন দেয় না, কেন দেয় না জানো?"

"কেন?"

"কারন আমি ট্যাকা ফেরত দিমু না," বলে হো হো করে হাসল মশিউর, "এখন ফোন রাখ। ঘুমামু।"

"কিন্তু আমার ঋন তো শোধ করতেই হবে তোমাকে।"

"তুই আয়, নিয়া যা কী পাস?"

"সাতদিন সময় দিলাম, গুছিয়ে নাও," ওপাশ থেকে বলল।

"মনে কর সাতদিন শেষ, এখন কী করবি, কর।"

"রাখি। ঠিক সাতদিন।"

ফোনটা রেখে দিল ওপাশ থেকে। মোবাইল ফোনটা সোফার উপর ছুড়ে মারল মশিউর। সারাজীবনে নেশা করতে গিয়ে কতো মানুষের সাথে দুই নাম্বারি করেছে তা নিজেও জানে না। এদের কেউ হয়তো হবে। তবে কাউকে পরোয়া করে না সে। এমন কিছু লোকজনের সাথে উঠাবসা আছে তার, চাইলে যে কাউকে উঠিয়ে এনে গায়েব করে দিতে পারবে। কেউ তার টিকিটিও খুঁজে পাবে না। তবে হুমকিদাতার মনে হয় কোন ধারনাই নেই মশিউর সম্পর্কে। ভুল জায়গায় নক করেছে।

নেশা করার ইচ্ছে ছিল না, মেজাজটা বিগড়ে গেছে বলে টিভি বন্ধ করে বেডরুমে ঢুকল। এখন মাথাটা একটু ঠান্ডা করা দরকার। স্টকে পর্যাপ্ত পরিমান জিনিস থাকে, আলমারীর ভেতর থেকে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গোলাকার জিনিসগুলো বের করে আনল। এবার ডুব দেয়া যায়, গভীর জলে, কারো পরোয়া কোনদিন করে নি সে, করবেও না। সামান্য হুমকিতে কিছুই যায় আসে না।

অধ্যায় ৪

মাত্র একজন ছেলে টিকেছে, সেই ছেলেটার প্রোফাইল দেখে খুব একটা ভরসা পেলেন না আবু জামশেদ, বেশ লম্বা ছেলেটা, স্বাস্থ্য ভালো, তবে মাথা ভর্তি লম্বা চুল, দাঁড়িগোঁফে মুখটা প্রায় দেখাই যায় না। ছেলেটাকে এখনো খবরটা জানানো হয়নি, একটু পর আসবে, ডাকা হয়েছে, ইচ্ছে করলে ওকে বাতিলও করে দিতে পারেন, কিন্তু যে ছেলে শারিরীক, মনস্তাত্ত্বিক সব পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়েছে তাকে বাতিল করে দেয়াটাও অমানবিক।

কম্পিউটারে ওর ফাইলটা দেখছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করেছে ইকোনমিক্সে, সেখানে খুব ভালো রেজাল্ট, তারপর একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ, সেই ছেলে কর্পোরেট কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে এ ধরনের চাকরি করবে বলে মনে হয় না। ফাইলে পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি, চুল ছোট করে ছাঁটা, স্বাস্থ্যও আরো ভালো ছিল, বাবা-মা মারা গেছে ছোটবেলাতেই, মামার কাছে মানুষ, ওর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে খোঁজখবর করা শেষ। ইউনিভার্সিটিতে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল খুব কম, কবিতা লিখতো একসময়, একটা বইও বেরিয়েছিল। এই ছেলে হোমিসাইডে কী কাজ করবে! একবার কারো উপর কবিতা ভর করলে সেটা নাকি সারাজীবনের জন্য স্থায়ি হয়ে যায়, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট কবিদের জন্য নয়।

পিয়ন এসে খবর দিল, শাহরিয়ার জামিল নামে একজন এসেছে, দেখা করতে চায়। তিনি অনুমতি দিলেন, এই ছেলেটার প্রোফাইলই দেখছিলেন কম্পিউটারে।

"মে আই কাম ইন, স্যার?" দরজার বাইরে থেকে বলল ছেলেটা।

"কাম ইন।"

শাহরিয়ার জামিলকে ঢুকতে দেখলেন, এই ছেলেটাকে শিল্পী হিসেবে ভালো মানাতো, অথবা গায়ক কিংবা চিত্রকর, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে মোটেই মানাবে না।

অনুমতি নিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল ছেলেটা।

তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে বসা শাহরিয়ার জামিলের দিকে, ওকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা এবং একই সাথে ওর মানসিক অবস্থাটা পর্যবেক্ষন করে নিচ্ছেন।

"তুমি করে বলছি, কিছু মনে করো না," বললেন তিনি, "শাহরিয়ার, তুমি কি জানো মানুষ কেন পাহাড়ে উঠতে চায়?" প্রশ্ন করলেন বেশ কিছুক্ষন সময় নিয়ে।

"প্রশ্নের উত্তরটা খুব ছোট স্যার," শাহরিয়ার বলল, তার মুখে হাসির রেখা দেখা গেল, বোঝা যাচ্ছে আবু জামশেদের টেকনিকটা সে ধরতে পেরেছে, প্রশ্নকর্তা পরীক্ষা করে দেখছে, অদ্ভুত সব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী প্রতিক্রিয়া হয় তার, "বিপদের

মুখোমুখি দাঁড়াতে ভালোবাসে মানুষ। বিপদ যতো বড়, বিনোদনও ততো বেশি।"

"তুমিও তাই, মানে বিপদের মুখোমুখি হতে পছন্দ করো?"

"জি, না, স্যার। আমি বিপদ এড়িয়ে চলতে চাই, তারপরও বিপদ চলে আসে, আমাকে তারা খুব আপন ভাবে।"

"আচ্ছা, ধরো, তোমাকে আজকেই জয়েন করতে বলা হলো, প্রথম কাজ তুমি কী করবে?"

"কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার অনুমতি নিয়েই চুল কাটাবো, সেভ করবো তারপর ফিটফাট হয়ে আবার অফিসে আসবো।"

"তাহলে যাও," বললেন তিনি, "ঠিক দুই ঘন্টা সময় দেয়া হলো তোমাকে। একটা বিশেষ পরীক্ষা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।"

শাহরিয়ার বেরিয়ে গেল। এই ছেলে বেশ আত্মবিশ্বাসি।

* * *

ইন্টারোগেশন রুম, রুমটা ছোট, একটাই মাত্র দরজা। মাঝখানে একটা টেবিল, দু'পাশে দুটো চেয়ার। মাথার উপর একশ ওয়াটের একটা বাতি জ্বলছে। রুমের একপাশের দেয়ালে আয়তাকার একটা আয়না। আয়নার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আবু জামশেদ, পাশে শাহরিয়ার। দুজনের দৃষ্টি ইন্টারোগেশন রুমে বসে থাকা মধ্য বয়স্ক একজন মানুষের দিকে।

শাহরিয়ার চুল কাটেনি, সেভও করে নি, যে সেলুনে দীর্ঘদিন পর পর চুল কাটায় এবং সেভ করে, সে দোকান বন্ধ, তবে চুল এলোমেলো না করে পেছনে ঝুঁটি করে বেঁধেছে, ধবধবে সাদা শার্টের সাথে কালো প্যান্ট, নতুন একজোড়া কালো জুতো, তাকে দেখতে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। অন্তত ঘন্টা দুই আগের চেয়ে বেশ প্রফেশনাল মনে হচ্ছে। আবু জামশেদ কিছু বলেন নি, বাহ্যিক দিক দেখে কখনো কাউকে বিবেচনা করেন নি, এই ছেলে তার সেই ধারনাকে সঠিক প্রমান করবে বলেই বিশ্বাস।

ইন্টারোগেশন রুমে যে লোকটা বসে আছে, সে একজন ব্যাংকার, নাম ইমতিয়াজ আহমেদ। ভালো বেতন পায়, বয়স পয়ত্রিশের কাছাকাছি। স্বামি-স্ত্রি দুজনের সংসার, প্রেম করে বিয়ে, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এখন যখন সন্তান নেয়ার চিন্তা শুরু করেছে দুজন, তখনই ঘটেছে দূর্ঘটনা, ইমতিয়াজ অফিসের অডিটের কাজে ঢাকার বাইরে ছিল, গিয়েছিল তিনদিন আগে, গতকাল রাতে ফেরার কথা, সে অনুযায়ীই ঢাকায় ফিরেছে, ঢাকার বাইরে থাকা অবস্থায় স্ত্রি ফারজানার সাথে মোবাইলে কথা হয়েছে, তবে সমস্যা হয়েছে, গতকাল সকাল থেকেই ফারজানার ফোন বন্ধ ছিল।

ব্যাপারটা ইমতিয়াজ কাউকে জানায় নি, কারন মাঝে মাঝেই ফোন বন্ধ থাকে ফারজানার, চার্জ দিতে ভুলে যায়, গাড়ি নিয়ে বেশ রাতে ঢাকায় ফেরে সে, বারবার কলিং বেলে চাপ দেয়, ধাক্কা দেয়, মোবাইলে কল করে, কিন্তু ভেতর থেকে ফারজানার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোককে খবর দেয়, তারপর দুজনে মিলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে ফারজানা বেডরুমে মৃত অবস্থায় সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলছে, এরপর পুলিশে খবর দেয়া হয়, পুলিশের পাশাপাশি এই কেসে যোগ হয় হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।

পুলিশের ধারনা এটা খুব সাধারন একটা আত্মহত্যার কেস, ময়না তদন্ত হয়নি এখনো, হলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে, মেয়ের পরিবার জানে না তাদের মেয়ে কেন আত্মহত্যা করেছে, তবে ইমতিয়াজকে নিয়ে কোন সন্দেহের কথা বলে নি কেউ। ভদ্রলোককে তাই থানায় আটক করা হয়নি, শুধু ঢাকা ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আবু জামশেদের ধারনা ভিন্ন, ইমতিয়াজ যখন থানা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এক কাপ কফি খাবার আমন্ত্রন দিয়ে তাকে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসা হয়েছে। ইমতিয়াজ আসতে রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু বুঝতে পারছিল এটা নিছক কোন আমন্ত্রন নয়, প্রয়োজনে তার উপর জোরজবরদস্তি করা হবে। কাজেই ঝামেলা না করে হোমিসাইডের অফিসে এসেছে এবং তারপর থেকে ইন্টারোগেশন রুমেই বসে আছে। কোন ধরনের রিমান্ডে নেয়া ছাড়া এ ধরনের ইন্টারোগেশন অবৈধ, তবে সবকিছু নিয়ম মেনে চলতে গেলে সব অপরাধিরাই ছাড়া পেয়ে যাবে। কাজেই আবু জামশেদ ব্যাপারটাতে খারাপ কিছু দেখছেন না।

"ভদ্রলোকের নাম ইমতিয়াজ আহমেদ, উনার স্ত্রি গত রাতে সুইসাইড করেছে," তিনি বললেন। "উনি ঢাকার বাইরে ছিলেন, রাতে ফিরে এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন স্ত্রি সিলিং ফ্যানে ঝুলছে।"

"আচ্ছা।"

"তোমার কী ধারনা ভদ্রমহিলা সুইসাইড করেছেন, না তার মৃত্যুর পেছনে এই ভদ্রলোকের হাত আছে?"

"আমি উনার সাথে কথা বলতে চাই," শাহরিয়ার বলল।

"কিন্তু তুমি তো এখনো জয়েনই করো নি," আবু জামশেদ হাসলেন, তারপর ভাবলেন একমুহূর্ত, "এসো আমার সাথে," বলে রুমের বাইরে চলে এলেন তিনি, পেছন শাহরিয়ার।

ইন্টারোগেশন রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শাহরিয়ারের দিকে তাকালেন।

"যাও।"

দরজা লক করা ছিল, খুলে দিলেন। শাহরিয়ার ভেতরে ঢুকলে তিনি চলে এলেন টু-ওয়ে মিররের সামনে। এই ছেলে কিভাবে ইন্টারোগেশন করে তা দিয়েই বোঝা যাবে ভেতরে কিছু আছে কি না।

* * *

শাহরিয়ার বসেছে চেয়ারটায়, উল্টোদিকে বসা ইমতিয়াজ আহমেদের দিকে তাকিয়ে আছে। অল্প বয়স্ক একটা ছেলেকে দেখে ইমতিয়াজের কোন ভাবান্তর হলো না, তার চেহারায় রাগ রাগ ভাব।

"দেশে এখনো আইন কানুন আছে, এভাবে আমাকে আটকে রাখতে পারেন না আপনারা," ইমতিয়াজ বলল, "আর আপনি এসেছেন কেন? আপনার বসকে ডাকুন।"

"ভাই," শাহরিয়ার বলল, "আপনি কিন্তু ক্রিমিনাল না। সাধারন মানুষ, ব্যাংকে চাকরি করেন, এই ঝামেলাটা বাঁধালেন কেন?"

"কোন ঝামেলা? আমি কেন ঝামেলা বাঁধাতে যাবো? ও যে সুইসাইড করবে আমাকে জানিয়ে করেছে নাকি? অদ্ভুত!"

"ইশারাও দেয় নি?"

"না," থমথমে গলায় বলল ইমতিয়াজ। তাকে হঠাৎ বিষন্ন মনে হচ্ছিল।

"হু," উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছে। মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল, তারপর ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল, "আমার মোবাইল ফোনটা একদম গেছে, নতুন আরেকটা কিনতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি অনেক বই পড়েন তাই না? বিশেষ করে ক্রাইম থৃলার?"

"না, বই পড়ার অভ্যাস আমার নেই।"

"তাহলে সিনেমা দেখেন নিশ্চয়ই।"

"না, সিনেমাও দেখি না। আর এসব আলতু ফালতু প্রশ্ন করছেন কেন?"

"কি করবো বলেন? বসের ধারনা আপনি এই খুনের সাথে জড়িত, কিন্তু আমার বিশ্বাস খুনটা আপনি করেননি।"

"আপনার বসের ধারনা আমি খুনি? কী সব বলছেন? আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম, ফিরে এসে দেখি এই অবস্থা, আমার সাথে আরো লোকজনও ছিল। তাদের জিজ্ঞেস করুন, এটা পরিষ্কার সুইসাইড," ইমতিয়াজ বলল।

"সেখানেই তো সমস্যা," শাহরিয়ার বলল, "তাদের মধ্যে কেউ একজন আপনাকে সন্ধ্যায় দেখেছে, বাসায় ঢুকতে।"

"তারমানে কি? কে দেখেছে? দেখবে কী করে? আমি তো তখন হাইওয়েতে, ড্রাইভ করছিলাম।"

"আপনার ড্রাইভার নেই?"

"ড্রাইভার আছে, ছুটিতে, ওর গ্রামের বাড়িতে গেছে।"

"ও আচ্ছা। কিন্তু যে লোকটা বলেছে আপনাকে সন্ধ্যায় বাসায় দেখেছে সে কিন্তু একশো ভাগ নিশ্চিত, আপনাকেই দেখেছে।"

"আপনি ব্লাফ দিচ্ছেন," ইমতিয়াজ হাসল, "এসব আজে-বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। আমি এমনিতেই মেন্টালি আপসেট।"

"আচ্ছা, ধরে নিলাম আপনি খুন করেন নি, তাহলে কে খুন করলো আপনার স্ত্রি'কে এবং কেন?"

"আমি জানি না," ইমতিয়াজ বলল, "আমাদের মধ্যে কোন ঝামেলা ছিল না, তবে ও কী ভেবে এই কাজটা করতে গেল সেটাই মাথায় আসছে না।"

"কে কী করেছে?"

"আমার স্ত্রি, ফারজানা, সুইসাইড করেছে! কী অদ্ভুত! আপনি কী ভাবছিলেন?"

"কিন্তু আপনার স্ত্রি তো সুইসাইড করেননি। তাকে খুন করা হয়েছে, একটু আগে আমরা ময়না তদন্তের রিপোর্টও পেয়েছি।"

"রিপোর্টে কী এসেছে, জানতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন। তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। তবে মারার আগে রেপ করা হয়েছিল, তার প্রমানও পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কিছুক্ষন পরই মৃতদেহ বেডরুমে নিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝোলানো হয়েছে।"

"রেপড হয়েছিল? কী বলছেন এইসব!"

ইমতিয়াজের চেহারায় বিস্ময়, রাগ সব একসাথে খেলা করছিল, লোকটা ভালো অভিনেতা, মনে মনে ভাবল শাহরিয়ার।

"কে রেপ করেছিল সেটাও আমরা বের করে ফেলেছি। আপনার ড্রাইভার! তাকে ধরতে লোক পাঠানো হয়েছে, যেকোন সময় ধরে ফেলবে।"

"আপনারা তো দেখি খুব তড়িতকর্মা, যাই হোক, খুনি যেহেতু ধরেই ফেলেছেন তাহলে আমাকে আটকে রেখে কী লাভ! তবে ড্রাইভারকে আমি বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রিকে ছেলেটা খুব সম্মান করতো।"

"সেটা তো আর আমাদের জানা নেই," শাহরিয়ার চেয়ারে বসল আবার, "চা-কফি কিছু খাবেন?"

"না," ইমতিয়াজ বলল, "আমাকে যেতে দিচ্ছেন কখন?"

"এক্ষুনি যেতে পারেন," হেসে বলল শাহরিয়ার, "তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, ক্রিমিনালদের সাধারন কিছু গুন আছে, কিংবা ওগুলোকে দোষও বলা যায়, ব্যাপারটা আসলে আপেক্ষিক। তো এসব গুনের তেমন কিছুই আপনার মধ্যে নেই। একটা গুনই আছে আপনার, বলবো?"

উঠে দাঁড়িয়েছে ইমতিয়াজ, সামনে বসা অল্প বয়স্ক তরুনের কথায় কান দিচ্ছে না আপাতত। এখান থেকে বেরুতে পারলে হয়। বড় বড় লোকজনের সাথে তার ভালো পরিচয় আছে, বিশেষ করে ব্যাংকের কিছু বড় কাস্টমার, এদের কাউকে দিয়ে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের নাক গলানো বন্ধ করা দরকার।

"বলুন।"

"মিথ্যে বলাটাকে আপনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, মি. ইমতিয়াজ।"

"আপনার যা খুশি বলতে পারেন। আপত্তি নেই। আমি বাসায় যাবো, শরীর খারাপ লাগছে," ইমতিয়াজ বলল দরজার দিকে এগুতে এগুতে।

ইমতিয়াজ বেরিয়ে গেলে আবু জামশেদের কাছে গেল শাহরিয়ার।

তিনি চেয়ারে বসে সব দেখছিলেন, শুনছিলেন।

"তুমি উনাকে এভাবে যেতে দিলে?" আবু জামশেদ বললেন।

"জি।"

"এখানে ড্রাইভারের গল্পটা বলার কী দরকার ছিল? আর মেয়েটা তো রেপড হয়নি, তুমি এতগুলো ডাহা মিথ্যে কথা বানালে?"

"জি।"

"কারনটা কী জানতে পারি?"

"পারেন, তার আগে ইমতিয়াজ সাহেবের মোবাইল ট্র্যাক করার ব্যবস্থা করুন, উনি কোথায় কোথায় ফোন দিচ্ছেন আগামি এক ঘন্টার মধ্যে সেগুলোও ট্র্যাক করুন। খুনি পেয়ে যাবেন।"

"এতো সহজ সমাধান! আর তুমি কী করে এতো নিশ্চিত হলে মেয়েটা সুইসাইড করেনি।"

"মেয়েটা সুইসাইড করেনি। তবে মেয়েটা জেনে গিয়েছিল অডিটের নাম করে ইমতিয়াজ দু'তিন দিন বাড়ি ফেরে না, এই সময়টা সে তার অন্য এক প্রেমিকার সাথে কাটায়। ইমতিয়াজকে হুমকি দিচ্ছিল মেয়েটাকে না ছাড়লে সে সুইসাইড করবে।"

"তুমি এতো বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছো কেন? এসব তথ্য তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"ভদ্রলোকের স্ত্রি মারা গেছেন, অথচ উনাকে একবারও মন খারাপ করতে দেখে নি, মুখ কালো করে বসেছিলেন রুমটায়, এটুকু আসলে অভিনয়। এই পুরো সময়টা তিনি মোবাইল ফোনের ম্যাসেঞ্জারে চ্যাটিং করেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে, এসএমএস করেছেন, ফেইসবুকে গুতাগুতি করেছেন, একজন স্বাভাবিক মানুষ আপনজনের মৃত্যুর পর এরকম অদ্ভুত আচরন করতে পারে না। আপনি তার মোবাইল ফোনটা নিলেই জানতে পারবেন। এছাড়া মেয়েটা কোন সুইসাইড নোট রেখে যায়নি, তাদের দাম্পত্য কলহের কথা জানতো কেবল মেয়ের বাবা-মা, তবে তারা ইমতিয়াজকে সন্দেহ করতেন না, ইমতিয়াজ বুদ্ধিমান, শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে ভালোমতোই নিজের হাতে করে নিয়েছিল, উনারা ভাবতেন তাদের মেয়েই হয়তো স্বামিকে ভুল বুঝছে। তাই মেয়ের সুইসাইডে তারা আপসেট হলেও জামাইকে দোষী মনে করছেন না, তবে আমার মতে একটা মেয়ে এভাবে হঠাৎ সুইসাইড করতে পারে না।"

"ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু তুমি কিভাবে বুঝলে সে ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জারে চ্যাটিং করছিল?"

"উনার চারপাশে কিছুক্ষন হাঁটাহাঁটি করে, উনি মোবাইল ফোনটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তার আগেই দেখেছি উনি কী করছিলেন।"

"খুনি কে হতে পারে তোমার ধারনা?"

"উনি নিজ হাতে খুন করেন নি, শক্ত অ্যালিবাই আছে। বদ্ধ রুমের মধ্যে স্ত্রিকে পাওয়া গেছে, তিনি প্রতিবেশিকে সাথে নিয়ে দরজা ভেঙেছেন, কাজেই তাকে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কেউ একজন খুন করে বাসার মধ্যেই ছিল, পরে সুযোগ বুঝে বেরিয়ে গেছে।"

"কে?"

"সম্ভবত উনার ড্রাইভার? সন্ধ্যার দিকে ড্রাইভার বাসার দরজায় নক করে, ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দেয়ার পরপরই ড্রাইভার সুযোগ বুঝে তাকে গলা টিপে মারে, তারপর সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে দেয়।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"একদম নিশ্চিত নই। তবে নিশ্চিত হবো, ইমতিয়াজ সাহেব যদি এখান থেকে বেরিয়েই ড্রাইভারকে ফোন দেন তাহলে। তিনি নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে বলবেন গা ঢাকা দিতে। আর উনার প্রতিবেশিদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে ঘটনার দিন রাতে ড্রাইভারকে কোথাও দেখা গেছে কি না।"

"তুমি এতোক্ষন যা বললে সব তোমার ধারনা, তারপরও দেখছি কী করা যায়," বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন আবু জামশেদ। ইমতিয়াজ আহমেদের মোবাইল ফোনে আড়ি পাতা কোন সমস্যা নয়। তিনি একজনকে ডেকে দায়িত্ব দিলেন, আগামি চব্বিশ ঘন্টায় কোন কোন নাম্বারে ভদ্রলোক ফোন করছেন এবং কোন কোন নাম্বার থেকে তার কাছে কল আসছে সেগুলো ট্র্যাক করার জন্য।

একা একা রুমে বসে রইল শাহরিয়ার। পুরো ঘটনাটা এরকম নাও হতে পারে, তবে সম্ভাবনা প্রচুর। একসাথে থেকেও একজন মানুষ কাছের মানুষকে চিনতে পারে না।

একজন পিয়ন এসে ঢুকল কিছুক্ষন পর, বয়স্ক মানুষ। হাতে একটা সাদা খাম। শাহরিয়ারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

খামটা খুলল শাহরিয়ার। জয়েনিং লেটার। আগামিকাল থেকেই যোগ দিতে বলা হচ্ছে তাকে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে, পদবি : জুনিয়র ইনভেস্টিগেটর।

সিদ্ধান্তটা ভুল না সঠিক জানে না শাহরিয়ার, তবে বুঝতে পারছে কাজটা সে উপভোগ করবে। আজকের দিনটা একটু আনন্দ করা যাক, তবে সমস্যা হচ্ছে বন্ধু-বান্ধব তেমন একটা নেই, আনন্দ যা করার একা একাই করতে হবে। খামটা সাবধানে পকেটে ভরে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

অধ্যায় ৫

ঢাকায় ফেরাটা সহজ ছিল না, বেশ কিছু কাজ বাকি ছিল, সেগুলো শেষ করে ক্রিস্টিনাকে নিয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে পা রেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো তুষারের। হাল্কা একটা গরম ভাব চারদিকে, বাতাসে ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ, মানুষজনের কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, তীর্যক চাহনি সব কেমন খুব আপন লাগছিল। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর নিজভূমে ফিরলে বোধহয় এমনই লাগে। ক্রিস্টিনা চারদিকে তাকাচ্ছে, দৃষ্টিতে বিস্ময়, এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় দুজন একসাথে ঘুরেছে, কিন্তু এবার ক্রিস্টিনার চেহারায় সত্যিকারের আনন্দ চোখে পড়ল। মনে মনে নিজেকেই একরকম দায়ি করতো মেয়েটা, ভাবতো তুষারের ঢাকা আসার পথে সে-ই বাঁধা, তুষারের পরিবার কিংবা সমাজ তাকে সহজে মেনে নেবে না বলেই তুষার দেশে ফিরতে চায় না। তবে আজ ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে এই ধারনাগুলো কিভাবে কিভাবে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কাউকে জানান হয়নি, আইডিয়াটা ক্রিস্টিনা'র, সবাইকে দারুন একটা সারপ্রাইজ দেয়া হবে তাহলে। এয়ারপোর্টের ভেতরেই রেন্ট-এ-কার সার্ভিস থেকে একটা টয়োটা সেডান ভাড়া নিলো তুষার, ব্যাগগুলো অনেক ভারি হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য কমবেশি উপহার কেনা হয়েছে, এতোদিন পর দেশে ফিরছে, সাথে করে কিছু না নিয়ে গেলে মন খারাপ করবে।

ধানমন্ডির উদ্দেশ্যে গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ঢাকার পরিবর্তনগুলো বড় চোখে লাগছে, গত চৌদ্দ বছরে অনেক বদলে গেছে ঢাকা, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া বেড়েছে, লোকসংখ্যাও বেড়েছে আশংকাজনকহারে। ক্রিস্টিনা অবশ্যই সবকিছুই উপভোগ করছিল, দীর্ঘ বিমানযাত্রার পর ঘুমে চোখ লেগে আসছিল দুজনের, জেট-ল্যাগে, তবু চোখ খোলা রেখেছে তুষার, মাসখানেকের ছুটিটা পুরো কাজে লাগাতে হবে, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে। আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে দেখা করতে হবে, সময় থাকলে একবার সিলেট কিংবা কক্সবাজারে যাওয়ার ইচ্ছেও আছে। এরপর আবার কবে আসা হয় কে জানে।

"আমার কেমন জানি লাগছে, মনে হচ্ছে আমি তোমার মতোই, বিদেশি, সবকিছুই অচেনা লাগছে," তুষার বলল, তার কাঁধে মাথা রেখেছে ক্রিস্টিনা, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে বাইরে বাস-প্রাইভেট গাড়ির তুমুল গতি প্রতিযোগিতা।

"আর?"

"মনে হচ্ছে, আমার আর ফেরা হবে না," তুষার বলল, কেন একথা বলল জানে না, ক্রিস্টিনাও অবাক হয়েছে, চোখ তুলে তাকিয়েছে তুষারের দিকে।

"ফেরা হবে না মানে? তুমি এখানেই থেকে যেতে চাও?"

"যদি সত্যি সত্যি থাকতে চাই?" উল্টো প্রশ্ন করল তুষার।

"তুমি থাকলে আমিও থাকবো, তোমাকে নিয়েই তো আমার সবকিছু," ক্রিস্টিনা বলল, গলার স্বর কিছুটা ভারি হয়ে এলো। ঠিক একারনেই ক্রিস্টিনাকে আরো বেশি ভালোবাসে তুষার, এই মেয়েটার জন্ম হওয়ার কথা বাংলাদেশে, কিভাবে যেন পশ্চিমে জন্ম নিয়ে নিলো, এতো মায়াহীন মানুষের দেশে জন্মেও এতো মায়াবতী কিভাবে হলো মেয়েটা!

উত্তরে কিছু বলল না তুষার, উত্তর চায়ও না ক্রিস্টিনা।

ড্রাইভার কী বুঝল বোঝা গেল না, তবে তার মুখে মিস্টি একটা হাসি দেখল তুষার। ট্রাফিক জ্যাম শুরু হয়েছে, জোর করে চোখ খোলা রাখতে চাইলেও পারল না, ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষনের মধ্যে। সেই ঘুম স্থায়ি হলো না বেশিক্ষন, এই অল্পসময়ের মধ্যেই খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছে, অন্ধকার একটা ঘরে মুখোশ পড়া একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রক্তমাখা একটা ছুরি, হাত ইশারায় কাছে ডাকছে তাকে।

ধানমন্ডির বাড়িটা আগের মতোই আছে, শুধু একটু পুরানো হয়েছে, দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয় না, বাবার বয়স হয়েছে, মাও তেমন শক্তি পান না শরীরে, এছাড়া যাদের একমাত্র ছেলে দেশের বাইরে থাকে তারা বাড়িঘর গুছিয়ে রাখার প্রতিও তেমন একটা সাড়া পান না নিশ্চয়ই।

বাইরের গেটটা খোলা ছিল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লাগেজ নিয়ে গেটের সামনে কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তুষার। অদ্ভুত এক আবেগ কাজ করছিল, এখানে ফেরা হলো বহুদিন পর। গেট থেকে একটু দূরেই ছিল পরেশ চাচার দোকান, দোকানটা আছে, কিন্তু এখন অনেক আধুনিক, একটু উঁকি দিয়ে দেখেছে তুষার, পরিচিত কোন মুখ চোখে পড়ল না। আগে বাসা থেকে বের হলে পরিচিত কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যেত, মনে হয় না আগের কেউ আর আছে, কিংবা থাকলেও হয়তো চিনতে পারবে না তাকে। গেটে দারোয়ান ছিল আব্বাস মিয়া, তার খবরটাও কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, বয়স হয়েছে এখন নিশ্চয়ই আর কাজ করে না।

ক্রিস্টিনা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, অল্পতেই ঘেমে গেছে, ল্যাগেজ নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কারন বুঝতে পারছিল না সে, তবে তুষারের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিল এখন কথা বলা ঠিক হবে না।

গেটের বাইরে বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না, বয়স্ক একজন মানুষকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। আব্বাস মিয়া, এখনো আছে, হয়তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই। তাকে দেখে বৃদ্ধের পায়ের জোর বেড়ে গেছে যেন, বোঝার চেষ্টা করছে যা দেখছে সত্যি কি না। নিজেকে আটকে রাখতে পারল না তুষার, লাগেজ ফেলে এগিয়ে গেল, জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধকে।

"চাচা, আমি তুষার," বলল সে, জড়িয়ে ধরে।

"বাবা, তুমি আইছ, তুমি আইছ..." বলে একইভাবে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধ দারোয়ান, এর বাইরে আর কোন কথা বেরুচ্ছে না যেন।

"বাবা-মা কোথায়?"

"আছে, ভেতরেই আছে, চলো," বলে লাগেজের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল বৃদ্ধ, তাকে সরিয়ে দিয়ে ল্যাগেজ নিয়ে গেট পার হলো তুষার, ক্রিস্টিনাও আসছে পেছন পেছন। বুঝতে পারছে স্বামির আবেগ, দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরতে পারলে বোধহয় এমনই লাগে।

আরো কিছুক্ষনের মধ্যে পুরো বাড়িটা আনন্দে মেতে উঠলো যেন, জায়গায় জায়গায় আত্মীয়-স্বজনদের ফোন করা হলো, তারা সবাই চলে আসবে বিকেলের মধ্যে, তুষারের একমাত্র ছোট বোন সুমনা থাকে উত্তরায়, সে রওনা দিয়ে দিয়েছে বাচ্চা-কাচ্চাসহ। ছেলে বহুদিন পরে এসেছে দেখে বাবা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বাজারে বেরিয়ে গেলেন, তাকে চেষ্টা করেও আটকে রাখতে পারল না তুষার।

দোতলা বাড়িটা অনেক পুরানো, ইদানিং ডেভেলপররা খুব জ্বালাতন শুরু করেছে, এই বাড়িটা ভেঙে দশতলা করতে চায়, তুষারের বাবা রাজি হন নি, তুষারও রাজি না, নিজের রুমে বসে একটা সিগারেট ধরাল। সব কিছু শান্ত হওয়ার পর কাজে নামতে হবে, বন্ধু-বান্ধব কে কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। সাতদিন সময় দেয়া হয়েছিল তাকে, তিনদিন বাকি আছে এখনো, ঢাকায় চলে এসেছে, কাজেই এখন নিশ্চয়ই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে হুমকি যে দিয়েছে তার নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তুষারকে ঢাকায় আনা প্রয়োজন ছিল লোকটার, তাই আনিয়েছে। এবার কী ঘটে তা দেখতে হবে। আর তিনদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে তা।

ক্রিস্টিনা কাপড়-চোপড় পাল্টে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে না অনেক বড় কোন জার্নি করেছে। বিকেল নাগাদ লোকজন চলে আসবে, তার আগে একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার। বিছানায় শুয়ে পড়ল তুষার, মাথার উপর পুরানো আমলের সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে, রুমে এসি আছে, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে কাজ করছে না, আব্বাস মিয়া এরমধ্যেই খবর দিয়েছে এসি'র কাজ করে এমন একজনকে। অনেক অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল তুষার। এরকম শান্তির ঘুম অনেকদিন হয়নি।

সন্ধ্যা নাগাদ আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেল পুরো বাড়িটা, একসময় এতোগুলো লোকের সাথে পরিচয় ছিল ভাবতেই অবাক লাগছে তুষারের। সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ক্রিস্টিনা, যে এখন বাঙালি সেজেছে, শাড়ি পরেছে, ভাঙা বাংলায় কথা বলে সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে। বাবা-মা আর সুমনার আনন্দ দেখে মনে হলো ওদের চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সুমনার দুটো ছেলে, যমজ, একটু

পরপর মামা মামা বলে কাঁধে ঝাপিয়ে পড়ছে। কাউকে সালাম করছে, কারো সাথে বুক মেলাচ্ছে তুষার, এরা সবাই খুব আপন মানুষ, যদিও দীর্ঘদিন এদের কারো সাথেই তার দেখা হয়নি।

ড্রইং রুমে বসে গল্প করছিল তুষার, সবার নানা ধরনের প্রশ্ন, একটা প্রশ্ন কমন, এতো দেরি হলো কেন তুষারের আসতে। এই প্রশ্নের জবাব নেই তার কাছে, প্রশ্নটা বারবার পাশ কাটিয়ে গেল। রাত ন'টার দিকে খাবার দেয়া হলো টেবিলে, খাবারের তদারকি তুষার নিজে করল। যদিও ক্লান্ত লাগছিল, তবু আনন্দও হচ্ছিল খুব। রাত দশটার পরপর সবাই চলে গেলে ড্রইং রুমে শুধু পরিবারের সদস্য ক'জন বসল একসাথে। লোকজনের মাঝে এতোক্ষন নিজেদের মধ্যেই তেমন একটা কথা হয়নি।

বাবা আর মা'র মাঝখানে বসেছে তুষার, বাবা নিয়ামত উল্লাহ, ছেলের পিঠে হাত বুলাচ্ছেন, দীর্ঘদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন, মাঝে মাঝে কাঁদছেন, তুষারের মা'রও একই অবস্থা, তুষার বাড়িতে পা রাখার পর থেকে আম্বিয়া খাতুন কেঁদেই চলেছেন, আসলে ছেলেকে দেখার আশা বাদই দিয়ে দিয়েছিলেন একরকম। চাইলে আমেরিকায় গিয়ে দেখা করা যেতো, কিন্তু এতো লম্বা জার্নি সহ্য করার মতো শারীরিক শক্তি তাদের দুজনের কারোরই নেই। সুমনা একটু দূরে বসেছে তার দুই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে এসে। ওর স্বামি জুনায়েদ দেশের বাইরে, আজ রাতটা এখানেই থাকবে বলে ঠিক করে এসেছে, সুমনার পাশে বসেছে ক্রিস্টিনা। এখানকার অনেককিছুঁই সে বুঝতে পারে নি, তবে বাবা-মা'র সাথে ছেলের দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ার আবেগটা বুঝতে পারছে।

"বাবা, তুই দেশে থেকে যা," তুষারের বাবা বললেন, "এই বাড়ি, কতো সম্পত্তি, এগুলো কে খাবে? ঐ দেশে থেকে কী লাভ, বল।"

উত্তর দিলো না তুষার, এ প্রসঙ্গে পরেও কথা বলা যাবে। মা'র হাত ধরে বসে আছে, উনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না ছেলে ফিরে এসেছে।

"তুমি চলে এসেছো, এখন আমার আর কোন দাম নেই," সুমনা বলল, কৃত্রিম অভিযোগ ফুটে উঠল ওর গলায়। বোনকে কাছে ডাকল তুষার, হাত ইশারায়, কাছে আসতেই চুল টেনে ধরল আস্তে করে।

"এতোকাল তো তুই একাই সব আদর পেয়েছিস," তুষার বলল, "আমি না হয় একটু নিলাম।"

"তুমি পুরোটাই নাও, তবু দেশে থাক," ভারি গলায় বলল সুমনা।

এই প্রসঙ্গটা বদলানো দরকার, ভাবল তুষার। কমপক্ষে একমাস থাকবে বলে ঠিক করে এসেছে, তবে মনে হয় ছুটি বাড়ানো লাগতে পারে। ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে হাসল, মেয়েটা টুকটাক বাংলা বোঝে, সেও হাসল।

"তোর জামাই আসুক, আমরা সবাই মিলে কোথাও ঘুরে আসবো," তুষার বলল।

"কোথায়?"

"যেখানে খুশি, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সিলেট," তুষার বলল।

"সে দেখা যাবে," সুমনা বলল, "এখন যাও, ভাবীকে নিয়ে। ঘুমানো দরকার তোমাদের।"

"যা বাবা," নেয়ামত সাহেব বলল, "ঘুমা গিয়ে। তোর জন্য ড্রাইভার ঠিক করে রেখেছি। কাল সকালে চলে আসবে। তারপর বৌকে নিয়ে ঘুরে বেড়াস।"

"যাবো, মা?"

"যা, কাল তোর জন্য কী রান্না করবো?"

"তোমার যা রাঁধতে ভালো লাগে।"

"ঠিক আছে।"

উঠে পড়ল তুষার। এখনো জেটল্যাগ কাটেনি, ঘুম পায় নি, তবু শুয়ে পড়া দরকার, এখানকার সময়ের সাথে শরীরের টাইমিংটা মেলানো দরকার। কাল সকাল সকাল বেরুতে হবে। বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিতে হবে। কেউ জানে না তুষার এখন ঢাকায়, এরকম একটা সারপ্রাইজ ওদের প্রাপ্য।

অধ্যায় ৬

ঠিক ন'টায় অফিসে পা রাখল শাহরিয়ার। সন্ধ্যার দিকে গিয়ে চুল কেটেছে, সেভ করেছে, সকালে আয়নায় দেখে নিজেকেই চিনতে পারছিল না। একদম অন্যরকম লাগছে, মনে হচ্ছিল আয়নায় দাঁড়ানো ছেলেটা অন্য কেউ। শাহবাগে নিজের ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় আরো দুজনকে সাথে নিয়ে থাকে শাহরিয়ার, ওরা দুজনই চাকরিজীবি, বেসরকারি কোম্পানীতে কাজ করে, এতোদিন ধরে একমাত্র বেকার সদস্য ছিল সে।

অফিসে ঢুকেই কী করতে হবে বুঝতে পারছিল না, চুপচাপ অফিস, লোকজন আছে, তবে তারা সম্ভবত নিজেদের মধ্যে খুব একটা কথা বলে না। অ্যাডমিনের একজন এসে তাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে এক কোনার একটা টেবিলে। রুমটা বেশ বড়, একসাথে বেশ কয়েকজন বসতে পারে, মাথার উপর পুরানো আমলের সিলিং ফ্যান ঘুরছে। রুমের বাকি সদস্যদের একনজর দেখে নিলো, ডানদিকের টেবিল বসে আছে মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক, খুব মনোযোগ দিয়ে কম্পিউটারে কিছু একটা করছে, তার পাশের টেবিলের লোকটার বয়স চল্লিশের নীচেই হবে, পত্রিকা পড়ছে, মাঝে মাঝে হাসছে, মাঝে মাঝে উত্তেজিত হওয়ার মতো শব্দ করছে, আর বাম দিকের টেবিলে যে ছেলেটা বসেছে,ওকে দেখে একটু অবাক হলো শাহরিয়ার, বয়স ত্রিশের আশপাশে, তবে এই বয়সেই টাক পড়ে গেছে মাথায়, খাড়া নাক, একদম শকুনের মতো চেহারা, মাঝে মাঝে শাহরিয়ারকে দেখছে আড়চোখে। দশটা নাগাদ নিজের কম্পিউটার, মোবাইল নাম্বার, আইডি কার্ড সব বুঝে পেল। কম্পিউটারটা অন করে চুপচাপ বসে থাকল। অফিসের কয়েকজন তার দিকে তাকিয়েছে কয়েকবার, তবে কেউ এগিয়ে এসে কথা বলেনি। হয়তো এই অফিসের রেওয়াজও এমন। নিজে গিয়েই ওদের সাথে পরিচিত হতে হবে। এগারোটার একটু পর আবু জামশেদের রুমে ডাক পড়ল। ভদ্রলোক কোন না কোন কাজ দেবেন, বসিয়ে রাখার জন্য নিশ্চয়ই তাকে আনা হয়নি।

পনেরো মিনিট পর নিজের চেয়ারে এসে বসল শাহরিয়ার, এক কেস ডিভিডি ডিস্ক ধরিয়ে দিয়েছেন আবু জামশেদ। পুরানো সব কেস ফাইল, কাজে ঢোকার আগে এই ফাইলগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলেছেন। আপাতত এটুকুই কাজ। এই কাজে খুব বেশি সময় লাগার কথা না। বারোটা ডিস্ক আছে। আজকের দিনের মধ্যেই দেখা হয়ে যাবে, ভাবল শাহরিয়ার। টেবিলে এক কাপ চা রেখে গিয়েছে পিয়ন। চায়ে চুমুক দিয়ে এক নাম্বার ডিস্ক প্লেয়ারে ঢুকাল।

অনেক পুরানো সব কেস, চল্লিশ বছর আগের কিছু কেসও যেমন আছে তেমনি আছে গত দু'একবছর আগের ঘটনাও, সেইসব কেস সংক্রান্ত যাবতীয় পেপার কাটিং,

চার্জশীট, মামলা'র বর্তমান অবস্থা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত একটার পর একটা ফাইল। এই ফাইলগুলো সব আন সলভড কেস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধিকে সনাক্ত করা যায়নি, কিংবা মাঝে মাঝে অপরাধি ধরা পড়লেও উপযুক্ত স্বাক্ষ্য-প্রমানের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেছে। খুব বিরক্তিকর একটা কাজ হবে বলে ভাবলেও আধঘন্টার মধ্যে ফাইলগুলোর মধ্যে প্রায় ডুবে গেল শাহরিয়ার।

নিজের সিদ্ধান্তের উপর খুব একটা ভরসা না থাকলেও এই প্রথমবারের মতো মনে হলো সিদ্ধান্তটা সে খারাপ নেয়নি। নিজের পেশাগত জীবনের প্রথম দিনেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল শাহরিয়ার, তার ক্যারিয়ারে কোন আন-সলভড কেস থাকবে না।

অধ্যায় ৭

রুবেলকে দেখে একরকম চমকেই গেল তুষার। একটা মানুষের এতো পরিবর্তন আশা করে নি, সুটেড বুটেড হয়ে অফিস করছে, সামনে একগাদা ফাইল, কম্পিউটার, একটু পরপর এসিস্ট্যান্ট এসে কে কে দেখা করতে এসেছে বলে যাচ্ছে। আপাতত সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে তুষারের সাথে কথা বলছে রুবেল। এই ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট সে, অনেক কিছুই তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

শেষবার যখন রুবেলের সাথে দেখা হয়েছিল তখনও গান-বাজনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, মাথাভর্তি চুল, চলাফেরার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না, এটা ঠিক যে একই সাথে পড়াশোনায় খুব একটা খারাপ ছিল না, তাই বলে ঠিক এতো উন্নতি করে ফেলবে বুঝতে পারেনি। তবে এতে ভালো লাগছিল, বহুদিন পর বন্ধুর সাথে দেখা। সে বন্ধু যদি উন্নতি করে ভালো লাগাই স্বাভাবিক।

"তুই এতোদিন পর এলি?" রুবেল বলল, "আমরা তো তোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।"

"আসতে হলো," তুষার বলল, "তা, তুই বেশ ভালোই আছিস বোঝা যাচ্ছে।"

"ভালো আছি, কিন্তু তারপরও ভালো নেই, কোন স্বাধীনতা নেই।"

"টাকা-পয়সা কামাচ্ছিস, ঘরে বৌ-বাচ্চা, গাড়ি, স্বাধীনতা নেই কেন?"

"দোস্ত, টাকা থাকলেই স্বাধীনতা মেলে না, আগে যেমন ছিলাম, যখন যা খুশি করতে পারতাম, এখন তা পারি কই," রুবেল বলল, "এখনো একগাদা লোক বাইরে বসে আছে।"

"আমি এসে তোকে বিরক্ত করলাম।"

"আরে নাহ, কি যে বলিস!" রুবেল বলল, "ওরা আজকে কাজ না হলে কাল আসবে। তুই তো আর প্রতিদিন আসিস না।"

"বাকিদের খবর কী?"

"তুই কার খবর চাচ্ছিস?" হেসে বলল রুবেল, "আজমল এখন ব্যস্ত ব্যবসায়ী, কালে ভদ্রে দেখা হয়। আর আরিফের খবর তো জানিসই।"

"হু," একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তুষার, "ওর জন্য খারাপই লাগে।"

"খারাপ লাগে কেন? ও তো এখন বিখ্যাত লেখক, ওর বই লোকে লাইন দিয়ে কেনে?"

"কী বলছিস?" অবাক হলো তুষার।

"আরে তুই কোন দুনিয়ায় বাস করিস! অদ্ভুত। সারা দেশের লোক ওকে চেনে।"

"আমি আসলে দেশের কোন খবরই রাখি নি," তুষার বলল, "তা থাকে

কোথায়?"

"ঠিকানা জানি না, চাইলে জোগাড় করা যাবে।"

"জোগাড় কর, আমি ওর সাথে দেখা করবো।"

"সত্যি?"

"হু, দেখা করা দরকার।"

"দেখা করা দরকার, বুঝলাম। কিন্তু ঐ ঘটনার পর আমরা কেউ আর ওর সামনে দাড়াইনি।"

"ভুল আমাদেরই ছিল। নিজের কাছে এখনো নিজেকে খুব ছোট লাগে। অপরাধবোধটা আজীবন আমাকে তাড়াবে।"

"তুই দেখা করতে চাইলে করতে পারিস। আমি পুরানো সব কথা ভুলে গেছি, নতুন করে মনে করতে চাই না।"

"সেটা তোর ব্যাপার। এতোদিন পর দেশে এলাম, আবার ক'বে আসবে জানি না। এবার দেখা না হলে আর কোনদিন দেখা হবে না।"

"আচ্ছা, আমি ঠিকানা জোগাড় করছি। এখন বল, সন্ধ্যায় কোথায় আছিস?"

"বাসায় থাকবো।"

"ঠিক আছে, আমি আসছি, সাথে পারলে আজমলকেও নিয়ে আসবো।"

"তাহলেতো খুবই ভালো হয়।"

"দোস্ত, তোকে একটা কথা বলি। আমাদের সিক্রেটটা কী আর কেউ জানে?" গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রুবেল।

"জানার সম্ভাবনা নেই। তবে আমি গত কিছুদিন আগে একটা ফোন কল পেয়েছি," তুষার বলল।

এই সময় রুমে কফি নিয়ে ঢুকল পিয়ন, ওকে দেখে থেমে গেল তুষার। হাত ইশারায় পিয়নকে বেরিয়ে যেতে বলল রুবেল।

"কি রকম? খুলে বলতো?"

"একধরনের হুমকি দিয়েছে বলা যায়। আমি ঢাকায় না ফিরলে নাকি সমস্যা হবে, বাবা-মা'র দিকে ইঙ্গিত করে।"

"তাই নাকি? তা কয়দিন আগের কথা?" মগে কফি ঢালতে ঢালতে বলল রুবেল। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

"তিন-চারদিন হবে," তুষার বলল, কফিটা খুব কড়া হয়েছে।

"আচ্ছা।"

"তোকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?"

"চিন্তারই কথা। কারন এরকম একটা কল আমিও পেয়েছি। হুমকি দিয়েছে আমাকে।"

"কী হুমকি?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রুবেল। টাকা-পয়সা নিয়ে হুমকি দিয়েছে ব্যাপারটা তুষারকে বলতে ইচ্ছে করছে না।

"ঘটনা হচ্ছে, ঠিক চারদিন আগে হুমকি দিয়েছে। সময় দিয়েছে সাতদিন।"

"তোকেও?"

"কেন? তোকেও কী সাতদিনের সময় দিয়েছে নাকি?"

"হু।"

চুপচাপ কিছুক্ষন সময় চলে গেল।

"ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেই নি," রুবেল বলল, "দেশে চাঁদাবাজ ভরে গেছে, হুমকি দেয়ার মতো লোকের অভাব নেই। কিন্তু একই সময়ে আমাদের দুজনকে হুমকি দিয়ে সময় বেঁধে দেয়াটা অন্যরকম।"

"তোর কী ধারনা?"

"কোন ধারনা নেই, দোস্ত," রুবেল বলল, "জীবনে অনেকের সাথেই মতের মিল হয়নি, স্বার্থের মিল হয়নি, শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু তোকেও হুমকি দিয়েছে, তার মানে আমাদের দুজনের কমন শত্রু, তাই দাঁড়ায় না?"

"হু, তাই দাঁড়ায়।"

"দাঁড়া, আজমলকে একটা কল দিয়ে দেখি, ওর কাছে এরকম কোন ফোন কল এসেছিল কি না," রুবেল বলল।

মোবাইল ফোনটা লাউড স্পীকারে দিয়ে আজমলের নাম্বারে ডায়াল করল রুবেল। রিং বেজে বেজে কেটে গেল।

"আচ্ছা, বাদ দে, ও পরে কল ব্যাক করবে," রুবেল বলল।

"হু, দোস্ত আমি উঠি তাহলে," তুষার বলল, "সন্ধ্যায় চলে আসিস।"

"আচ্ছা," বলে তুষারকে এগিয়ে দিতে রুমের বাইরে এলো রুবেল।

হুমকির বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিলেও এখন মনে হচ্ছে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। নাম্বারটা সেভ করে রাখা দরকার ছিল। তবে ঐ ফোন কলের পর এমন কিছু ঘটেনি যে চিন্তিত হতে হবে। তুষারকে বিদায় দিয়ে রুমে এসে বসল রুবেল।

ইচ্ছে হচ্ছিল সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিয়ে বাসায় গিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে থাকতে। তবে সেটা সম্ভব না। হুমকির ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলে সমস্যা, লোকটা হয়তো আশপাশেই আছে, তার চালচলন অনুসরন করছে।

পিয়নকে ডাকল রুবেল। সন্ধ্যার আগে আগে সব কাজ শেষ করতে হবে। আজমলের সাথে দেখা হওয়াও জরুরি। ওর ফোনের অপেক্ষায় না থেকে আরো দু'বার কল দিল, তাতেও কাজ না হওয়াতে এসএমএস করে রাখল।

হাতে মাত্র তিনদিন সময় আছে, এরমধ্যে কালপ্রিটকে খুঁজে বের করতে হবে।

* * *

সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে আরিফ, ন'টা পাঁচটা অফিস করতে হয় না এটা একটা বড় সুবিধা। গত রাতে লেখালিখি করে নি, ডিভিডিতে একটা হলিউডি সিনেমা দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ঘুমিয়েছে রাত তিনটার দিকে। অন্য সবার মতো সকালে নাস্তা করে অফিসে যাওয়ার তাড়া যেহেতু নেই, দুপুরে খাবারের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ঘুম থেকে উঠলো সে।

দিনের বেলায় মোবাইল ফোনটা বেশিরভাগ সময় নিজের কাছে রাখে না আরিফ, জিনিসটা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। তাহেরের কাছে থাকে, জরুরি কোন দরকার হলে ফোনটা দেয়, সে রকম প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। এই ফ্ল্যাটটা চমৎকার, দক্ষিন দিকটা একদম খোলা, বারান্দায় হুইল চেয়ার নিয়ে দুপুরের পর পর বারান্দায় বসে থাকে, ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরের খোলা পৃথিবীর দিকে। চলাচল করার শক্তি হারিয়ে ফেলার পর থেকে ঘরের বাইরেটা এখন আরো বেশি টানে। অথচ কোনদিনই ঘরের ছেলে ছিল না সে, সারাদিন হৈ-চৈ, আড্ডা, ঘোরাঘুরিতেই সময় চলে যেত।

এরমধ্যেও পড়াশোনাটা ধরে রেখেছিল। ক্লাসে ভালো রেজাল্ট হতো, দেখতে দেখতে এক সময় ইউনিভার্সিটির খুব ভালো একটা সাবজেক্টও পেয়ে গেল। মনে হয় অনেক অনেক দিন আগের কথা। গ্রামের ছেলে হলেও উচ্ছল আরিফের বন্ধু-বান্ধবের অভাব হলো না। ক্লাস-আড্ডা, পড়াশোনা সব একসাথে চলল।

তারপর এক রাতে বদলে গেল সবকিছু।

আজকেও যথারীতি বারান্দায় বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আরিফ। এখনকার জীবন নিয়ে কোন আফসোস নেই, হয়তো এরকমটাই হওয়ার কথা ছিল। অদৃষ্টবাদী ছিল না সে কোনদিন, ভাবতো নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে মানুষ, এরকম একটা জীবন সে চায় নি, জীবনটাকে গড়ে তোলার জন্য ঠিক পথেই ছিল, কিন্তু তাতে লাভ হলো কী! অদৃষ্টই তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসেছে।

নিজের লেখালিখির উপর খুব বিশ্বাস আস্থা ছিল না, এখন সেই লেখালিখি করেই জীবন চালাতে হচ্ছে, কী অদ্ভুত!

একটা ঘটনা তার জীবনটা পাল্টে দিল, সেই রাত আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না, পাওয়া গেলে হয়তো ভুলটা শুধরে নেয়া যেত। বুকের মধ্যে অক্ষম রাগটা ফুঁসে উঠল আবার। হাত মুঠো হয়ে গেল নিজের অজান্তেই। ভুল শুধরে নেয়ার উপায় নেই, তবে যারা এই জীবনের জন্য দায়ি তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না আরিফ। সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যারা এখন ভালো আছে, সুখে আছে, তাদের সুখ-শান্তি, আনন্দ, হেঁটে চলা কোন কিছুই ইদানিং সহ্য হয় না তার। হাতের কাছে একটা

খাতা ছিল, রাফ খাতা, খাতাটা টুকরো টুকরো করল, কাগজের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিল পুরো রুম জুড়ে। তার জীবনটাও এরকম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দায়ি যারা তাদের ক্ষমা নেই।

দুপুরের পরপর তাহেরের কাজ কমে যায়, সকালে বাজার করার পর এক বুয়া এসে দুপুর আর রাতের রান্না করে দিয়ে যায়, দুজনের জন্য। এই তদারকিটা ঠিকঠাক করার পর দুপুরে বেশিরভাগ সময় ড্রইং রুমে বসে টিভি দেখে তাহের। বারান্দা থেকে তাহেরকে দেখতে পাচ্ছিল আরিফ, অস্থির একটা মানুষ, রিমোট হাতে নিয়ে একটার পর একটা চ্যানেল ঘোরাচ্ছে, কোথাও স্থির হতে পারছে না।

ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে গেল আরিফ, চুল-দাঁড়ি সব বড় হয়ে গেছে, তাহেরকে বললে বাসায় লোক নিয়ে আসবে, তবে বলতে ইচ্ছে করছে না। কাঁচাপাকা চুলদাঁড়িতে দেখতে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না অবশ্য। কম্পিউটার অন করল। মন খারাপ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় লেখালিখি শুরু করা। নতুন একটা গল্পের প্লট অনেক দিন ধরে মাথার ভেতর ঘুরছিল।

প্রথম লাইনটা ঠিকমতো লিখতে পারলেই বাকিটা হয়ে যাবে। কিন্তু কিবোর্ডে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল আরিফ, মাথা একদম ফাঁকা হয়ে আছে, খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, বুকের ভেতর বারবার কামড় বসাচ্ছে এক অদ্ভুত জন্তু। চিৎকার করে উঠল সে।

তার এই চিৎকারে অভ্যস্ত তাহের, একপলক তাকিয়ে আবার রিমোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অধ্যায় ৮

ড্রইং রুমে বসে টিভি দেখছে তুষার, বাবা আর মা একটু আগে হাঁটতে বের হয়েছেন, ধানমন্ডি লেক এলাকায়, ফিরবেন আটটার দিকে, সন্ধ্যায় ক্রিস্টিনাকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, দায়িত্বটা সুমনার উপর দিয়েছে। ঢাকায় নামতে না নামতেই এখানকার শপিং সেন্টারগুলো ঘুরে দেখার শখ হয়েছে ক্রিস্টিনার, শাড়ি পরছে নিয়মিত, বাংলায় কথা বলছে যথাসম্ভব। সুমনাও খুব ফূর্তিতে আছে বোঝা যাচ্ছে, বিদেশি ভাবি কেমন না কেমন হয় এ নিয়ে খুব চিন্তা ছিল। সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে যখন দেখল ক্রিস্টিনার ব্যবহার খুব আন্তরিক, যেন অনেক দিন পর হারিয়ে যাওয়া ছোটবোনের দেখা পেয়েছে।

ঠিক সাতটার দিকে বাইরের গেটে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ড্রইং রুমের জানালা দিয়ে তাকাল তুষার। আব্বাস মিয়া গেট খুলে দিতে খুব দামি একটা গাড়ি ঢুকল ভেতরে। আজমল আর রুবেলের জন্য অপেক্ষা করছিল এতোক্ষন। ওরা এসে পড়াতে ভালো লাগছে খুব।

ড্রইং রুমে ঢুকে তুষারকে জড়িয়ে ধরল আজমল। রুবেল আর আজমলকে বসাল সোফায়।

"আমি তো ভাবছিলাম তুই শ্যাষ," আজমল বলল, "বিদেশি মেয়ে পাইয়া সব ভুইলা গেলি।"

"ভুলতে আর পারলাম কই!" তুষার বলল, "বাপ-মা আছে না?"

"যাক, কয়দিন আছিস? কী কী করবি?"

"মাসখানেকের মতো ছুটি আছে, তারপর দেখি।"

আব্বাস মিয়া একবোতল ঠান্ডা পানি রেখে গেল। কফির ব্যবস্থা করতে বলল তুষার।

"চল, এরমধ্যে একদিন আমরা ঘুরতে যাই," আজমল বলল, অনেকদিন পর তুষারকে পেয়ে ছেলেমানুষের মতো আনন্দ হচ্ছে তার।

রুবেল, তুষার, আজমল, একই স্কুলের ছাত্র। সেই ছোটবেলা থেকেই একসাথে বড় হয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, ঘুরে বেড়িয়েছে, একজন আরেকজনের পিছু লেগেছে। রুবেল আর আজমলকে পরিবারের সদস্যের মতোই মনে করে তুষার, যদিও জানে দীর্ঘদিনের অদেখায় আগের সেই সুরটা এখন আর নেই। চৌদ্দ বছর অনেক দীর্ঘ সময়।

আজমলের ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব নতুন নয়, এ ধরনের প্রস্তাব সব সময় আজমলই দেয় এবং প্রতিবারই কোন না কোন ঝামেলা হয়। শেষ যে ঝামেলাটা হয়েছিল, সেটার রেশ এখনো কাটেনি, কোনদিন কাটবে বলে মনেও হয় না।

তাই নতুন এই প্রস্তাবে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এলো ড্রইং রুমে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য হো হো করে হেসে উঠল রুবেল।

"দোস্ত, এখন আর বৌ-পোলাপান ছাড়া ঘুরতে যাওয়া যাবে না, তোর ভাবীকে তো চিনিস?" আজমলকে উদ্দেশ্যে করে বলে রুবেল।

"হু, তুই বৌয়ের আঁচল ধরেই পড়ে থাক," আজমল বলে, "আমার কাছে ঐসবের টাইম নাই।"

"তাহলে কিসের টাইম আছে?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল তুষার।

কিসের জন্য আজমলের সময় আছে তা সবারই জানা, সেই তরুন বয়স থেকেই মেয়েমানুষের প্রতি আলাদা একটা টান, এসবের পেছনে কতো টাকা খরচ করেছে তার হিসেব নেই।

আজমল হাসল, "দোস্ত, এতো হিসাব কইরা চলতে পারি না, তুই তো জানিস, আমি কেমন।"

কফি চলে এলো। সিগারেট ধরাল তুষার। বাকি দুজনের দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেট।

"আজমল, তোর ফোন কলের ঘটনাটা বল তুষারকে," রুবেল বলল।

"ঐটা তেমন কিছু না," কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল আজমল, "ব্যবসা করি, হুমকি-ধামকি তো থাকবই।"

"কিন্তু সাতদিন সময় দিলো, সেটা?"

"ঐখানেই খটকা," আজমল বলল, "আমি ওর খবর লাগাইছি, ঐ নাম্বারের। পাইলে ওরে মাটিতে পুইত্যা ফালামু। আমারে হুমকি দেয়ার স্বাদ মিটামু হাড়ে হাড়ে।"

"ঐ নাম্বারটা কি আছে তোর কাছে?" তুষার বলল।

মোবাইল ফোন বের করে বেশ কিছুক্ষন পর একটা নাম্বার দেখাল আজমল, ডিসপ্লেতে। তুষার মনে করতে পারল না এই নাম্বার থেকেই ফোন এসেছিল কি না, তবে রুবেলের চিনতে ভুল হলো না, অন্তত শেষ দুটো সংখ্যা সে মনে রেখেছিল।

"একই নাম্বার," রুবেল বলল।

"এর পেছনে কে থাকতে পারে বলে তোর ধারনা," তুষার বলল।

"আরিফ ছাড়া আর কে?" রুবেল বলল।

"আরিফ! কিভাবে? ও তো হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে আর ওর পক্ষে এতোদিন পর এসব করা সম্ভব?" তুষার বলল।

"ও ছাড়া আমাদের তিনজনের একই শত্রু আর কারো হবার কথা না," আজমল বলল, "আমি ওরে একদম মাটির সাথে মিশাই দেব, হারামজাদা আবার লেখক হইছে।"

"মাথা ঠান্ডা কর," রুবেল বলল, "আরিফ নাও হতে পারে। মশিউরও হতে

পারে। ও আমাদের সাথে ছিল। এখন সুযোগ নিতে চাইছে। টাকা-পয়সা দিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে দেয়া দরকার।"

"আরে, মশিউর না," আজমল বলল, "আমার সাথে লাগতে আসার সাহস ওর নাই।"

"হতেও তো পারে?" তুষার বলল।

"বাজি ধর," আজমল বলল, "মশিউর হইলে আমি কান কাইট্টা কুত্তারে দিয়া খাওয়ামু।"

হাসল তুষার, "তুই দেখি এখনো ছেলেমানুষি আছিস? এখানে বাজির কথা আসছে কেন?"

"তুই কি সব ভুলে গেছিস, আজমল?" এবার আজমলকে বলল রুবেল।

প্রশ্নটায় এমন কিছু ছিল নীরবতা নেমে এলো রুমে। তুষার তাকিয়ে আছে রুবেল আর আজমলের দিকে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

"ঘটনা কি?" জিজ্ঞেস করল তুষার।

"আচ্ছা, বাদ দে," আজমল বলল, "মশিউররে ফ্রেন্ড সার্কেল থ্যাইকা বের কইরা দিছি বহুত আগে। ওর এতো সাহস নাই।"

"শুধু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে বের করে দেয়াতেই তো ঘটনা শেষ না," রুবেল বলল, "এরপরেও তো ঘটনা আছে।"

"সেটাই তো জানতে চাইছি," তুষার বলল।

"ঐ বাইঞ্চোদ, আমার পিছে লাগছিল," আজমল বলল, "আমি ওরে চৌদ্দ শিকের ভাত খাওয়াইছি।"

"তাই?"

"ফেন্সিডিলসহ ধরা পড়েছে পুলিশের কাছে, ওর বাসায় পুলিশ রেইড দিয়েছিল, এটা আজমলের কাজ," রুবেল বলল।

"আর ঐ যে আমার গাড়ি ভাঙল একবার, এরপর আমারে হুমকি দিল আমারে নাকি উঠাইয়া নিয়া যাইবো," রেগে বলল আজমল, "তাই ওরে একটা শিক্ষা দিছি।"

"বেচারা তিনবছর জেল খাটল, বের হয়েছে বছর দেড়েক হলো," রুবেল বলল।

"তোর দেখি ওর উপর খুব মায়া!" টিপ্পনি কাটল আজমল।

"একসময় খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল আমাদের, ভুলে যাচ্ছিস কেন?"

"ভুলে যাই নাই, তাই শুধু জেলের ভাই খাওয়াইছি, নাইলে কী হইতো কে জানে।"

"তাহলে তো মনে হচ্ছে মশিউরও জড়িত থাকতে পারে," তুষার বলল, "ওর লাইফটা তো তুই ছাড়ানাড়া করে দিয়েছিলি।"

"ওর সাহস হইবো না," আজমল বলল আবার, "আমি ওরে চিনি, ও যে আবার দাঁড়াইতে পারছে এটাই বেশি।"

"ওর সাথে একটু যোগাযোগ করে দেখা দরকার," তুষার বলল, "তুই-ই যোগাযোগ কর।"

"আমার পক্ষে সম্ভব না, রুবেলকে বল," আজমল বলল।

"ঠিক আছে, আমি দেখি ওর সাথে যোগাযোগ করা যায় কি না, কিন্তু এরপরে তো আর কোন কল আসে নাই," রুবেল বলল। "টাকা-পয়সা দিয়ে এই সমস্যা মিটানো যাবে না। একবার টাকা পেলে বারবার আসবে টাকার খোঁজে।"

"দোস্ত, এতো প্যাচাইস না," আজমল বলল, সে এবার উঠে দাঁড়িয়েছে, "এইটা অন্য কারো কাম না, আরিফের কাম।"

"মাথা ঠান্ডা কর, আজমল," তুষার বলল, হাত দিয়ে টেনে বসাল আজমলকে, "তুই মাথা গরম করলেই অঘটন ঘটে।"

"হ, সব দোষ তো আমারই!"

রুবেল একটু থতমত খেয়ে যায়, জানে কথাটা কার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে।

"এই ব্যাপারটা কী পুলিশে জানানো দরকার না?" তুষার বলল।

"তোর কী মাথা খারাপ হইছে নাকি?" রুবেল বলল, "খাল কাইটা কুমির আনতে চাস কোন দুঃখে।"

"তাহলে কী করবো?"

"অপেক্ষা," রুবেল বলল, "আগামি কয়েকদিন খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের। এ ছাড়া তেমন কিছু করার নেই।"

"তোরা সাবধানে থাকিস," আজমল বলল, "আমার সাথে লাইসেন্স করা জিনিস আছে। কোন শালার সাধ্য নাই আমার বালটা করে।"

"বাদ দে, তুই কী ঠিকানা পেলি?" রুবেলকে জিজ্ঞেস করল তুষার।

"হু," বলে শার্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট বাড়িয়ে দেয় রুবেল।

হাতে নিয়ে ঠিকানাটা দেখে নেয় তুষার। জায়গাটা চেনে, একসময় লোকবসতি খুব কম ছিল। এখন নিশ্চয়ই অনেক বাড়িঘর হয়ে গেছে।

"তুই সত্যি যাবি?" জিজ্ঞেস করল রুবেল।

"হু, যাওয়া দরকার!"

"সাবধানে যাস। বলা যায় না কি না কী করে ফেলে," রুবেল বলল।

বন্ধুদের রাতের খাবারের আমন্ত্রন জানাল তুষার, আটটার কাছাকাছি বেজে গেছে, বাবা-মা যেকোন সময় চলে আসবেন, ওদের না খাইয়ে ছাড়বেন না নিশ্চয়ই। এছাড়া শপিং সেন্টারগুলো বন্ধ হয়ে যায় রাত আটটায়, কাজেই ক্রিস্টিনাও চলে আসবে যেকোন সময়।

আরেকদিন রাতে একসাথে ডিনার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো দুজন, তারপর বেরিয়ে গেল।

* * *

কোনমতে নাস্তাটা সেরে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল তুষার, ক্রিস্টিনা আসতে চাইছিল সাথে, কোনমতে ঠেকিয়েছে, পুরানো গাড়িটা নিয়ে একাই বের হয়েছে, গন্তব্য গাজীপুর, অনেক দূর, গতরাতে মেসেজে ঠিকানাটা দিয়েছিল রুবেল, সেখানেই যাচ্ছে। গাজীপুরের ঐ এলাকায় আগেও গিয়েছে তুষার, পিকনিক করার জন্য, মোটামুটি জঙ্গল ছিল তখন, এখনও চারপাশে অনেক গাছপালা, এর মধ্যে চমৎকার সব রিসোর্ট গড়ে উঠেছে, স্থানীয় কিছু লোক আগে থেকেই ছিল, নতুন যোগ হয়েছে আরিফ। ঢাকার ট্রাফিকের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ, এছাড়া আমেরিকায় বাম দিকে বসে গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত বলে কিছুটা সমস্যাও হচ্ছে। তবে ভাগ্য ভালো, এখনো কোন গাড়িকে ঠুকে দেয় নি, খুব সাবধানে চালাচ্ছে।

দীর্ঘদিন দেখা নেই, আরিফের সামনে কিভাবে দাঁড়াবে সেটা ভাবতেই অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা অপরাধবোধ, মানসিক দূর্বলতা গত চৌদ্দ বছর ধরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে মনের ভেতরটা, বুকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে যেন। আরিফের জন্য না হলেও অন্তত নিজের জন্য হলেও একবার ওর সামনাসামনি হতে চায় তুষার। আরিফের প্রতিক্রিয়া কী হবে জানা নেই, শুধু এটুকু জানে অন্তত একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। তাহলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া যাবে।

ঠিকানা খুঁজে বাসাটা বের করা খুব কঠিন কাজ এখানে, বিশেষ করে যে মানুষ কাউকে নিজের ঠিকানা জানাতে চায় না তার বাসা হলে। তবু তুষার খুঁজে পেল। মেইন রোড থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা চলে গেছে ভেতরের দিকে, এর একটায় ঢুকে পড়ল, তারপর গাড়িটা রাস্তার একপাশে পার্ক করে চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা টিনের ছাদওয়ালা একতলা কাঠের বাসাটার দিকে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো তুষার।

দুপুরের এই সময়টা খুব একা লাগে, চারদেয়ালের মাঝখানে বন্দি থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে বাইরে যেতেও ইচ্ছে করে না, বারান্দার এক কোনায় বসে গাছপালা আর প্রকৃতি দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা নেমে আসে মাঝে মাঝে টেরই পায় না আরিফ।

আজকেও বারান্দায় বসেছিল, চুপচাপ, হাতে রাইটিং প্যাড, মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু আইডিয়া চলে আসে, সেই আইডিয়াগুলো লিখে রাখার জন্য গত কয়েকদিন হলো এই প্যাডটা ব্যবহার করছে।

শার্টের পকেটে টুবি পেন্সিলটাও তৈরি। তবে এখন পর্যন্ত এই প্যাড কিংবা পেন্সিলের কোন সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।

আগে খুব বেশি লোকজনের চলাচল ছিল না এই এলাকায়, গাছপালা ছিল অনেক বেশি, এখন লোকজন কিছুটা বেড়েছে, চারপাশে ধানক্ষেত, একটু পরপর ঘন হয়ে

গজারি গাছের সারি। বেশ গরম পড়েছে, ঘামছিল আরিফ, তাই বারান্দা থেকে ঘরে চলে এলো, রিমোট চেপে মনিটরটা অন করল, পুরো বাড়িটা সিসিক্যামেরা দিয়ে ঘেরা, ক্যামেরাগুলোর কাভারেজও চমৎকার, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তেমন লোকজন নেই, দুপুরের এই সময়টায় বেশিরভাগ মানুষই ঘরে ফিরে একটু ঘুমায়।

মনিটরটা বন্ধ করতে গিয়ে পুরানো চেহারার গাড়িটা দেখে বেশ চমকে গেল। অনেক দূরে রাস্তার একপাশে পার্ক করা হয়েছে, মনে হচ্ছিল স্মৃতির কোন অতল দেশ থেকে উঠে এসেছে জিনিসটা।

এই গাড়িটা শেষবার যখন দেখেছিল জীবন তখন এইরকম ছিল না, ছিল প্রানচাঞ্চল্যে ভরপুর আর ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল এক তরুনের জীবন, কিছু শংকাও ছিল, কিন্তু সেই শংকা তো সবার জীবনেই কমবেশি থাকে, সেই সব শংকা সত্যি হয়নি, তবে যা হয়েছে তা সব শংকাকে ছাড়িয়ে গেছে। পড়াশোনা শেষ হয়নি, ভালোবাসা হারিয়ে গেছে চিরতরে, এমনকি স্বাধীনভাবে চলাফেরার শক্তিও হারিয়েছে, এতো কিছু হারানোর শংকা সেই তরুন বয়সে ছিল না নিশ্চয়ই।

গাড়িটাকে পার্ক করে এগিয়ে আসছে চালক, দেহের কাঠামো, তাকানোর ভঙ্গি, সবই খুব পরিচিত। এতোকাল পড়ে খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে, নতুন করে পুরানো ক্ষতে জ্বালা ধরাবার জন্য।

তাহের বাসায় নেই, বাইরের গেটে কলিং বেলের শব্দের অপেক্ষায় রইল। বহুদিন পর হয়তো এই অতিথি তার মুখোমুখি হতে আসছে, হয়তো ভেবেছে সময় সব ক্ষতের উপর প্রলেপ ফেলে, তবে জানে না, কিছু কিছু ক্ষত আছে তা এতো গভীর, মহাকালও সেই ক্ষত সারাতে পারবে না।

কলিং বেল বাজছে, মনিটরটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরিফ, অতিথিকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, সেই একই চেহারা, একটু ভার জমেছে কাঁধে, অধৈর্য্যের মতো বারবার তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। বাইরে যাওয়ার সময় গেটে তালা মেরে যায় তাহের, বাইরে থেকে তালাবদ্ধ যে গেট, তার কলিং বেল চাপা যে অর্থহীন এই সাধারন বোধটাও হারিয়ে ফেলেছে সম্ভবত। তাহের না আসা পর্যন্ত দরজা খোলার উপায় নেই, ততোক্ষন অতিথি অপেক্ষা করবে না নিশ্চয়ই। খুব দরকার হলে আবার আসবে।

অতিথির ধৈর্য্য কম, কিছুক্ষন পরই দূরে দাঁড় করানো গাড়িটা স্টার্ট নিল। দীর্ঘদিন পর খুব কাছের একটা মানুষকে দেখে চাপা আবেগ অনুভব করছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। হুইল চেয়ারটা নিয়ে একটু ভেতরের দিকে চলে গেল, যাওয়ার সময় মনিটরটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

অধ্যায় ৯

খবর ঠিকই চলে এসেছে, দুপুরে মতিঝিলে এক বন্ধুর অফিসে বসে খবরটা পেয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে রইল মশিউর। এটা ঠিক যে, বন্ধুদের চারজনের মধ্যে তুষারের সাথেই তার হৃদ্যতা ছিল একটু কম, কিন্তু তাই বলে খবরটা সরাসরি পাবে না! তুষার কী একদমই ভুলে গেছে যে মশিউর বলে তার একটা বন্ধু ছিল ? এটা ঠিক স্কুল আর কলেজ জীবনের পর বাকিদের চাইতে তার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল, কিন্তু ঐ তিনজনের প্রতি অস্বাভাবিক একটা টান তো সবসময়েই ছিল। আজমল আর রুবেলের সাথে এখন যোগাযোগ নেই, এক শহরে থেকেও, এরজন্য ওরাই দায়ি। এক গাদা বন্ধুদের আড্ডায় তাকে যেভাবে অপমান করেছিল আজমল, তা মনে পড়লে এখনো গা রি রি করে উঠে, রুবেল সেই আড্ডায় ছিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নি, বরং মৃদু হেসেছে। এরপর তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল তিন-তিনটা বছর, কেউ না বললেও মশিউর জানে এই ঘটনার পেছনে হাত ছিল আজমল চৌধুরির, সামান্য হুমকিতে তাকে জেলে পাঠাতে দ্বিধা করে নি তার বাল্যকালের বন্ধু! এই ঘটনাগুলোর পর থেকে ওরা দুজন তার জীবন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু তুষারের সাথে তো কিছু হয়নি, না কোন কথাকাটি কিংবা মনোমালিন্য। একসময় তুষারের ছোট বোনের উপর কিছুটা দূর্বলতা এসেছিল, সেটাও কোনদিন প্রকাশ করে নি বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে বলে। অথচ তুষার ঢাকায় এসে সবার সাথে যোগাযোগ করছে, কেবল মশিউরের কথাই ভুলে গেছে।

একটা দালালি নিয়ে মতিঝিল অফিস পাড়ায় গত কিছুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে মশিউর, সেখানেই এক বন্ধুর অফিসে খবরটা পেল। তুষার ঢাকায় এসেছে কয়েকদিন হলো, সাথে বিদেশি বৌ, মাসখানেক থাকবে। খবরটা শুনে মনটা একই সাথে ভালো হয়েছে আবার খারাপও লেগেছে। হয়তো মশিউরকে কোনদিনই ভালো বন্ধু হিসেবে নেয় নি তুষার। নেশা শুরু করার পর কোনদিন ওর কাছ থেকে টাকা ধার নেয় নি, কিংবা কোন ঝামেলাও করেনি। তাহলে?

দুপুরের খাবারটা বন্ধুর সাথেই সারল মশিউর, দালালির কাজটা হচ্ছে না, ভেবেছিল বন্ধুটার কাছ থেকে কিছু টাকা খসানো যাবে, তবে এই বন্ধুটিও বেশ চালাক, লাঞ্চ করিয়ে ছেড়ে দিল, আপাতত এটুকুই লাভ, পকেটের কিছু টাকা বাঁচল। খাওয়া শেষে আর অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে পড়ল। ধানমন্ডির ঐ বাড়িটায় অনেকদিন যাওয়া হয় না, সারপ্রাইজ দেয়ার মতো কোন মানুষ নেই তার। আজ তুষারকে সারপ্রাইজ দেয়া যায়।

তুষার সারপ্রাইজড হলো, যেভাবে এসে জড়িয়ে ধরল তাতে বুকের ভেতর জমে

থাকা অভিমানটা একনিমিষেই উড়ে গেল যেন। মানবিক দূর্বলতার কোন স্থান নেই তার জীবনে, অথচ আজ হঠাৎ করেই চোখের কোনে পানি জমে উঠাতে অবাক হলো মশিউর। একটু আগেই এসেছে ধানমন্ডির বাড়িটায়। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভেবেছিল তুষার খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে না, কিন্তু তুষারের উচ্ছ্বাসে কোন ভান নেই। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিদেশি স্ত্রির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এমনিতে কথার রাজা হলেও কেমন চুপসে গেছে মশিউর। কারন তুষারের স্ত্রি ক্রিস্টিনার সাথে সুমনাও ছিল।

তবে মশিউরের অস্বস্তি বুঝতে সমস্যা হয়নি তুষারের, ড্রইং রুমে গিয়ে বসল দুজন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

মশিউরকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে তুষার, একদম বদলায়নি, ঠিক যেরকম দেখে গিয়েছিল সেরকমই আছে। সারাদিনের ধকলে সে নিজে কিছুটা ক্লান্ত, কিন্তু অনেকদিন পর মশিউরকে কাছে পেয়ে হঠাৎ করেই চাঙ্গা অনুভব করছে।

"তুই করছিস কি?" জিজ্ঞেস করল তুষার, "তোর মোবাইল নাম্বারটা কারো কাছ থেকে পেলাম না।"

"আমি আর কি করবো? ঘুরে বেড়াই, নিজের মতো থাকি," বলে হাসল মশিউর, "চাকরি-বাকরি আমাকে দিয়ে হবে না।"

"তোর সাথে কারো যোগাযোগ নেই তেমন একটা, তাই না?"

"হু," মশিউর বলল, "একটা সময় পর দোস্ত আর দোস্ত থাকে না, স্বার্থপর হয়ে যায়। নে, আমার মোবাইল নাম্বারটা রাখ," বলে নিজের মোবাইল নাম্বারটা বলল মশিউর, নিজের সেটে সেভ করে নিল তুষার। এটা ঠিক, মোবাইল নাম্বার এতো ঘন ঘন বদলায় যে কারো পক্ষে তাকে হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া কঠিন, এই জন্যই তুষার খুঁজে পায়নি। ব্যাপারটা ভেবে অভিমান যা কিছুটা ছিল হাওয়ায় মিলিয়ে গেল একদম।

"কি ঘটেছে আমি জানি না, জানতে চাইও না," তুষার বলল, "তুই আমার স্কুল ফ্রেন্ড ছিলি, ফ্রেন্ডই থাকবি।"

হাসল মশিউর, বোঝা যাচ্ছে কিছু না কিছু শুনেছে তুষার, আজমল কিংবা রুবেল বলেছে।

"তবে রাগ পুষে রাখিস না, হাজারহোক আমরা একসাথে বড় হয়েছি," তুষার বলল।

"রাগ পুষে রাখবো কেন? এখন আমরা একজন আরেকজনকে ছাড়া চলতে পারি, কেউ কারো পথ না মাড়ালে কিছু যায় আসে না।"

"তুই তো রেগেই আছিস," তুষার বলল, "আজমল তো একটু গরম মাথার ছেলে, আগে থেকেই, তুই জানিস।"

"তা জানি," মশিউর বলল, "কিন্তু এখন আমরা আর ছোটমানুষ নেই, ওর

মাথাগরম তো আমার কী! আমার মাথাই কি ঠান্ডা নাকি!"

তুষার জানে মশিউরও কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না, মুখের উপর যা আসে বলে দিতে পারে, স্কুলে থাকতে মারামারি কম হয়নি অন্য গ্রুপের ছেলেদের সাথে, সবক্ষেত্রে মশিউর আর আজমলই দায়ি।

"তা তুই হঠাৎ দেশে এলি? ভাবলাম তোর সাথে আর জীবনে দেখাই হবে না," মশিউর বলল একটু বিরতি নিয়ে।

"দোস্ত, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেছি," তুষার বলল, "তোকে আসল কথাটা বলি," চারপাশে তাকাল, কেউ নেই আশপাশে, "ফোনে হুমকি পেয়েছি আমি। ঢাকায় না ফিরলে নাকি খুব বড় কোন ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।"

কথাগুলো বলে মশিউরের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ওর মুখের দিকে তাকাল তুষার। বোঝা যাচ্ছে বেশ ভড়কে গেছে মশিউর কথাগুলো শুনে।

"তাই নাকি! অদ্ভুত!"

"হু, অদ্ভুত," তুষার বলল, "আমার ঢাকায় ফেরার সাথে কিসের কী সম্পর্ক আমি কিছুই বুঝলাম না, তবে ঝুঁকি নিলাম না, আর অনেকদিন ফিরবো ফিরবো করেও ফেরা হচ্ছিল না।"

"ভালো হয়েছে ফিরেছিস," মশিউর বলল, "এরকম একটা ফোন কল আমিও পেয়েছি। তবে..."

"তবে কি?"

"কিছু না," মশিউর বলল, "যাক, এসব হুমকিতে কিছু যায় আসে না, বাদ দে। আমি এখন যাই, পরে একসময় আসবো," কথাগুলো খুব তাড়াহুড়া করে বলল, যেন এখনই উঠতে হবে। তা না হলে কোন ঝামেলা হয়ে যাবে কোথাও।

ভেতর থেকে সুমনা'র কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে মশিউর, বুকের মধ্যে কেমন আলোড়ন তুলছে শব্দগুলো, আজ অনেক অনেক দিন পর দেখা হলো, অথচ কোন কথা হলো না। সুমনার চোখে নিজের জন্য করুনা দেখতে পেয়েছে, ওকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আমার দিকে এভাবে তাকাবে না। চোখ গেলে দেব। আমি ভালো আছি, খুব ভালো। তবে চাইলেও সব কথা বলা যায় না।

তুষার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। বাসা থেকে বেরুতে বেরুতে তাকাবে না ভেবেও একবার পেছনে তাকাল মশিউর। মনে হয়েছিল সুমনাকে হয়তো আবার দেখতে পাবে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখছে। তবে সেরকম কিছু হলো না। কেউ নেই জানালার পাশে।

তুষারকে বিদায় জানিয়ে মেইন রোডে বাসে উঠার জন্য এসে দাঁড়াল মশিউর। সন্ধ্যা হয়েছে অনেক আগেই, এই সময় আগে খুব আড্ডা দেয়া হতো, অথচ ইদানিং তার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। বুকের মধ্যে পুরানো রাগ ফুঁসে উঠছে অনেক দিন

পর। জীবনটা এরকম না হলেও পারতো, আর দশটা বন্ধুর মতো তার জীবনটাও হতে পারতো স্ত্রি-সন্তান বেষ্টিত হাসিখুশি জীবন। সুমনার কাছ থেকে সরে গিয়েই নেশায় ভরে গেল যে জীবন সেখান থেকে আর কোনদিন ফিরতে পারে নি মশিউর, ফিরতে পারবেও না।

সব দোষ শালা ঐ তুষারের! অনেক দিন ইচ্ছেটা হয় না, আজ হলো, পুরো পৃথিবী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার।

* * *

মশিউরকে বিদায় দিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে একা একা রাতের ঢাকায় ঘুরতে বের হলো তুষার, সকালে একবার গাজীপুর থেকে ঘুরে এসেছে, কাজ হয়নি, ক্লান্ত লাগছিল খুব, তবু বাসায় মন টিকল না। বাবা যদিও একজন ড্রাইভার দিয়েছেন, তবু তাকে সাথে নেয়নি। ক্রিস্টিনাকে আনা যেত, ঢাকার কিছু এখনো দেখে নি, সন্ধ্যায় বাসায় আরো কিছু আত্মীয়স্বজন এসেছে বলে ওকে নিয়ে আসেনি। এছাড়া সুমনাও আছে, সঙ্গ পাবে। চিন্তার কিছু নেই।

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে ঢাকায় এসেছে তুষার, বেশ কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে, আড্ডা হয়েছে, শুধু আরিফের দেখা মেলেনি। বাসার ঠিকানা ঠিকই ছিল, তবে বাসায় কেউ ছিল না। নইলে আরিফের সাথেও দেখা হয়ে যেত। আরিফের মোবাইল নাম্বার নেই কারো কাছে। লেখালিখি করে বিখ্যাত হলেও মিডিয়া কিংবা কোন ধরনের কাভারেজ সযত্নে এড়িয়ে চলে, সম্ভবত নিজের অক্ষমতাকে কারো সামনে প্রকাশ করতে চায় না। তবে যতোক্ষন আরিফের সাথে দেখা না হচ্ছে কোন কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছে না তুষার।

ধানমন্ডি পার হয়ে মিরপুরের দিকে চলে গেল। এখানে এলোমেলোভাবে কিছুক্ষন ঘুরল। সবকিছু কেমন বদলে গেছে গত চৌদ্দ বছরে।

মিরপুরে বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব থাকে এখন, ওদের কারো সাথে দেখা করা যায়, কিন্তু ইচ্ছে করছিল না। গাড়ি ঘুরিয়ে আার ধানমন্ডিতে ফেরার পথ ধরল। বাসার কাছাকাছি আসতে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

অচেনা নাম্বার থেকে ফোন, কেন জানি মনে হচ্ছে এটা সেই লোকের ফোন।

"হ্যালো," তুষার বলল, কণ্ঠস্বর যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

"আর মাত্র সাতদিন বাকি," ওপাশ থেকে বলল কেউ।

"ঢাকায় এসেছি সাতদিন তো প্রায় হয়েই গেল," হাসল তুষার।

"নতুন করে সাতদিন সময় দিচ্ছি, মি. তুষার, কারন সাতদিনের মধ্যে ঢাকায় ফিরে এসেছেন আপনি," ওপাশ থেকে বলল। "এবার অন্য কিছু।"

"আমি জানি না আপনি কে, কি চান," তুষার বলল, "শুধু শুধু ঝামেলা করছেন, আমার সাথে দেখা করুন, কথা বলি।"

"সেটা সম্ভব না," ওপাশ থেকে খসখসে কণ্ঠস্বরে উত্তর এলো, "অনেকদিন আগে খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলেন আপনি। আগামি সাতদিনের মধ্যে পুলিশে আত্মসমর্পন করবেন।"

"কোন কাজের কথা বলছেন?" তুষার বলল, "আমি কোন খারাপ কাজ করি নি যে পুলিশে আত্মসমর্পন করতে হবে।"

"সেটা আপনার ইচ্ছে, তবে সাতদিনের মধ্যে কাজটা না হলে যা ঘটবে তার দায়-দায়িত্ব আপনার।"

"হুমকি দেয়া আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে দেখছি," তুষার বলল, "আপনি আমার বাকি বন্ধুদেরও হুমকি দিয়েছেন। তারমানে আপনি আমার খুব কাছের কোন মানুষ।"

"হতে পারে আবার নাও হতে পারে," ওপাশ থেকে বলল, "কাছের দূরের কোন ব্যাপার নেই। যে ভুল করেছেন তার ক্ষমা নেই। শাস্তি আপনার প্রাপ্য।"

"বাজে কথা ছাড়ুন, ফোন রাখছি," বলে লাইন কেটে দিল তুষার।

বিরক্ত লাগছিল, বাসার কাছাকাছি এসে পড়েছে, একটা সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারছে গুরুত্ব না দিতে চাইলেও টেনশন হচ্ছে, ঘটনাটা বাইরের কারো জানার কথা নয়। যদি না নিজেদের কেউ বলে থাকে। লোকটার হুমকির পেছনের কারনও বুঝতে পারছে না, এতোদিন পর কি প্রতিশোধ নিতে চায়, কিন্তু কিসের প্রতিশোধ? নিজেদের মধ্যে কেউ এই হুমকিগুলো দিচ্ছে না তো? আজমল, রুবেল, আরিফ কিংবা মশিউর? তাতে লাভ কি? একজন ফাঁসলে বাকিরাও ফাঁসবে নিশ্চিত।

অধ্যায় ১০

ঘড়ির দিকে তাকাল লোকটা, ঠিক দুটো বাজে, একটু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলো, করুন সুরে। তার সাথে যোগ দিলো আরো কয়েকটা। একটানা কিছুক্ষন ডেকে ক্লান্ত হয়ে ওরা থেমে যাওয়ার পর সব শুনশান হয়ে এলো আগের মতো। নিজের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে। রাত দুটো এমনিতেই অনেক রাত, শীতের রাত নয়, তারপরও আজ কুয়াশাও পড়েছে অনেক।

ছোট চায়ের দোকানটার বেঞ্চির উপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে, গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা কাঁথা জড়িয়ে। হাতে একটা বিড়ি, একটু পরপর টান দিচ্ছে, তাতে শরীরে উষ্ণতা বাড়লেও নিজের মুখের দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে আসছিল তার।

কাঁচাপাকা দাঁড়িগোঁফ আর মাথাভর্তি চুলে তার চেহারা দেখলে যে কেউ বাস্তুহীন পাগল ছাড়া আর কিছু ভাববে না। তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো এই মুহূর্তে দেখে নিচ্ছে চারপাশের পরিস্থিতি। রাস্তায় কেউ নেই, একটু আগে নাইটগার্ড ছেলেটা এসে ঘুরে গেছে, পাগল মনে করে তাকে কিছু বলেনি। রাস্তার উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার গেটের দারোয়ান একটু আগে বাইরে এসেছিল, একটু হেঁটে আবার ভেতরে ঢুকে গেছে, তাকে দেখেছে কি না বোঝা যায়নি। শীত লাগছিল, ছেড়া কাঁথার ভেতর পাতলা একটা শার্ট পরনে, শার্টের পকেটে ছোট মোবাইল ফোনটা চুপচাপ পড়ে আছে, একটু আগেই সামান্য নড়ে চড়ে উঠেছিল, ছোট একটা বার্তা নিয়ে। ক্ষুদে বার্তাটা দেখে হাসি ফুটে উঠেছিল লোকটার মুখে, কিন্তু সেটা অল্পসময়ের জন্য। ছেড়া লুঙিটার কোমরের কাছাকাছি জায়গায় গুঁজে রাখা অটোম্যাটিকটায় হাত বুলিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিলো সে।

সময় হয়ে গেছে। আর পাঁচ মিনিট। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট।

কুয়াশার রাতে নির্জন এক রাস্তায় পাঁচ মিনিট অনেক দীর্ঘ সময়। প্রতিটি সেকেন্ডে বড় বড় ঘটনা ঘটে চলেছে পৃথিবীময়, তার তুলনায় পাঁচ মিনিট পর যা ঘটবে তা এমন কিছু আহামরি ঘটনা নয়, পত্রিকায় হয়তো হেডলাইন হবে, তবে সেটা মাত্র একদিনের জন্য, আবার নাও হতে পারে।

এমনিতে সৃষ্টিশীল মানুষ সে, তবে এই কাজটায় নিজের সৃষ্টিশীলতার দিকটায় তেমন কিছু করার নেই, অতি সিম্পল কেস। হিট অ্যান্ড রান। আরো অনেক ভাবনা ভিড় করছিল মাথায়, কিন্তু পাঁচ মিনিটে সে ভাবনা শেষ হবে না। বেঞ্চটা নীচু, পায়ের আঙুল দিয়ে নীচের মাটিতে বেশ কিছুক্ষন দাগ কাটল কয়েকটা, আবার মিটিয়েও দিল সাথে সাথ।

ঠিক চার মিনিট পয়ত্রিশ সেকেন্ড পর রাস্তার মোড়ে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল।

ধীর গতিতে আসছে, অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার নীচে দাঁড়ানোর পর দারোয়ানের গেট খুলে দেয়া অবধি সময় পাওয়া যাবে ত্রিশ সেকেন্ড, এর মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে।

উঠে দাঁড়াল লোকটা, পরনের ছেড়া কাঁথা অনেক ভারি লাগছিল। এলোমেলোভাবে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে সে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙটার দিকে। গাড়িটা দামি, সামনের স্টেয়ারিংয়ে অভিজ্ঞ ড্রাইভার ইউনুস, পেছনের সিটে বসে আছে টার্গেট, টার্গেট অবশ্য একা নয়, পাশে একটা মেয়েও আছে, প্রায় রাতেই নিত্য নতুন মেয়ে দেখা যায় টার্গেটের পাশে, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর কিছুক্ষনের মধ্যেই গাড়িটা দাঁড়াবে গেটের কাছে, দারোয়ান গেট খুলে দেবার আগেই গাড়ির সামনে পৌছে গেল সে। কুয়াশা ভেদ করে হঠাৎ করে আবির্ভূত হলো গাড়ির সামনে, অনেকটা পথরোধ করে দাঁড়াল। ড্রাইভার জানালার কাঁচ খুলে গলা বের করে দিয়েছে।

"সামনে থেকে সর, হারামজাদা," ড্রাইভার ইউনুস খেঁকিয়ে উঠলো।

কোমরের পেছনে গোঁজা অটোম্যাটিক রিভলবারটা বের করে এর আগায় ধীরে ধীরে সাইলেন্সার বসালো লোকটা। ড্রাইভার ইউনুস আরো কিছু গালাগালি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সে সময় পেল না, তার আগেই একটা বুলেট মুখের ঠিক মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ থেকে, অস্পষ্ট কিছু কথা আটকে থাকল মুখের ভেতর।

এরপরের প্রতিক্রিয়া কী হবে পরিস্কার জানে লোকটা। টার্গেট গাড়ি থেকে বের হবে, মেয়েটাকে ঢাল করে, এমনকি টার্গেটের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও থাকতে পারে। আরো কয়েকপা এগুলো সে, ইউনুসের গালাগালি আর বুলেটের মৃদু শব্দের পর পৃথিবী যেন নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে। পৃথিবী থমকে গেছে যেন, গাড়ির ভেতর বসে টার্গেট কী ভাবছে অনুমান করার চেষ্টা করল। মৃত্যু খুব কাছে চলে আসলে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির সাথে পরিচয় আছে তার, তবে টার্গেট সম্ভবত এই প্রথমবার এই পরিস্থিতিতে পড়েছে।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের গেট খোলার শব্দ চারপাশে আলোড়ন তুলল যেন, দারোয়ান বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি, গাড়িটা কেন ভেতরে ঢুকছে না দেখার জন্য। কিন্তু তার আগেই একটু আগে করা অনুমানটা ঠিক প্রমানিত হলো।

টার্গেট বেরিয়ে এসেছে ডান পাশের দরজা দিয়ে। হাতে পিস্তল, সামনে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে মেয়েটাকে।

কিছু বুঝে উঠার আগেই এলোমেলোভাবে গুলি ছুঁড়ল টার্গেট। স্থির দাঁড়িয়ে বিষয়টা উপভোগ করলো লোকটা। টার্গেটের মাথার ঠিক নেই, একটু আগেই পাঁচ তারা হোটেলের বার থেকে বেরিয়ে এসেছে, মদে চুর হয়ে, সাথে সুন্দরী নারী, রাতটা

চমৎকার কাটছিল বেচারার, এর মধ্যে এসব ঝামেলা সহ্য করা সত্যিই কঠিন।

সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল সে। এসব বিষয়ে তাড়াহুড়া তার একদম অপছন্দ। মেয়েটা কাঁপছে, অল্প কিছু টাকার জন্য রাত কাটাতে এসেছিল এক মধ্যবয়স্ক মাতালের সাথে, জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে তা হয়তো কল্পনাও করেনি। মেয়েটাকে আরো একটু ভালোমতো খেয়াল করে দেখল সে।

সুন্দরী, বয়স কম, এই বয়সেই লাইনে নেমে পড়েছে দেখে কেমন একটা কষ্ট হলো তার। টার্গেটকে দেখেও মায়া লাগছে। এতো সাধের দুনিয়া কে ছাড়তে চায়। টার্গেটের নাম আজমল চৌধুরি, পেশায় ব্যবসায়ী, ইদানিং রাজনীতিতেও নাম লিখিয়েছে। বড় বড় টেন্ডারবাজিতে অংশ নিচ্ছে। চরিত্র খারাপ, একটাই বিয়ে, তবে নিত্য নতুন মেয়েদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে জুড়ি নেই, এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যে ফ্ল্যাটটা আছে তা কেনার উদ্দেশ্য একটা, ফূর্তি করা। আজমল সম্পর্কে খুব বেশি তথ্যের দরকার ছিল না। যেমনঃ কখন কোথায় যায়, কখন বাসায় ফেরে, সাথে কে থাকে, এইসব খোঁজখবর করতে বেশি সময় লাগেনি। আজ রাতে একটা পাঁচ তারা হোটেলের বারে গিয়েছিল আজমল, এইসব বারে সাধারনত সমাজের উচ্চশ্রেনীর লোকজন আনাগোনা করে।

আজমলও উচ্চশ্রেনীর লোক, সেখানে সব হাইক্লাস মেয়েরা যায়। কাজেই আজমলের মতো লোকদের জন্যে একটা আদর্শ জায়গা সেটা। সেখানকার এক ওয়েটারকে বেশ মোটা অংকের টাকা দিয়ে হাত করে বেশি পরিমানে ড্রিংক্স সার্ভ করানো হয়েছে, এমনকি সুন্দরী এক মেয়েকে নিয়ে বার ছাড়ার সময় মোবাইলে জানানোর জন্য অতিরিক্ত আরো দশ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে তাকে।

যাই হোক, বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল লোকটা। টার্গেটের হাতে পিস্তলটা কাঁপছে, গুলি ছুঁড়েছে কয়েকটা, একটাও লক্ষ্য ভেদ করে নি দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। এবার ভিন্ন কিছু একটা করে বসল টার্গেট, মেয়েটার মাথায় পিস্তলের নল ঠেকাল। বোঝাতে চাচ্ছে, তাকে যেতে না দিলে মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু টার্গেট জানে না, এই মেয়েটা মরে গেলে তার কিছু যায় আসে না। এই মেয়ে তার কেউ না, এই মেয়ের জন্য তার হাত কাঁপবে না।

পরপর কয়েকটা বুলেটের শব্দে একটু আগে চারপাশের আকাশ প্রকম্পিত হয়েছে। আশপাশের অনেক বাড়ির জানালায় কৌতুহলী কিছু মানুষের মুখ দেখা গেল। এরা আড়াল থেকে সব দেখবে, শুনবে, তারপর অফিসে, আড্ডায় গল্প করবে, সেই গল্প ডালপালা ছড়িয়ে অনেক দিকে যাবে, কিন্তু সাহায্যের জন্য এদের কেউ এগিয়ে আসবে না।

অনেক চিন্তাভাবনা হলো, এবার কাজে নামা যাক, এসব কাজে মনঃসংযোগ খুব জরুরি। দীর্ঘ কিছুটা সময় টার্গেটের দিকে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে সে,

এবার ট্রিগার চাপল লোকটা। মেয়েটা পড়ে গেছে সাথে সাথে। অচেতন হয়ে। টার্গেটের ঠিক কপাল ভেদ করে চলে গেছে বুলেট, পিস্তলে চাপ দেয়ার সময়ও পায় নি আজমল চৌধুরি।

টার্গেট টারমিনেটেড। কেস ডান। লাশের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। কোমরের পেছনে অটোম্যাটিকটা গুঁজে ফেলেছে, একজোড়া গ্লাভস চলে এসেছে হাতে। আজমল চৌধুরির লাশটা পা দিয়ে উল্টে প্যান্টের পেছন থেকে ম্যানিব্যাগ বের করে আনল। বেশ কিছু টাকা দেখা যাচ্ছে, হাজার টাকার নোট, অন্তত হাজার বিশেক তো হবেই। টাকাগুলো বের করে মেয়েটার পার্সে ঢুকিয়ে দিল সে। এটা ওর প্রাপ্যই ছিল।

কোমরে গুঁজে রাখা ভারি জিনিসটা বের করে আনল, এই জিনিস কসাইয়ের হাতে ভালো মানায়, হাড্ডি কাটায় ভালো কাজে দেয়। আজমল চৌধুরির পায়ে চকচকে দামি জুতো, দুটো পা সুন্দর করে মেলে ধরল, ধারাল অস্ত্রটা তাক করল, এক এক করে জুতোসহ পায়ের নীচের অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করল, খুব বেশি সময় লাগল না, পানির স্রোতের মতো রক্ত বেরুতে শুরু করেছে, রক্তের কিছু ছিটে এসে লেগেছে তার মুখে। ধারাল অস্ত্রটা কোমরে গুঁজে রেখে উঠে দাঁড়াল।

পেছনে তাকাল। অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, গেটের সামনে। নড়তে ভুলে গেছে যেন। ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছে দারোয়ান, হাসল লোকটা, তারপর হাঁটতে থাকল, ঘন কুয়াশায় মিশে গেল কিছুক্ষনের মধ্যে।

অধ্যায় ১১

চাকরিতে যোগ দেয়ার পর প্রথম কয়েকদিন শুধু ফাইল ঘাটতে হয়, দেখতে হয় অফিস কিভাবে চলে, সহকর্মি কে কেমন, কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে আর এগুলো বুঝতে বুঝতেই সময় চলে যাচ্ছে শাহরিয়ারের। এতো সব ফর্মালিটিতে এই কয়দিনেই বিরক্তি চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত ফিল্ড ওয়ার্কে যেতে দেয়া হয়নি, খুব সহজে যাওয়া হবে বলেও মনে হচ্ছে না। পুরানো কেসফাইলগুলো দেখতে দেখতে কিছু কিছু ফাইল আলাদা করে রেখেছে। এই কেসগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে বলে মনে করছে শাহরিয়ার, শুধু মনে করলেই তো হবে না, যুক্তিযুক্ত কারন ছাড়া এসব পুরানো কেস হাতে নেবে না ডিপার্টমেন্ট, সে কথা গতকাল পরিস্কার বলে দিয়েছেন আবু জামশেদ। তাই আলাদা করা ফাইলগুলোতে নোটস রাখছে, তারপর দেখা যাক কী হয়।

সহকর্মিদের সাথে পরিচয় হয়েছে, বাম দিকের টেবিলে খাড়া নাক, মাথায় চুল কম ছেলেটার নাম তানভীর হোসেন, আগে পুলিশে ছিল, কিছুদিন আগে যোগ দিয়েছে জুনিয়র ইনভেস্টিগেটর হিসেবে, বাকি সবাই অফিস স্টাফ।

স্ত্রিকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে ইমতিয়াজকে, শাহরিয়ার যেরকম ধারনা করেছিল ঠিক সেভাবেই ড্রাইভারকে কাজে লাগিয়েছিল লোকটা, লাখ দুয়েক টাকাও দিয়েছিল খুন করে পালিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ড্রাইভার পালিয়ে যাবার আগেই ধরা পড়েছে এবং স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ইমতিয়াজের ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন নিশ্চিত। চাকরিতে যোগ দেয়ার আগেই এই ধরনের সাফল্য ব্যতিক্রম এবং এই জন্য আবু জামশেদ তাকে আলাদা চোখে দেখতে শুরু করেছেন এবং অফিসের কিছু কিছু সহকর্মি তার দিকে তীর্যক চোখে তাকাতে শুরু করেছে।

যাই হোক, সকাল ন'টার আগেই অফিসে ঢুকে পড়েছে শাহরিয়ার, তবে চেয়ারে বসার সময় পেল না, তার আগেই ডাক এলো আবু জামশেদের রুম থেকে। ভদ্রলোক শাহরিয়ারকে রুমে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"চলো, দেরি করার সময় নেই," আবু জামশেদ বললেন, শাহরিয়ারকে ঠিক মতো দাঁড়ানোর সুযোগও দিলেন না।

আবু জামশেদের পেছন পেছন রুম থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার, বাইরে একটা জিপ দাঁড়িয়েই ছিল। দুজনে উঠে পড়ল পেছনের সিটে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

উত্তর দিলেন না আবু জামশেদ। তাকালেন, কিছুক্ষন নিরীক্ষন করলেন যেন শাহরিয়ারের চেহারাটা।

"বিগিনারস লাক বলে একটা জিনিস আছে জানো তো?" বললেন আবু জামশেদ, তবে উত্তরের অপেক্ষা করলেন না, "তোমাকে দিয়ে সেই জিনিসটার একটা পরীক্ষা করাতে চাচ্ছি। সেই সাথে মনে হলো, তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে অলস বানানোর দরকার নেই।"

"জি, স্যার।"

"আমি যখন প্রথম প্রথম তদন্তে যেতাম, আমার কোন গাইড ছিল না, পথ দেখানোর কেউ ছিল না, যা শিখেছি, করেছি, নিজে নিজে করেছি। একেকটা নির্ভুল রিপোর্টের জন্য দিন-রাত খেটেছি, তাতে খুব একটা লাভ হয়নি যদিও, বারবার বদলি হয়েছে, সিনিয়রদের সাথে মন কষাকষি হয়েছে।"

"জি।"

"তবে আমার ডিপার্টমেন্টে সেরকম কিছু হবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি, সবসময়।"

"জি।"

"এটা তোমার প্রথম অফিসিয়াল কেস, আশা করি তুমি পারবে," আবু জামশেদ বললেন, জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

"কেসটা...."

শাহরিয়ারের দিকে বড় চোখ করে তাকালেন আবু জামশেদ, তাকে বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছিল।

"কোন প্রশ্ন নয়, ড্রাইভার, গাড়ি চালাও," ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে শেষ কথাগুলো বলে সিটে হেলান দিয়ে বসলেন।

প্রশ্ন করলো না শাহরিয়ার, এই মানুষটাকে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। ভদ্রলোক সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলেন, তবে তাতে লাভ হয় না, চোখ মনের আয়না হলেও এই লোকটা নিজের ভেতরটাকে একদম গোপন করে রেখেছেন, তার ভেতরের আবেগ-অনুভূতি কোন কিছুই বাইরের মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয়। আবু জামশেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হঠাৎই খুব আগ্রহ হলো। এই মানুষটা কি বিবাহিত? ক'টা ছেলেমেয়ে? স্ত্রি কেমন? এইসব আলতু-ফালতু প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সিগারেটে অভ্যস্ত শাহরিয়ার, আবু জামশেদ সিগারেট ধরিয়েছেন, নিকোটিনের নেশা চাপলেও ভদ্রলোকের কাছে একটান দেয়ার কথা বলা যায় না। তিনি হয়তো বিরক্ত হতে পারেন, এমনিতেও বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছে, সম্ভবত সকাল সকাল অফিসে ঠিকমতো বসার আগেই বের হতে বাধ্য হওয়ার জন্য। কেসটা তাহলে খুব ছোটখাট কিছু না, ধারনা করল শাহরিয়ার।

ধীর গতিতে চলছে গাড়িটা, থানা খুব বেশি দূরে নয়, কম্পাউন্ডে গাড়ি রেখে শাহরিয়ারকে ইশারায় অনুসরন করতে বললেন আবু জামশেদ।

একসময় সাধারন মানুষ হিসেবে থানা-পুলিশ সবসময় এড়িয়ে চলেছে শাহরিয়ার, থানায় যাওয়া মানেই ঝামেলা, টাকা-পয়সার খেলা, এর আগে কখনো থানায় ঢোকে নি, থানা নিয়ে অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করে, মনে হয় একবার ঢুকলে কোনদিন আর বেরুতে পারবে না, তবে সেইসব ভয় এখন কাটিয়ে উঠতে হবে। থানা-পুলিশ আর অপরাধজগতের সাথেই তার ভবিষ্যত।

থানার ইনচার্জ মো কামরুল ইসলামের রুমে ঢুকে পড়েছেন আবু জামশেদ, তাকে দেখে বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়াল, সালাম দিল।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন, শাহরিয়ারকে বসার জন্য ইশারা করলেন।

"ঘটনা কী কামরুল?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

কামরুল ইসলাম নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল, গুন গুন করে কোন এক হিন্দি গানের সুর ভাঁজছিল, বোঝা যাচ্ছিল, সামনে বসা আবু জামশেদকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে না।

"স্যার, ঘটনা খুব গুরুতর," সোজা হয়ে বসে বলল কামরুল ইসলাম, "বিশিষ্ট একজন ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন।"

"কি নাম?"

"আজমল চৌধুরি, চেনেন?"

মাথা ঝাকালেন আবু জামশেদ, বোঝা যাচ্ছে, আজমল চৌধুরিকে চেনেন তিনি।

"লাশ নিয়ে আসা হইছে, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট চলে আসবে শিগগিরি," কামরুল ইসলাম বলল, "তা স্যার, পান খাবেন, না ঠান্ডা-গরম কিছু আনামু?"

"আপনারা কাজটা ঠিক করেন নি," আবু জামশেদ বললেন, "আমাদের জানানো দরকার ছিল, অন্তত লাশটা ওখান থেকে সরানোর আগে, ক্রাইমসীন ইনভেস্টিগেশন বলে একটা ব্যাপার আছে, জানেন তো!"

"কই, ঐরকম কোন আদেশ তো পাই নাই," কামরুল ইসলাম বলল।

"এরপর যেন এরকম ভুল করতে না পারেন সে ব্যবস্থা আমি করছি," আবু জামশেদ বললেন, "আমি এখন ঘটনাস্থলে যাবো।"

"যাইতে পারেন, সমস্যা কী?" এক গাল হেসে বলল কামরুল ইসলাম, "তবে সমস্যা হইতেছে যে এই কেসটা আমরাই হ্যান্ডেল করবো, আপনের কষ্ট করার দরকার কী।"

"কেস যে আপনারাই হ্যান্ডেল করবেন এতো নিশ্চিত হলেন কী করে?"

"স্যার, কেসটা জটিল, এতো জটিল কাজে আপনের না ঢুকাই ভালো। তবে আমার মনে হয় কেসটা সিম্পল ছিনতাই কাহিনী, ম্যানিব্যাগ থেইক্যা সব টাকা নিয়া গেছে, সাথে মোবাইল, দামি ঘড়ি, সব," কামরুল ইসলাম বলল।

"কোন প্রত্যক্ষদর্শী?"

"ঐ এলাকায় গুলাগুলির শব্দ শুইনা টহলপুলিশ যায়, গিয়া দেখে রাস্তার উপরে লাশ পইড়া আছে। ও, আরেকটা কথা কইতে ভুইলা গেছি," কামরুল ইসলাম বলল।

"কী?"

"লাশ কিন্তু একটা না," চাপা গলায় বলল কামরুল ইসলাম, "উনার ড্রাইভাররেও মারছে।"

"বলেন কী? উনার কাছ থেকে কতো টাকা খোয়া গেছে বলে আপনার ধারনা?"

"সেটা কিভাবে বলি," কামরুল ইসলাম বলল, "উনার ম্যানিব্যাগের খবর তো আর আমার কাছে থাকে না।"

শাহরিয়ারের দিকে তাকালেন আবু জামশেদ, বোঝাই যাচ্ছে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন কামরুল ইসলামের কথাবার্তায়।

"এই কেসটা আমরাই হ্যান্ডেল করবো," আবু জামশেদ বললেন।

"কিন্তু..."

"কোন কিন্তু না," আবু জামশেদ বললেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, "আপনি কিছুক্ষনের মধ্যেই ফোন পাবেন। আর মনে করে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের একটা কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

কামরুল ইসলাম উঠে দাঁড়াল, আরো কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারল না, বুঝতে পারছে আবু জামশেদ রেগে যাবেন যে কোন সময়।

"ঠিক আছে," কামরুল ইসলাম বলল, অনেকটা টিপ্পনীর সুরে, "কাজটা হাল্কা করে দেন, বাকিটা আমরা দেখমুনে।"

এক হাতে সোজা কামরুল ইসলামের কলার চেপে ধরলেন আবু জামশেদ, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে, এতোটা রেগে যাবেন বুঝতে পারে নি শাহরিয়ার, কী করবে বুঝতে পারছিল না।

"কামরুল, তুমি কিন্তু আমাকে চেনো, চেনো না?" রাগের চোটে এবার কামরুল ইসলামকে তুমি বললেন আবু জামশেদ।

"জি, স্যার, চিনি।"

"এটাই লাস্ট ওয়ার্নিং," কলার ছেড়ে দিলেন আবু জামশেদ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কামরুল ইসলাম, দৃশ্যটা আর কেউ দেখেছে কি না দেখার জন্য আশপাশে তাকাল, দরজা বন্ধ, জানালায় পর্দা ঝুলছে, কেউ দেখতে পায় নি বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"জি, স্যার।"

আর কিছু বললেন না আবু জামশেদ, বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে, তার পেছন পেছন শাহরিয়ারও যাচ্ছে।

কামরুল ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে রুমে, আবু জামশেদকে সে একদমই সহ্য

করতে পারে না, চাকরিতে ঢোকার পর বেশ কয়েকটা বছর এই লোকের সাথে কাজ করতে হয়েছিল, অন্যান্য থানার লোকজন যখন আঙুল ফুলে কলাগাছ, এই লোকের কল্যানে বেতনের বাইরে এক টাকাও রোজগার হয়নি। অনেক কষ্টের দিন গেছে, কপাল ভালো যে একসময় ট্রান্সফার হয়ে যেতে পেরেছিল, নইলে চাকরিজীবনের বেশিরভাগটাই বিফলে যেত। বেশি সৎগিরি ফলানোর প্রতিদান এখন পাচ্ছে ঐ আবু জামশেদ, নতুন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ঐ ডিপার্টমেন্ট কী করতে পারবে তা জানা আছে! মুখ বাঁকাল কামরুল। এই কেসটার চার্জশীট তৈরি করে ফেলতে হবে দ্রুত, হত্যা-মামলা, মোটিভ ছিনতাই, খুনি অজ্ঞাত।

আবু জামশেদের বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার জন্য সে সদা প্রস্তুত, তাই আজমল চৌধুরির পায়ের পাতা বিচ্ছিন্ন করার কথা পুরো চেপে গেছে, কেস যেহেতু হ্যান্ডেল করবে নিজেরাই জেনে নিক ঘটনাস্থলে গিয়ে, এছাড়া ঘটনাস্থলে থাকা দারোয়ানের কথাও চেপে গেছে। লোকটা কিছু দেখেছে বলে স্বীকার করে নি, তবু কামরুলের মন বলছে ঐ দারোয়ান অবশ্যই কিছু দেখেছে, ভয়ে স্বীকার করছে না। এইসব কেস নিয়ে খুব বেশি ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছে নেই, তাই দারোয়ানকে আর ঘাটায়নি।

চেয়ারে আবার হেলান দিয়ে বসল, প্রিয় একটা হিন্দি গানের সুরে গুনগুন করছিল উনারা আসার আগে, এখন সেই গানটা মনে আসছে না। বিরক্তিতে ভ্রু কুচকাল কামরুল ইসলাম। আজকের দিনটা ভালো যাচ্ছে না।

অধ্যায় ১২

সকালে ঘুম থেকে উঠেই খবরটা পেল তুষার। আজমল নেই। গতকাল রাতে কে বা কারা খুন করেছে। খবরটা একটু আগে দিল রুবেল, পুলিশে ওর পরিচিত কিছু মানুষ আছে, ধারনা করা হচ্ছে ছিনতাইকারির কাজ। এখনো পত্রিকায় আসেনি, তবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে খবরটা এরমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

রুবেলের গলার আতংক পরিষ্কার টের পেয়েছে তুষার। এটা যে ছিনতাইকারির কাজ নয়, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছিনতাইকারি কখনো মৃতব্যক্তির পায়ের পাতা বিচ্ছিন্ন করে না। হুমকি যে দিয়েছিল, সাতদিনের মধ্যে কাজ করেছে। এবার তাহলে কার পালা? রুবেল নাকি মশিউরের? তাকে বাড়তি সাতদিনের সময় দেয়া হয়েছে, এটা রুবেল কিংবা মশিউরকে বলা যাবে না।

এর পেছনে কি আরিফ জড়িত? ঐ ঘটনায় এই চারজনের বাইরের লোক আরিফ, যে এখন হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে, লেখালিখির সাথে যুক্ত, এছাড়া ওর চরিত্রের সাথেও খুনোখুনি ব্যাপারটা যায় না, বেশ টাকা-পয়সা রোজগার করেছে লেখালিখি করে, অবশ্য ভাড়াটে কাউকে ম্যানেজ করা খুব কঠিন কিছু হওয়ার কথা নয়। পাশাপাশি মশিউরকেও সন্দেহের তালিকা থেকে ফেলে দেয়া যায় না।

আজমল আর রুবেলের সাথে ওর শত্রুতা আছে, সে নিজেও হয়তো সেই তালিকায় আছে, একসময় সুমনার প্রতি মশিউরের দূর্বলতা ধরতে পেরে ওকে এড়িয়ে চলা শুরু করেছিল তুষার, সেটা যদিও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে একজন ক্ষেপে যাওয়া মানুষ তুচ্ছ সব কারনে আরেকজনের ক্ষতি করতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

মোবাইল ফোনটা রেখে বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইল তুষার। থানায় একটা জিডি করে রাখা ভালো। তবে বাসার কাউকে কিছু জানতে দেয়া যাবে না। ক্রিস্টিনা জানতে পারলে এখনই ঢাকা ছেড়ে যেতে চাইবে। জিডি করাও মুশকিল, কে হুমকি দিচ্ছে, কেন হুমকি দিচ্ছে এসবের কোন সদুত্তর দিতে পারবে না। কিছুক্ষনের মধ্যে নাস্তা সেরে চুপচাপ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো তুষার।

আরিফের সাথে দেখা করতেই হবে আজ। এসব ঘটনার উত্তর হয়তো ওর কাছেই আছে। ক্রিস্টিনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুষারের চলে যাওয়া দেখল, ঢাকায় আসার পর থেকে তুষারকে খুব একটা কাছে পাচ্ছে না। এ নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই, যে ক'টা দিন ঢাকায় আছে নিজের মতো চলুক, এরপর সারাজীবন তো পড়েই আছে, তুষারকে কাছে পাওয়ার জন্য। একটু পর সুমনার সাথে ঘুরতে যাবে, এখানকার মার্কেটগুলো সব এখনো ঘুরে দেখা হয়নি। রাস্তার ওপাশ থেকে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছিল তুষারের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, বারান্দায় দাঁড়ানো ক্রিস্টিনাকে। দারোয়ান গেট বন্ধ করতে এগিয়ে আসছে দেখে দ্রুত সরে গেল একটা গাছের আড়ালে।

অধ্যায় ১৩

জীবনের প্রথম ফিল্ড কেস, ক্রাইমসীন দেখতে এসেছে আবু জামশেদের সাথে। গুলশান এলাকা। বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নীচে বেশ কিছুটা জায়গা হলুদ টেপ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। একটা সাদা গাড়ি পড়ে আছে এখনো, গাড়িটা নিহত আজমল চৌধুরির, ড্রাইভিং সীটটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে, সামনের কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আগ্রহী জনগন এখনো পুরো জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। এতো আগ্রহ নিয়ে কী দেখছে বুঝতে পারছে না শাহরিয়ার। একটা গাড়ি, রাস্তায় জমাট রক্ত ছাড়া আর দেখার কিছু নেই ওদের জন্য। তবে আবু জামশেদ এবং তার জন্য এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি। ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট চলে আসবে কিছুক্ষনের মধ্যে, দু'দুটো লাশ নিয়ে গেছে পুলিশ, ক্রাইমসীন ঠিকমতো পর্যবেক্ষন করার আগেই। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এখানে খুনির কোন আলামত পাবে বলে মনে হয় না, পেলে হয়তো পুলিশের কয়েকজন সদস্যেরই আঙুলের ছাপ পেতে পারে, ধারনা করল শাহরিয়ার।

জীপটা একপাশে রেখে ক্রাইমসীনে চলে এসেছেন আবু জামশেদ, পেছনে শাহরিয়ার। এক নজরে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছেন। গাড়ি থেকে নামার পর গুলি চালানো হয়েছে আজমল চৌধুরির উপর, ভদ্রলোকের হাতেও একটা রিভলবার ছিল, লাইসেন্স করা অস্ত্র, সে অস্ত্রটা থেকেও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছে বলে শুনেছেন তিনি। বুলেটের কিছু খোসা এখনো পড়ে আছে। রিভলবারটা এখন পুলিশের কাছে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। রাস্তার এই অংশটা শুকনো মাটি, আলকাতরার আস্তরন উঠে গেছে, গাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে অন্তত দুজন মানুষ বের হয়েছে, জুতোর ছাপ তাই বলে এবং ছাপগুলোর একটা মেয়েদের হাইহীলের। অদ্ভুত! পুলিশের কাছে কোন মেয়ে উপস্থিত ছিল বলে শোনেন নি তিনি। হাইহীলের ছাপ অনুসরন করার চেষ্টা করলেন। মাটিময় জায়গায় দু'একটা ছাপ চোখে পড়ল, তারপর রাস্তার শক্ত জায়গা, এখানে হাইহীলের ছাপ পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এটুকু নিশ্চিত, ঘটনার সময় একজন নারী চরিত্র এখানে উপস্থিত ছিল। ড্রাইভিং সিটের মতো এখানেও প্রচুর রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং জমাট রক্তের মধ্যে কিছুটা দূরত্বও দেখতে পেলেন তিনি। মনে হচ্ছে রক্তের উৎস ছিল আলাদা আলাদা। ঘটনা কি?

ঠিক যে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নীচে গাড়িটা আছে তার দারোয়ানকে ডাকলেন তিনি, হাত ইশারায়, লোকটা কৌতুহলি চোখে তাকিয়ে আছে এইদিকেই। ডাক পেয়ে চলে আসল দ্রুত।

"তুমি এই বাড়িতে ডিউটি করো?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

"জি, স্যার।"

"নাম কি তোমার?"

"আব্দুর রহমান।"

"গতকাল রাতে কোথায় ছিলে?"

"এইখানেই, স্যার।"

"গোলাগুলির শব্দ পাওনি?"

"পাইছি," দারোয়ান বলল, তাকে কিছুটা ভীত মনে হলো, "তয় আমি কিছু দেহি নাই।"

"গুলির শব্দ পেয়ে তুমি কী করলে?"

"স্যার, আমার সাহস কম, কোনমতে গেইট খুইলা বাইরে আইসা দেহি, উপরের তলার স্যার পইড়া আছে, চাইরদিকে রক্ত।"

"খুনি কে তুমি দেখ নি?"

"না, স্যার।"

"কোন মেয়ে ছিল? মানে তোমার স্যারের সাথে?"

"জি, না, স্যার," দারোয়ান বলল।

আবু জামশেদ লোকটাকে বোঝার চেষ্টা করলেন, অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের মতো এই অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান কোন কোম্পানি থেকে নিয়োগকৃত নয়, তাই স্বাভাবিক পোশাকেই আছে। বয়স পয়ত্রিশের মতো, চেহারায় ধূর্ততার ছাপ আছে, বারবার হাত কচলাচ্ছে, এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, চোখের পাতা ঘন ঘন ফেলছে, শ্বাস নিচ্ছে দ্রুত। কিছু একটা লুকাচ্ছে। শাহরিয়ারকে হাত ইশারায় ডাকলেন।

"আব্দুর রহমানকে গাড়িতে তোল, ওর সাথে অনেক কথা বাকি আছে," আবু জামশেদ বললেন, শাহরিয়ারকে লক্ষ্য করে।

"স্যার, আমি কিছু করি নাই," পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বলল আব্দুর রহমান, ভেবেছিল, সামান্য মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবে।

"তাহলে আসল কথা বলো," আবু জামশেদ বলল।

"রাইতে স্যারের গাড়ির হর্ন শুইন্যা গেট খুললাম, অনেক রাইত তখন," ঢোঁক গিলে বলা শুরু করল আব্দুর রহমান, "গেট খুইল্যা দেহি, পাগলা একটা লোক হাতে পিস্তল নিয়া স্যারের গাড়ি আটকাইছে, এরপরে স্যারের ড্রাইভাররে গুলি করছে। এরপরে স্যারে পেছনের দরজা দিয়া বাইর হইছে, তার হাতেও পিস্তল ছিল, সেও কয়েকটা গুলি করছে, কিন্তু একটাও লাগে নাই। শেষে ঐ পাগলা ব্যাটা স্যাররে গুলি কইরা পালাইয়া গেছে।"

"এতোটুকুই? আর কিছু নেই?"

"আর?"

"ঐ লোকের পিস্তল থাইকা যে গুলি বাইর হইছে তার কোন শব্দ পাই নাই।"

"অদ্ভুত! তার মানে সাইলেন্সার ব্যবহার করেছে। আর কিছু?"

"স্যারের সাথে একটা খারাপ মেয়েছেলে ছিল, সে মেয়ে প্রথমে অজ্ঞান হইয়া গেছিল, পুলিশের গাড়ি আসার আগেই মাইয়াডা পলাইছে।"

"গুড, ধীরে ধীরে সব বের হচ্ছে," আবু জামশেদ বললেন, "তুমি এতোক্ষন ধরে কি করলে?"

"আমি ডরাই গেছিলাম, স্যার, চোখ বন্ধ কইরা দাঁড়াইছিলাম," আব্দুর রহমান বলল।

"খুনিকে পাগলা বলছো কেন? খুলে বল, কী পাগলামি করেছিল?"

"স্যার, ঐ লোকের পোশাক আশাক ছিল পাগলদের মতো, ছেঁড়া খেতা আর লুঙি, চুলমুল সব উল্টাপাল্টা, চোখ বড় বড়, লাল, আর..."

"আর স্যারের মানিব্যাগ থেইক্যা টেকা বাইর কইরা সব ঐ খারাপ মাইয়ার ব্যাগে ঢুকাইয়া দিয়া গেছে।"

"ইন্টারেস্টিং! এর পর?"

"এরপর..." বলে একটু থামল দারোয়ান, "একটা চাপাতি দিয়া স্যারের দুই পায়ের নীচে কোপ দিল, পায়ের পাতা দুইটা আলাদা করল।"

"এরকম কিছু হয়েছে নাকি?"

"জি, স্যার, আমি নিজের চোখে দেখছি।"

শাহরিয়ারের দিকে তাকালেন আবু জামশেদ, মেজাজ খারাপ হচ্ছিল খুব, কামরুল ইসলাম এই কথাটা তার কাছে বেমালুম চেপে গেছে। ওকে সামনে পেলে এক চড়ে সব দাঁত ফেলে দিতেন, হারামজাদা একটা।

"এরপর?"

"এরপরে পুলিশের গাড়ি আইল, লাশ নিয়া গেল," আব্দুর রহমান বলল।

"ঠিক এখন যা বললে সব আমি পরে লিখিত নেবো, তখন যেন আবার উল্টাপাল্টা বলো না, তাহলে ফেঁসে যাবে।"

"জি, স্যার, আমি কিছু করি নাই, উল্টাপাল্টা কমু কে?"

"তাহলে শুরুতে বলো নি কেন?"

"স্যার, ডরাইছিলাম, মনে করছিলাম এসব কইলে থানায় নিয়া যদি আমারেই ঢুকাইয়া দেয়, তাইলে কই যামু," আব্দুর রহমান বলল।

"শাহরিয়ার," শাহরিয়ারের দিকে তাকালেন আবু জামশেদ, "ওর সব ডিটেইলস নিয়ে রাখো। নাম, ঠিকানা, গ্রামের নাম, মোবাইল নাম্বার, সবকিছু।"

"জি, বস।"

"তুমি যাও," আব্দুর রহমানকে বললেন, "আগামি একমাসের মধ্যে ঢাকার বাইরে যাবে না। যদি যাও তাহলে থানায় জানিয়ে যাবে, ঠিক আছে?"

মাথা নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল আব্দুর রহমান।

জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন আবু জামশেদ। বেশ কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেল। খুনির বেশভূষা অস্বাভাবিক, খুনটা টাকার জন্য হয়নি এবং একটা মেয়ে ঘটনার সময় ছিল। মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারলে ভালো হতো, সেটা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। শাহরিয়ারকে কাজে লাগাতে হবে।

গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি, পাশে শাহরিয়ার।

"আজমল চৌধুরি গতকাল এবং তার আগের কয়দিন কোথায় কোথায় সময় কাটিয়েছে খবর নাও, এই ধরনের মেয়ে জোগাড়ের জন্য ওর নিজস্ব কিছু চ্যানেল আছে, সেখানে খবর নাও, ঐ মেয়েটাকে আমাদের দরকার। তাহলে আরো কিছু ডিটেইলস পাবো, তবে নিশ্চিত থাকো, ছিনকারির কাজ নয় এটা, পেশাদার একজন খুনির কাজ এবং এই ধরনের খুনির কাজের সাথে আমাদের আগে পরিচয় হয়নি। এই খুনের পেছনে বড় কোন কিছু আছে। আজমল চৌধুরির ব্যবসা, রাজনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক কলহ এসব কিছু জানতে হবে আমাদের, বুঝলে?"

"জি, স্যার।"

"কিছু বলবে?"

"জি, স্যার," শাহরিয়ার বলল, হাতের মোবাইল ফোনটা আবু জামশেদের দিকে এগিয়ে দিল, মোবাইল স্ক্রিনে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, ক্রাইমসীনের নয়, বরং একটু দূরে থাকা একটা চায়ের দোকানের বাঁশের তৈরি বেঞ্চের ছবি।

"এই ছবির মানে কি?"

"স্যার, নীচের ঐ দাগগুলো দেখুন," শাহরিয়ার বলল।

তিনি তাকালেন, বেঞ্চের নীচের মাটিতে বেশ কয়েকটা দাগ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ একজন সেখানে কিছু লেখার চেষ্টা করেছে, আবার মিশিয়েও দিয়েছে সাথে সাথে। তারপরও দাগগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওগুলো আর কিছু না, কোন নামের ইনিশিয়াল সম্ভবত। ইংরেজি 'এ' আর 'এইচ'।"

"এই দাগগুলোর আর কী মানে হতে পারে বলে তোমার ধারনা?"

"স্যার, খুনি এখানেই অপেক্ষা করেছে আজমল চৌধুরির জন্য, সময় কাটানোর জন্য হয়তো এই দাগগুলো কেটেছে, তবে দাগগুলো কিন্তু হাবিজাবি কিছু না, বিশেষ কোন অর্থ অবশ্যই আছে।"

"তাতে কী? এই দাগগুলো যে কেউ কাটতে পারে। এখানে খুনি অপেক্ষা করেছে, সময় কাটানোর জন্য দাগ কেটেছে, এগুলো একটু অতি কল্পনা হয়ে গেল না?"

"জি, স্যার, আমি হয়তো একটু বেশি ভাবছি," শাহরিয়ার বলল, আসলেই অতিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে। যতোদূর শুনেছে এই চায়ের দোকানটা বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ, দোকানদার বাড়ি গেছে, এখনো ফেরেনি। এই দাগগুলো যে কেউ কাটতে

পারে।

"তুমি মনে হয় কোনকিছু নিয়ে অনেকদূর ভেবে ফেল," আবু জামশেদ বললেন, "আগের কেসটায় তোমার ধারনা ঠিক বলেই সবসময়ই ঠিক হবে বলে মনে করো না।"

বসের কথা ঠিক, মাথা নাড়াল শাহরিয়ার। তবে ঐ নামের আদ্যাক্ষরের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

"আমি তোমাকে কয়েকটা কাজ দিচ্ছি, আজকালের মধ্যে এই খবরগুলো আমার চাই," আবু জামশেদ বললেন।

"জি, স্যার, বলুন।"

"গত কয়েকদিন আজমল চৌধুরি কোথায় কোথায় গেছে, ওর সাথে গতকাল রাতে কোন মেয়েটা ছিল, এই তথ্যগুলো আমার দরকার। এছাড়া, গতকাল রাতে এই এলাকায় কোন কোন মোবাইল নাম্বার চালু ছিল, সেই নাম্বারগুলোও দরকার।"

"স্যার, খুনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে বলে আপনার ধারনা?"

"অবশ্যই। যতোই পাগল সেজে থাকুক, সে একজন পেশাদার, তার কাছে অবশ্যই মোবাইল ফোন ছিল," আবু জামশেদ বললেন, "কোথাও আটকে গেলে আমাকে জানাবে।"

"জি, স্যার," শাহরিয়ার বলল, "তবে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে, লোকটা পেশাদার নয়, বরং সাইকোপ্যাথ ধরনের। পেশাদাররা টাকার জন্য কাজ করে, অথচ লোকটা মৃত একজন মানুষের পায়ের পাতা চাপাতির কোপে আলাদা করেছে, ম্যানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে ঐ মেয়েটার পার্সে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত!"

স্বীকার করতেই হবে, অদ্ভুত! মৃত ব্যক্তির পায়ের পাতা আলাদা করার নিশ্চয়ই কোন কারন আছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন আবু জামশেদ, মনের মধ্যে একটা কু-ডাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে এটাই প্রথম নয়, এরকম আরো কিছু ঘটনা ঘটবে। পেশাদার খুনির চেয়ে সাইকোপ্যাথ সামলানো বেশি ঝামেলার। এর আগে এই ধরনের সাইকোপ্যাথের পাল্লায় পড়তে হয়নি এবং এই খুনি ভয়ংকর ধরনের অসুস্থ একজন মানুষ।

নতুন ডিপার্টমেন্টের সামর্থ্য প্রমানের খুব বড় সুযোগ এটাই। আরো মারাত্মক কিছু করে ফেলার আগেই খুনিকে ধরতে হবে। শাহরিয়ারের দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি, ছেলেটা এখনো মোবাইল ফোনে তোলা ছবিটা দেখছে, আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে। ওর মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন, একসময় তিনিও এরকম ছিলেন। প্রেডিকশন করতে পছন্দ করতেন, বেশিরভাগ সময়ই সেসব প্রেডিশকন ভুল প্রমানিত হতো। এই ছেলেটা এখনো সে পর্যায়ে আছে, মাত্র যোগ দিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

অধ্যায় ১৪

উত্তরার এই বাড়িটায় এর আগে অনেকবার এসেছে তুষার, এটা আজমলের পৈত্রিক বাড়ি, এরপর ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক বাড়ি কিনলেও বসবাসের জন্য এই বাড়িটাই বেছে নিয়েছিল আজমল। পাঁচতলা বড় এই বাড়িটার সামনের অনেকটা জায়গা খোলামেলা, রাস্তা জুড়ে আজমলের আত্মীয়-স্বজন, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের গাড়ি পার্ক করা, নিজের গাড়িটা কোনরকম একপাশে পার্ক করে গেটের সামনে দাঁড়াল তুষার। এই বাড়ির লোকজন এখন আর তাকে চিনবে না। আজমলের স্ত্রি কিংবা সন্তানদের সাথে কখনো পরিচয় হয়নি, আজমলের স্ত্রি তার নামটাও জানে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজমলের বাবা মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হলো, মা মারা গিয়েছিল আজমল ছোট থাকতেই, ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। বাসায় অন্যান্যদের মধ্যে আজমলের ছোট এক চাচা থাকতেন, পরিবার নিয়ে। তিনি এখনো এখানে থাকেন কি না কে জানে।

রুবেল চলে আসবে যেকোন সময়। ওর আসা পর্যন্ত গেটের বাইরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল তুষার। বাসায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে, সবাই আজমলের খুব কাছের লোক, এমনিতে বদমেজাজি, রুক্ষপ্রকৃতির হলেও আত্মীয়-স্বজন কিংবা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করতো তাদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ছিল আজমল, যখন যেভাবে সম্ভব অর্থ-সাহায্য করেছে। কাজেই আগত লোকজনের বেশিরভাগেরই মন খারাপ। অনেকের চোখে পানিও দেখতে পেল।

চৌধুরি নিবাসের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছিল তুষার, মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না, খুব সম্ভবত নিজ দেশ থেকে হাজার মাইল দূরের কোন পরভূমে মৃত্যু হবে তার। ক্রিস্টিনা ছাড়া দু'ফোটা চোখের জল ফেলার মতো কেউ থাকবে না। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। রুবেল কিংবা অন্য কোন পরিচিত মুখ খুঁজছে। খুব অল্প বয়সেই চলে গেল আজমল, তার বিশাল ব্যবসা-বানিজ্য ওর স্ত্রি সামলাতে পারবে কি না কে জানে। তবে আপাতত এইসব বিষয় নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না, আজমলের সাথে গত কয়েকদিন আগে দেখার হওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। খুব প্রানবন্ত ছিল, সব হুমকি-ধামকিকে উড়িয়ে দিচ্ছিল হাতের তুড়িতে। তবে খুনি সম্ভবত আজমলের চেয়েও এক পা এগিয়ে, নইলে চারদিকে নজর রাখা একজন মানুষ রাত-দুপুরে এভাবে খুন হতে পারে না। আগামি কয়েকদিন পত্র-পত্রিকায় খুব লেখালিখি চলবে এই মৃত্যু নিয়ে, তারপর একসময় সব থিতিয়ে আসবে। খুনি ধরা পড়বে না এবং সম্ভবত এরপরের টার্গেট হতে যাচ্ছে মশিউর। কেন জানি কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধি মনে হচ্ছিল

এইসময় একটু দূরে চোখ মুছতে মুছতে মশিউরকে আসতে দেখল তুষার, আজমলের বাল্যকালের বন্ধু, একসাথে স্কুল-কলেজে পড়েছে। কাঁধে হাত পড়াতে চমকে পেছনে তাকাল তুষার। লোকটাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল, অনেক অনেক আগে দেখা একজন মানুষ, নামটা মনে থাকলেও চেহারাটা স্মৃতি থেকে একদম হারিয়ে গিয়েছিল।

আজমলের ছোট চাচা, গিয়াস চৌধুরি। বিষন্নচোখে তাকিয়ে আছেন তুষারের দিকে।

"তুমি তুষার, তাই না? আমাকে চিনেছো?" কাঁধ থেকে হাত না সরিয়ে বললেন তিনি।

"জি।"

"ঐ যে ছেলেটা আসছে ওর নাম মশিউর না?"

চোখের ইশারায় মশিউরকে দেখালেন গিয়াস চৌধুরি। শেষবার যখন দেখেছিল লোকটাকে তখন যথেষ্ট স্মার্ট ছিলেন ভদ্রলোক, এখন আরো স্মার্ট দেখাচ্ছে। সাদা পাঞ্জাবি পরনে, মাথার চুল প্রায় সব পেকে গেছে, গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। আজমলের সাথে চেহারায় অনেক মিল।

"জি।"

"ও যেন এই গেট দিয়ে ঢুকতে না পারে," চাপা গলায় বললেন তিনি, তার কণ্ঠের বিদ্বেষ চাপা থাকল না, অবাক হয়ে তাকাল তুষার বয়স্ক মানুষটার দিকে।

"বুঝলাম না।"

"এই ঘটনার সাথে ও জড়িত," বললেন তিনি, "আমি ওকে জেলের ভাত খাওয়াবো।"

"কোন ঘটনার সাথে জড়িত?"

গিয়াস চৌধুরি তুষারের দিকে তাকালেন চোখ বড় বড় করে। "তুমি দেখছি কিছুই জানো না?"

"একটু খুলে বলুন, আমি দেশে ছিলাম না অনেকদিন," তুষার বলল।

"এই মশিউর হুমকি দিয়েছিল আজমলকে নাকি খুন করে ফেলবে, সেটাও অনেক মানুষজনের সামনে," গিয়াস চৌধুরি বললেন, "আজমল আমাকে কিছু বলে নি, কিন্তু খবর চলে এসেছে আমার কাছে। আমি ওকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজমলের কারনে পারিনি।"

"ওটা বন্ধুদের মধ্যে সামান্য মনকষাকষি," তুষার বলল, "রাগের মাথায় মানুষ কতো কিছুই বলে।"

"তুমি মশিউরের খুব ক্লোজ বন্ধু, তাই না?" চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলেন গিয়াস চৌধুরি।

বয়স্ক মানুষটার কথাবার্তার সুর ভালো লাগছে না। সারাজীবন মানুষের পেছনে লেগেছিলেন, কিভাবে কার ক্ষতি করতে পারবেন, কিভাবে কাউকে হয়রানি করে টাকা রোজগার করা যাবে এসব ধান্ধায়, কথাগুলো আজমলের কাছেই শুনেছিল একসময়। নিজের আপন চাচা বলে কখনো কখনো প্রশ্রয় দিলেও চাচার শঠতা সম্পর্কে বলতে কখনো দ্বিধা করতো না আজমল। লোকটার সুন্দর, নরম করে কথা বলা আর নিষ্পাপ মুখ দেখে কথাগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আজমল ভুল কিছু বলেনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও কোন ফন্দি-ফিকিরে আছেন নিশ্চয়ই।

"তাতে কি?" তুষার বলল, "আমরা সবাই একই স্কুলে পড়েছি।"

মশিউর প্রায় চলে এসেছে গেটের কাছে। তুষারকে দেখে থামল একটু, তারপর এগিয়ে গেল।

"দোস্ত," বলে তুষারকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে মশিউর, তার মুখ থেকে আর কোন কথা বেরুচ্ছে না।

পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছেন গিয়াস চৌধুরি।

"এই ছেলে," মশিউরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাকি কান্না কাঁদতে আসছো! হু। তোমাকে আমি দেখে নেবো।"

কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে বুঝতে একটু সময় লাগল মশিউরের। তুষার ভাবছিল কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে কে জানে। তবে মাথা গরম হলেও খুব শান্তভাবে গিয়াস চৌধুরির দিকে তাকাল মশিউর।

"আপনাকে না আজমল ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে বের করে দিয়েছিল?" মশিউর বলল, "আপনি ওর কোন ক্ষতি করেন নি তো আবার?"

"ফাজিল ছেলে," রাগে লাল হয়ে গেছেন গিয়াস চৌধুরি, এই বয়সেও শারীরিক কাঠামো শক্ত, যথেষ্ট শক্তি ধরেন শরীরে। আশংকা হচ্ছিল তুষারের, রাগের চোটে আবার না হাত তুলে বসেন।

"তোকে আমি দেখে নেবো," গিয়াস চৌধুরি বললেন, রাগের চোটে কখন তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছেন নিজেও জানেন না, "তোকে যদি জেলের ভাত না খাইয়েছি আমার নাম গিয়াস চৌধুরি না।"

"পারলে জেলের ভাত খাওয়ান," মশিউর বলল, "যান।"

"তুই বাসায় ঢুকতে পারবি না," গিয়াস চৌধুরি বললেন, "আজমলের মৃতদেহ দেখার অনুমতি নেই তোর, যা, সরে যা।"

"আপনি অনুমতি দেবার কে?" কোমরে হাত রেখে প্রশ্ন করে মশিউর।

ওর হাত ধরে গেটের কাছ থেকে, গিয়াস চৌধুরির কাছে থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেল তুষার, এই ধরনের শোকাবহ পরিস্থিতিতেও মানুষ কিভাবে ঝগড়া করতে পারে মাথায় আসছে না।

"মাথা ঠান্ডা কর তুই," ফিসফিসিয়ে বলল তুষার, "চল, আমিও তোর সাথে যাচ্ছি।"

"ঐ বুড়োর কথা শুনে চলে যাবো, কী বলছিস?" অবাক হয়ে বলল মশিউর।

"ঝামেলা করার দরকার কি? এমনিতেই এখানে সবার মানসিক অবস্থা ভালো না, এরমধ্যে হৈচৈ-এর কি দরকার।"

"কিন্তু, তাই বলে..." মশিউর বলল, কথা শেষ করতে পারল না, দূরে কাউকে দেখে চুপ করে গেল।

রুবেল আসছে। গাড়ি পার্ক করেছে। তুষারের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াল দূর থেকে।

"তুই আর রুবেল যা," মশিউর বলল, "আমি চলে যাচ্ছি।"

তুষার আর কিছু বলল না, মশিউর চলে যাচ্ছে। যাক, ওকে এখানে রাখলে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আজমলের মৃত্যুর সাথে মশিউর কোনভাবে জড়িত এটা সে বিশ্বাস করে না। তবে মনে হয় গিয়াস চৌধুরির ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ আছে মশিউরের উপর। সেই ঝালটা মেটাতে চাইছে। পুলিশ এখন সন্দেহভাজনদের খোঁজ করবে। গিয়াস চৌধুরি বদৌলতে মশিউরের নামটা যে প্রথমেই আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রুবেল এসে দাঁড়াল তুষারের পাশে, বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

"ওকে আমার সন্দেহ হয়," রুবেল বলল, চাপা গলায়, "শালা, এখন মায়াকান্না দেখাতে আসছে।"

"তুইও! এমন কি হয়েছিল যে মশিউরকে সন্দেহ হয়!" তুষার বলল, "বন্ধুদের মধ্যে সামান্য মনকষাকষি, এই তো!"

"তুই যা ভাবছিস তা না," রুবেল বলল, "স্কুলে থাকতে আমরা নিজেরা নিজেরা কতো মারামারি করেছি, সাথে সাথে ভুলে গেছি। কিন্তু বড় হওয়ার পর আমরা প্রত্যেকেই আলাদা মানুষ, আর মশিউর কাউকে কোনদিন ছাড় দেয়নি। আজমল যে অপমান করেছিল তার শোধ নিয়ে ছেড়েছে।"

"তুই কি তাহলে বলতে চাইছিস, আজমল, তোকে আর আমাকে মশিউরই হুমকি দিয়েছে? আমার সাথে তো ওর কিছু হয়নি।"

"হতে পারে, এটা আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা, ওর মাথায় যে কতো বুদ্ধি কিলবিল করে কোন ধারনাই নেই তোর, আবার..." একটু থামল রুবেল, "কাজটা আরিফেরও হতে পারে।"

"আরিফ এখানে এলো কোথা থেকে? একজন হুইল চেয়ারে বসা মানুষকে অন্তত সন্দেহ করা যায় না।"

"যায় দোস্ত," রুবেল বলল, "প্রতিহিংসা অনেক খারাপ জিনিস। আরিফ এখন

অনেক টাকার মালিক। হয়তো নিজে না করে অন্য কাউকে দিয়ে করাচ্ছে।"

উত্তর দিলো না তুষার, আরিফের সাথে দেখা করেই এই প্রশ্নটার উত্তর নেবে বলে ঠিক করল।

আজমলের লাশ আসে নি এখনো, পোস্টমর্টেম শেষে পুলিশের ভ্যানে করে যে কোন সময় চলে আসবে। গেটের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল দুজন, একপাশে সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রুবেল।

"দোস্ত," ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রুবেল বলল, "হিসেব মতো এরপর আমার পালা।"

রাস্তায় তখন পুলিশের অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানটা দেখা গেল। গেটের সামনে থেকে ভেতরে খবর নিয়ে গেল কেউ। একটু আগেও অস্বস্তিকর নিরবতা ছিল চারপাশে, অ্যাম্বুলেন্স আসার খবরে বাড়ির ভেতর থেকে আসা মহিলা কণ্ঠের আর্তনাদে কেঁপে উঠল চারপাশ।

মশিউর চলে যায়নি, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আজমলের বাড়িটার দিকে। তুষার আর রুবেলকে বাইরে দেখা যাচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে। বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বন্ধু দুজন তাকে নিয়ে বিশ্লেষন করছে সম্ভবত। কিছুটা মন খারাপ নিয়ে হাঁটতে থাকল। আজ নেশা করতে হবে, অনেক অনেক নেশা করে সব ভুলে যেতে হবে।

ভেবেছিল আজমলের মৃত্যুতে পুরানো সেই রাগটা চলে যাবে। অদ্ভুত ব্যাপার, সেই রাগ যায়নি। বরং রাগটা আরো বেড়ে উঠেছে, বুকের মধ্যে ফোঁস ফোঁস করে উঠছে অদৃশ্য এক কালো নাগ। যাকে শান্ত করার একটাই উপায়, নেশা।

অধ্যায় ১৫

দুই বছর আগে

মোফাজ্জল হোসেনকে অস্থিরতা রোগে ধরেছে। এই রোগটা বহুদিন পর ফিরে এলো। কোন কিছুতেই স্বস্তি আসছে না। বিশেষ করে ঐ উপন্যাসটার একটা গতি না করা পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না। পান্ডুলিপি পড়া শেষ, প্রুফ দেখা শেষ, সবচেয়ে দামি প্রচ্ছদ শিল্পীকে দিয়ে প্রচ্ছদও করা হয়েছে, উপন্যাসটা এখন শুধু প্রেসে যাবে। সবক'টা নামি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থাও করা আছে। একটা জিনিসের অপেক্ষা এখন। লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার। ফেইসবুকে এ ব্যাপারে চমৎকার স্ট্যাটাস দিয়েছিল, অনেকেই জানতে চেয়েছে নতুন এই লেখাটার ব্যাপারে। কিন্তু অদৃশ্য লেখকের সাড়া মেলেনি। এরকম তো কখনো হয় না যে লেখকের নাম ছাড়াই বই প্রকাশিত হয়েছে কোথাও। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, লেখকের নাম ছাড়া বই ছাপানোর কোন উপায় নেই।

এই অপেক্ষা করাতেই যতো সমস্যা, বিশেষ করে ফেইসবুকে স্ট্যাটাসটা দেয়ার পর থেকেই অস্থিরতা শুরু। প্রতিটা লাইক, প্রতিটা কমেন্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে এ কয়দিন, সেখানে অপরিচিত কিংবা এই উপন্যাস লিখেছে যে তার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। সব অচেনা নাম্বার থেকে আসা কল ধরেছে মোবাইলে। তাতে সেই লেখকের খোঁজ মেলেনি।

সন্ধার পরপর চেম্বারে বসে বিরক্ত মুখে তাকিয়েছিল কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে। চমৎকার একটা প্রচ্ছদের ছবি ভাসছে স্ক্রিনে। 'রক্তনীল সুখ' উপন্যাসের প্রচ্ছদ। টাকা বেশি নিলেও প্রচ্ছদশিল্পী মনোযোগ দিয়ে কাজ করেছে বোঝা যায়।

অস্থিরতা খুব খারাপ জিনিস, তবে আবার কম্পিউটারে বসা মাত্রই অস্থিরতা দূর হয়ে গেল, এতোক্ষন এই জিনিসটা খেয়াল করে নি বলে নিজেকেই গালি দিচ্ছিল মোফাজ্জল হোসেন। ফেইসবুকের ম্যাসেজে ইনবক্সের পাশে আদার ম্যাসেজ বলে একটা ফোল্ডার আছে, ওখানে একটা ম্যাসেজ জমা হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ক্লিক করলো।

অদ্ভুত একটা আইডি থেকে ম্যাসেজটা এসেছে, "অরি" নামক আইডিটার কোন প্রোফাইল ছবি নেই, মনে হচ্ছে এই ম্যাসেজটা দেয়ার জন্যই আইডিটা খোলা হয়েছে, বাংলায় লেখা ম্যাসেজটা পড়ল।

জনাব মোফাজ্জল হোসেন, আমার 'রক্তনীল সুখ' পড়ে আপনি তা ছাপাতে রাজি হয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ। দুটো বিষয় আপনার জানা প্রয়োজন, তাই এই চিঠি। প্রথমতঃ বইটি যদি সত্যিই ছাপানো হয়, তাহলে এই বইয়ের সমস্ত উপার্জন আমি একটি

এতিম খানায় দান করবো বলে মনস্থির করেছি, আশা করি আপনি এক্ষেত্রে কোন কারচুপির আশ্রয় নেবেন না, সময়মতো সেই এতিমখানার নাম আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ লেখকের নাম হিসেবে "অরি" নামটা ব্যবহার করবেন। বুঝতেই পারছেন নামটা ছদ্মনাম। এই নামের আড়ালের মানুষটাকে খোঁজ করতে যাবেন না কখনো। তাহলে সমস্যা হবে। এটাকে হুমকি হিসেবে ধরতে পারেন আবার নাও ধরতে পারেন। ইতি- অরি।

বইয়ের নাম "রক্তনীল সুখ", লেখকের নাম "অরি"। নাম হিসেবে দুটোই অদ্ভুত। তবে এই নামে কোন আপত্তি নেই মোফাজ্জল হোসেনের। ছদ্মনাম যা খুশি তাই দিতে পারে, এর অর্থ জানার প্রয়োজন নেই।

বুক থেকে একটা চাপ কমে গেছে, নাম পাওয়ায়, একই সাথে আরেকটা চাপ যোগ হয়েছে। বই বিক্রির টাকা লেখক নেবেন না, তা দিতে হবে কোন এক এতিম খানাকে। অবশ্য এরকম অদ্ভুত উপন্যাস যে লিখেছে, তার এরকম অদ্ভুত খেয়াল থাকতেই পারে।

কুদ্দুস এসে চা দিয়ে গেল।

"কুদ্দুস," হাঁক দিল মোফাজ্জল হোসেন, কোন একটা ভালো বই বের করার সময় অদ্ভুত একটা উৎসাহ আসে মনে, সব কিছু কেমন ভালো লাগতে থাকে, আজও তাই হচ্ছে।

"জি, স্যার।"

"সকালে লিটিল গ্রিন প্রেসের ম্যানজারকে খবর দিবা, বলবা নতুন বই আসবে, আমার সাথে যেন দুপুরের মধ্যে দেখা করে, পারবা না?"

"জি, স্যার।"

"ওকে," চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মোফাজ্জল হোসেন। এসির বাতাসটা সরাসরি মুখের উপর পড়ছে, অদ্ভুত শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে। টাকা-পয়সার লেনদেন প্রক্রিয়াটা তার কাছে সবসময়েই অস্বচ্ছ, একমাত্র একজন লেখককেই টাকা দেয় সে নিয়মিত, সেটাও যথেষ্ট পরিমানে লাভ করার পর এবং ভুল হিসেবে। তবে এই "অরি"র ক্ষেত্রে এই ঝামেলাটা করা যাবে না। যে লোকের মাথা খারাপ, তার টাকার হিসেবটা রাখতে হবে একদম ঝামেলামুক্ত।

উপন্যাসটার প্রচ্ছদে শুধুমাত্র "অরি" নামটা যোগ করা বাকি, তবে সেটা পরেও করা যাবে, আপাতত অস্বস্তি যেহেতু কেটেছে সে উপলক্ষে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয়া যাক।

অধ্যায় ১৬

বর্তমান

ক্রিস্টিনার সাথে খুব ভাব হয়ে গেছে সুমনার, একদম গলায় গলায় ভাব যাকে বলে। পশ্চিমা মেয়েদের মন হয় কঠিন, দয়ামায়াহীন, আচরন রুক্ষ আর খুব স্বার্থপর হয়, এরকম একটা ধারনা ছিল সবসময়। ক্রিস্টিনার সাথে গত কয়েকদিন কাটিয়ে সেই ধারনা ভুল প্রমানিত হয়েছে, এরচেয়ে বাঙ্গালি মেয়ে বিয়ে করলেই মনে হয় সমস্যা বেশি হতো। সমস্যা একটাই, ক্রিস্টিনা মা হতে পারে নি এখনো। কেন পারে নি বিস্তারিত জানে না সুমনা, জানতে চায়ও না, তাতে হয়তো মেয়েটা কষ্ট পেতে পারে। যে কয়দিন ঢাকায় আছে আনন্দে কাটিয়ে যাক এটুকুই চায়। বাবা-মা'ও তাদের বিদেশি বৌ'কে মেনে নিয়েছেন। হাসিমুখে কথা বলছেন, বিশেষ করে বাবা বিদেশি বৌয়ের মুখ ভুলভাল বাংলা শুনে খুব মজা পাচ্ছেন।

তুষার বিদেশ থেকে আসার পর বাপের বাড়িতেই আস্তানা গেড়েছে সুমনা, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি অনেক আগেই মারা গেছেন, উত্তরায় তার স্বামি জুনায়েদের ডুপ্লেক্স বাড়ি। সেই বাড়ি এখন ফাঁকা, জুনায়েদ বিদেশ গিয়েছে ব্যবসার কাজে, ও না আসা পর্যন্ত শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে বিদায় জানিয়ে, ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে তুষার ঢাকায় থাকা পর্যন্ত এই বাড়িতেই থাকার প্ল্যান।

ক্রিস্টিনাকে নিয়ে বসুন্ধরা সিটি, চাঁদনি চক, গুলশান-১ আর ২ এর সব মার্কেট ঘোরা শেষ, কেনাকাটাও হয়েছে যথেষ্ট, তবে তাতে মন ভরেনি। এবার ঢাকার বিশেষ বিশেষ জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করেছে সুমনা, সমস্যা হচ্ছে তুষারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকায় নামার পর থেকেই নানা কাজে ব্যস্ত, কাজ বলতে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করাই বড় কাজ, এছাড়া আর কোন কাজ তুষারের থাকার কথা নয়। গত কয়েকদিনে তুষারের বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বাসায় এসেছে, এরা সবাই তাকে ছোট থেকেই চেনে, স্নেহ করে। তবে স্নেহের বাইরেও দু'একজনের চোখে অন্য দৃষ্টি দেখতে পেয়েছে। বিশেষ করে গতকাল আসা মশিউর ভাই-এর কথাই বলা যাক। এই ভাইটা সময়-অসময়ে চলে আসতো এই বাসায়, তুষারের সাথে দেখা করার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত তুষার বাড়ি নেই, খবরটা মাঝে মাঝে সুমনাকেই দিতে হতো। অনেক বছর আগের কথা, তবু তখন কথা বলার ফাঁকে মশিউর ভাইয়ের দৃষ্টি চিনতে সমস্যা হয়নি সুমনার। এই মানুষটা তাকে পছন্দ করে এবং কোনদিন তা বলতে পারবে না, এই ধারনা হয়েছিল তখনই এবং ভবিষ্যতে দেখা গেল ধারনাটা একদম ঠিক। তুষার একসময় বিদেশে পাড়ি জমাল, তারপর থেকে মশিউরের আসা বন্ধ হল। তবে সেই অল্প বয়সে মানুষটাকে খারাপ লাগে নি, বরং মনে হয়েছে বোকা-

সোকা ধরনের এবং প্রচন্ড আবেগি একটা মানুষ যে ঝোঁকের মাথায় যে কোন কিছু করে বসতে পারে।

মশিউর ছাড়াও আরো একজন ছিল এই দলের, সেই বান্দা অবশ্য তুষারের স্কুল ফ্রেন্ড ছিল না, ছিল ইউনিভার্সিটির বন্ধু। তুষারের সাথে ছিল মানিক-জোড় সম্পর্ক, ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকতো ড্রইং রুমে, তুষারের সাথে গল্প করতো, মাঝে মাঝে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তায় বিষয়বস্তু শোনার চেষ্টা করতো সুমনা। পড়াশোনা থেকে শুরু করে খেলাধূলা, বিজ্ঞান কোন কিছুই বাদ যেতো না ওদের কথাবার্তা থেকে। মাঝে মাঝে ঘর ফাটিয়ে হাসির শব্দ আসতো, এই হাসি খুব ভালো করে চিনে ফেলেছিল সে, আরিফের হাসি। দুই বন্ধুর মধ্যে বাইরে মধুর সম্পর্ক থাকলেও একটা জায়গায় দুজন ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি। সেই বিষয়টা হচ্ছে পড়াশোনা, আরিফ গ্রাম থেকে উঠে আসা স্বত্তেও বাইরের পৃথিবীর জ্ঞান রাখতো, স্কুলে-কলেজে কোথাও দ্বিতীয় হয়নি, ইউনিভার্সিটিতেও রেজাল্ট খুব ভালো, একদম প্রথম দিকে, পাশ করে বেরুনোর পর স্কলারশীপে বিদেশে যাওয়া ছিল নিশ্চিত, তুষারের ক্ষেত্রেও তাই। দুই তুখোড় ছাত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের পাশাপাশি তাই একটা প্রতিযোগিতাও ছিল। সেই প্রতিযোগিতাটা ছিল সুস্থ প্রতিযোগিতা, তুষারের মুখে আরিফকে নিয়ে কোনদিন বাজে কথা শোনে নি কেউ।

এরমধ্যে কখনো সখনো টুকটাক কথা হতো আরিফের সাথে। প্রথমে কেমন আছো, ভালো আছি টাইপের কথাবার্তা দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে আরিফের প্রতি দূবলতা অনুভব করতে শুরু করল সুমনা। সেসব দিনের কথা ভাবলে এখনো কেমন আড়ষ্ট অনুভব করে। একদম বোকা ধরনের মেয়ে ছিল সে, আরিফের সামনে গেলেই বুকটা কেমন ধুকধুক করে উঠতো, মনে হতো, উল্টাপাল্টা কিছু না বলে ফেলে আবার, তবে আরিফ কি ভাবছে তা বোঝা যেতো না। ওর মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা খুব কঠিন। ইশারায় অনেক কিছুই বোঝাতে চেয়েছিল সুমনা, আরিফ হয়তো অনেক কিছু বুঝেছিলও, কিন্তু প্রকাশ করে নি কোনদিন। তারপর, একদিন সব লজ্জা ভেঙে গেল হঠাৎ করে, মনের কথা বলেছিল আরিফ।

দিনটার কথা এখনো পরিস্কার মনে আছে। ভার্সিটির ক্লাস শেষে রিক্সার জন্য দাঁড়িয়েছিল সুমনা, তখন আরিফ এলো। বিকেল বেলা। সুমনাকে রিক্সা ঠিক করে দিয়ে কি মনে করে আরিফও চেপে বসল রিক্সায়। সে কোথাও যাবে, মাঝপথে নেমে পড়বে। ব্যাপারটা সত্যি ছিল না, পরে জেনেছিল সুমনা।

দৃশ্যটা সারাজীবন মনে থাকবে, শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছিল হঠাৎ করেই, চারপাশ অন্ধকার হয়ে অনেক দূরে কোথাও যখন বাজ পড়ল, আরিফের ডান হাতটা চেপে ধরেছিল নিজের অজান্তেই, আরিফ তাকিয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে গভীর ভালোবাসা দেখেছিল সেদিন।

"সুমনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি," ঠিক এই চারটি কথাই বলেছিল আরিফ।

তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, শাহবাগ মোড়ে রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়েছিল আরিফ। এরমধ্যে আর কোন কথা হয়নি, কোন উত্তরও চায়নি। উত্তর হয়তো পেয়ে গিয়েছিল। কারন কথাগুলো শোনার পরও আরিফের হাত ছাড়েনি সুমনা, বরং আরো শক্ত করে চেপে ধরেছিল।

হুডখোলা অবস্থায় এরপর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরেছিল সেদিন সুমনা। তেমন অদ্ভুত ঘোরলাগা দিন আর কখনো আসে নি জীবনে, আসবেও না।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে একটা বই হাতে তুলে নিলো সুমনা, এই বইগুলোই তার সম্বল। আরিফ একেকটা উপন্যাস লেখে আর সে উপন্যাসের পাতায় পাতায় নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে নিজেকে খুঁজে পায়, মাঝে মাঝে পায় না। এই করে করেই হয়তো বাকিটা জীবন চলে যাবে।

"সুমনা," পাশ থেকে ডাকল ক্রিস্টিনা, "আজ মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সুমনা, সত্যিই আকাশ কালো হয়ে এসেছে, তবে সেদিনের মতো নয়।

"ভাবী, বৃষ্টিতে ভিজবে," সুমনা উঠে দাঁড়ায়, বহুদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না।

"ঠান্ডা লেগে যাবে যে," ক্রিস্টিনা বলল, তার চোখে-মুখে দ্বিধা, সুমনা একটু বললেই রাজি হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

সুমনা কিছু বলল না, ক্রিস্টিনার হাত ধরে টানতে টানতে উঠোনে চলে এলো। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

* * *

সন্ধ্যার আগে আগে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট চলে এলো হাতে। রিপোর্টে মৃত্যুর কারন হিসেবে বুলেটের কথা বলা আছে, একদম কপালের মধ্যবিন্দুতে আঘাত করে খুলির পেছনের অংশে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি করেছিল বুলেটটা, স্পটডেড। যেই করে থাকুক, পাকা নিশানাবাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই, একটা মাত্র বুলেট, আরো কিছু করতে হয়নি খুনিকে। এছাড়া মৃতব্যক্তির পাকস্থলিতে যথেষ্ট পরিমান অ্যালকোহল ছিল, ভদ্রলোক নেশাগ্রস্ত ছিলেন, নিজের হাতে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য স্থির রাখতে পারেননি। ভদ্রলোকের রিভলবারটা পুলিশ হেফাজতে আছে। রিভলবারটা লাইসেন্স করা, ওটার লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মৃত ব্যক্তির দুই পায়ের পাতা কেটে ফেলা, চাপাতি ধরনের অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে, পেশাদার হাতের কাজ, কাটা অংশগুলোকে সেখানেই রেখে গেছে খুনি, এই ব্যাপারটাই চিন্তার, কারো জন্য এটা একটা বার্তা, সেই বার্তাটা কি খুঁজে বের করতে হবে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের সাথে মৃত ব্যক্তির বেশ কিছু ছবিও দেয়া আছে, ছবিগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল শাহরিয়ার। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের

মধ্যে একজন এই আজমল চৌধুরি, বাবার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গত কয়েকবছরে ব্যবসা শুধু বাড়িয়েছেন, রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে কম্পিউটার, গার্মেন্টস এক্সপোর্ট, এগ্রো-ফুড কিছুই বাকি নেই, এই ধরনের মানুষের শত্রুর অভাব থাকার কথা নয়। খুন করার মোটিভ অনেক কিছুই হতে পারে, ব্যবসায়িক স্বার্থে কেউ খুন করাতে পারে, কিংবা রাজনৈতিক কোন ব্যাপারও হতে পারে।

ব্যবসায়ীদের অনেকেই এখন রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন, ভদ্রলোকের রাজনীতিতে যোগ দেয়া হয়তো কারো পছন্দ হয়নি। এছাড়া পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত কোন ঝামেলাও থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত তেমন কোন মোটিভ সামনে আসে নি, ছিনতাই ঠেকাতে গিয়ে কারো হাতে খুন হয়েছেন আজমল চৌধুরি এই ব্যাপারটা একেবারেই ধোপে টেকে না। এর পেছনে বড় কোন রহস্য রয়েছে।

আবু জামশেদের রুম থেকে রিপোর্টটা পাঠানো হয়েছে কিছুক্ষন আগে। রিপোর্ট দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। আগামিকাল আজমল চৌধুরির জানাজা হবে। সেখানে যেতে হবে, এছাড়া আবু জামশেদ বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে, সেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে। ঐ এলাকায় কোন কোন মোবাইল চালু ছিল এই তথ্যটা জোগাড় করার জন্য এরমধ্যে টেলিকম কোম্পানিগুলোর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। যে কোন সময় তথ্য চলে আসবে। আজমল চৌধুরি কোন বারে যেত, কাদের সাথে সময় কাটাত, এই তথ্যগুলো এখন বের করতে হবে। সাথে সেই মেয়েটাকেও খুঁজে বের করতে হবে, যে ঐ রাতে আজমল চৌধুরির সাথে ছিল।

টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল এই সময়।

"শাহরিয়ার, তুমি বের হচ্ছো কখন?"

"স্যার, এখনই বের হচ্ছি," শাহরিয়ার বলল, "আপনি যে তথ্যগুলো চেয়েছেন সেগুলো কালেক্ট করতে।"

"ওকে," আবু জামশেদ বলল, "একটা গাড়ি নিয়ে যাও, আমি বলে দিচ্ছি।"

অফিসে চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করার জন্য কয়েকটা গাড়ি আছে, তারমধ্যে একটা নিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল শাহরিয়ার। গন্তব্য আজমল চৌধুরির বাড়ি। জানে, ওখানকার সবাই এখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, তবে প্রাথমিক তথ্যগুলো সেখান থেকেই নিতে হবে।

গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে বসল শাহরিয়ার। ক্লান্ত লাগছিল, সেই সকালে বের হয়েছে, তারপর সারাদিন অফিস, কাজ, ঘোরাঘুরি, এখন আবার বাইরে যেতে হচ্ছে। রুমে ফিরে ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক রাত হবে, তারচেয়ে বরং পথেই কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়া যায়। উত্তরা এখান থেকে অনেকদূর। ড্রাইভার আজমল চৌধুরির বাড়িটা চেনে, কাজেই নিশ্চিন্তে চোখ বুজল শাহরিয়ার। এফএম রেডিওতে চমৎকার একটা রবীন্দ্র সঙ্গিত বাজছে।

অধ্যায় ১৭

আজমলের খুনের খবর সবগুলো পত্রিকায় এসেছে বড় করে, আইন রক্ষাকারী বাহিনি এখনো কাউকে ধরতে পারে নি, বলা হচ্ছে তাদের কাছে সূত্র আছে, অপরাধি খুব শিগগিরি ধরা পড়বে। খবরটা পড়ে একটু বিচলিত বোধ করল আরিফ। এমন নয় যে আজমল তার খুব প্রিয় বন্ধুদের একজন, বরং আজমলের কথা মনে হলেও গা'টা কেমন শিরশির করে উঠে। অদ্ভুত, বিপরীতমুখী একজন মানুষ ছিল এই আজমল, কখনো দিলখোলা, ভালো বন্ধু, কখনো অহংকারী, দূর্বিনত ধনী মানুষের বখে যাওয়া সন্তান। কখন কি মনে হলে কী করে বসবে তার কোন ঠিক ছিল না। মাঝে মাঝে মানুষকে মানুষ মনে করতো না, আবার অনেক সময় খুব দরিদ্র কাউকেও কাছে টেনে নিতো। এই ধরনের ধনী লোকের সন্তান বন্ধুদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাবে, সেটা খুব স্বাভাবিক কথা। বাকিরা সহ্য করলেও আরিফের সহ্য হতো না মোটেও, সে কথা বলতেও দ্বিধা করে নি কোনদিন এবং তাতে আজমলের চক্ষুশূলে পরিনত হয়েছিল একসময়।

আজমলের সাথে শেষ দেখা অনেক দিন আগে, সেই স্মৃতি মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আরিফ, পারে না, ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায়। সকালে খবরের কাগজটা পড়ে চুপচাপ চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। সুন্দর সকাল, তার এই ছোট বাড়িটায় পৃথিবীর কোন দুঃখ, কষ্ট নাক গলাতে আসে না। এখানে সে একদম স্বাধীন, নিরাপদ।

তাহের এগিয়ে এলো, হাতে সিগারেটের প্যাকেট। ছেলেটা জানে, কখন কী প্রয়োজন তার। সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিয়ে লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর চলে গেল নিঃশব্দে, যেমন এসেছিল। হাতে নিজের লেখা একটা বই নিয়ে সকালের রোদে পড়তে বসেছে আরিফ। মাঝে মাঝে নিজের লেখা পড়া যায়, তাতে বিরক্তি আসলেও সমস্যা নেই। নিজের ভুলগুলো ঠিক করে নেয়ার এটাই উপায়। ছাপার অক্ষরে একটা গল্প ছাপা হয়ে গেলে সেটা আর বদলানো যায় না, তবে মনে মনে কল্পনা করতে তো আর বাঁধা নেই। গল্পগুলো পড়তে পড়তে বিকল্প সব চিন্তা মাথায় আসে, মনে হয় এভাবে না লিখে এভাবে লিখলেও হতো। উপন্যাস লিখতে লিখতে হাত পাকানো শেষ, তারপরও পরিপূর্ন আত্মবিশ্বাস যাকে বলে তা এখনো আসে নি, আসবেও না কোনদিন।

বইটা কোলের উপর ভাজ করে রেখে চোখ বন্ধ করলো আরিফ। ভয়াল সেই রাতের স্মৃতি এখন অনেক ঝাপসা, তবে অনুভূতিটা বাস্তব। এখনো সেই চিৎকার, কান্না, ব্যথা অনুভব করে সে।

তাহের ভেতরের রুমে গিয়েছিল, আবার এসেছে। গেটে কেউ এসেছে,

কলিংবেলে চাপ দিচ্ছে ঘনঘন। ইশারা করলো আরিফ, ভেতরে চলে যাওয়ার জন্য। দরজা সে নিজে খুলবে, জানে কে এসেছে, বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলো। বইটা সরিয়ে রাখল একপাশে। অনেক অনেকদিন পর মুখোমুখি হচ্ছে দুজন, কোন রাগ-ক্রোধ, ঘৃনা কিছুই অনুভব করছে না আরিফ, মনে হচ্ছে বুকের ভেতরটা একদম ফাঁকা। এই ফাঁকা অনুভবটাই অর্জন করেছে সে গত চৌদ্দ বছরে।

ছোট ড্রয়িংরুম, ছিমছাম। কোথাও কোন বাহুল্য নেই। অল্প আসবাব-পত্র, একটা টিভি, দেয়াল ঘড়ি। সোফায় বসে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে তুষার। আরিফ হাতে সিগারেট নিয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে তুষারের দিকে, তবে সেই দৃষ্টিটা কেমন অন্যরকম, কোন প্রান নেই, দীর্ঘক্ষন ধরে রাখায় সিগারেটের মাথায় লম্বা ছাই জমেছে, যেকোন সময় টুপ করে পড়বে।

"কেমন আছিস?" জিজ্ঞেস করল তুষার।

উত্তর দিল না আরিফ, হুইল চেয়ার নিয়ে ড্রয়িংরুমের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় একটু ঘুরল। উত্তরের অপেক্ষায় উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুষার, সে দৃষ্টিতে সম্পূর্ন উপেক্ষা করে।

সিগারেটটা ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর হুইল চেয়ারের চাকা চালাল ওটার উপর দিয়ে, বেশ কিছুক্ষন ধরে, সময় নিয়ে।

তুষারের মুখের দিকে তাকাল আড়চোখে, রক্তশুন্য, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখটা এক সেকেন্ডেই।

"তোর সাথে আমার কিছু কথা ছিল," আবার বলল তুষার, "তুই তো জানিস সম্ভবত, অনেক দিন পর দেশে ফিরেছি।"

এবারও এসব কথার কোন উত্তর দিলো না আরিফ। যেন শুনতেই পায় নি, গুন গুন করে একটা গানের সুর তুলল।

"আমি জানি, তুই আমার উপর রেগে আছিস, রেগে থাকার কারনও আছে," তুষার বলল, "আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইতেই এসেছি।"

"ক্ষমা!" চেঁচিয়ে উঠল আরিফ, হুইল চেয়ারের হাতলে চাপ দিয়ে দ্রুত চলে এলো তুষারের সামনে। একদম মুখোমুখি এখন দুজন। আরিফের একহাতে ছোট একটা জিনিস দেখতে পেল তুষার। এতোক্ষন হাতের মুঠোয় ছিল, দেখতে পায়নি।

চকচকে ধারাল একটা ক্ষুর।

ক্ষুরটা তুষারের গলায় চেপে ধরল আরিফ। অল্প একটু কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে, তবে চিৎকার করল না তুষার, গলাটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরল। ক্ষুর সরিয়ে নিয়েছে আরিফ। চোখে বন্য হিংস্রতা, কোনমতে নিজেকে দমন করেছে।

"যন্ত্রনা বুঝিস? যন্ত্রনা! এরচেয়ে লক্ষকোটিগুন বেশি যন্ত্রনা পেয়েছি আমি," চেঁচাল আরিফ, "তোকে এই বাড়ির উঠোনে পুঁতে রাখলেও কেউ টের পাবে না। আমি বিখ্যাত লেখক মানুষ, কে সন্দেহ করবে আমাকে।"

ডান হাতটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। প্যান্টের পকেট থেকে অন্য হাত দিয়ে সাদা একটা রুমাল বের করল। সেটাই চেপে ধরল। খুব যন্ত্রনা হচ্ছে। তবে তাতে কোন ক্ষোভ নেই তুষারের। এভাবে মরেও যদি প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তবে তাতেই শান্তি।

"তাহলে আর দেরি করছিস কেন? মেরে ফেল আমাকে?" তুষার বলল।

"এতো সহজ মৃত্যু হলে হবে?" মুখ বাঁকাল আরিফ, "তোর প্রিয় বন্ধু আজমল তো সহজেই মরে গেল।"

"আজমলকে কী তুই-ই মেরেছিস?" তুষার বলল।

ঘর কাঁপিয়ে হাসল আরিফ।

"আমি একজন পঙ্গু লেখক, হুইল চেয়ারে চলাফেরা করি," বলল, "তারপরও আমাকে নিয়ে দেখি তোদের অনেক সন্দেহ!"

"ভাড়াটে খুনি জোগাড় করা কঠিন কিছু না। আমাদের চারজনকে হুমকি দিয়েছে কেউ," তুষার বলল, "একমাত্র তুই বাকি!"

"কিসের হুমকি? কবে দিয়েছে?"

"ফোনে হুমকি দিয়েছে, সাতদিন সময় দিয়েছে, আমরা যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করি, তাহলে এক এক করে আমাদের চারজনকে মারবে।"

"আইডিয়াটা তো চমৎকার," হাসল আরিফ, "চমৎকার একটা গল্প হয়ে যাবে অনায়াসে। আমি লিখে ফেলি, কি বলিস?"

"আজমল খুন হয়েছে, এবার বাকিদের পালা।"

"তুই কী আমার কাছে এসেছিস আজমলের খুনের স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্য?" আরিফ বলল, "কখনো শুনেছিস এরকম ক্ষেত্রে খুনি সেধে সেধে স্বীকার করে যে সেই খুন করেছে।"

"না, সেজন্য আসি নি," তুষার বলল, "কিন্তু কেন জানি মনে হয় এর সাথে তোর কোন যোগসূত্র আছে।"

"থাকতেও পারে," রহস্যময় হাসি হেসে বলল আরিফ, "আবার নাও থাকতে পারে। এক কাজ কর না, পুলিশকে বলে দে, তাহলেই তো ঝামেলা মিটে গেল।"

"তুই কী কোনভাবে যুক্ত? আমি তোর কাছে এসেছি, কষ্ট করে মারার দরকার নেই। এখানেই মেরে ফেল। তোর ক্ষুরটার ব্যবহার তো হয়নি ঠিকমতো," তুষার বলল।

"তুই যেখান থেকে এসেছিস, চলে যা," আরিফ বলল, "তোর সাথে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।"

উঠে দাঁড়াল তুষার, এখানে এসে কোন লাভ হয়নি, যে রাগ আর ঘৃনা পুষে রেখেছে আরিফ, তা কোনদিনই সম্ভবত মিটবে না।

"এভাবে প্রতিশোধ হয় না, আরিফ," তুষার বলল।

"প্রতিশোধ নেবো! তোদের উপর!" হাসল আরিফ, "এতো সময় নেই আমার।

সময়ের অনেক দাম। বাজারে খোঁজ নিলেই জানতে পারবি।"

"যাক, এসেছিলাম, যা বলার বলেছি, বাকিটা তোর ইচ্ছা," তুষার বলল।

"গুড বাই," বলল আরিফ, হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল, বেডরুমের দিকে যাচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে হঠাৎ করেই। শুধু মনে পড়ছে, অচেনা একটা নাম্বার থেকে বেশ কয়েকবার ফোন এসেছিল, লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকার কারনে কলটা রিসিভ করা হয়নি। চারজনকে হুমকি দেয়া হয়েছে, সে কি তাহলে পঞ্চম জন! আর কিছু চিন্তা করতে চাইল না আরিফ, মাথা ব্যথা করছে, এখন একটু শোয়া দরকার।

'প্রতিশোধ' শব্দটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একমাত্র প্রতিশোধই পারে তার মনটাকে একটু শান্ত করতে।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে এলো তুষার, পুরো বাড়িটা একনজর দেখল। ছিমছাম, সুন্দর, গোছান একটা জায়গা, এখানে বাস করে তার অনেক কাল আগের ভুলে যাওয়া এক বন্ধু, বাকি জীবনে যার সাথে কখনোই আর স্বাভাবিক সম্পর্ক হবে না।

গেট খোলাই ছিল, বাইরে রাস্তার উপর গাড়ি পার্কিং করা ছিল। চড়া রোদ উঠেছে, পকেট থেকে সানগ্লাস বের করে নিল তুষার।

আজমলের পর কার পালা? সত্যিই কী সেটা রুবেলের না তার? নাকি মশিউরের? আরিফের আচরন দেখে মনে হচ্ছিল ওদের চারজনকেই প্রচন্ড ঘৃনা করে, কিন্তু তাই বলে মেরে ফেলবে না অন্তত। তাহলে আজ তুষারের গলায় যখন ক্ষুর বসিয়েছিল তখনই তা করতে পারতো। কেউ জানে না, তুষার এখানে এসেছিল। আর এই নির্জন এলাকায় একটা লাশের গতি করা খুব কঠিন কিছু না।

তাহলে কী মশিউর জড়িত!

গাড়ি স্টার্ট দিল তুষার। চমকে গেল সাথে সাথে।

ছোট একটা চিরকূট রাখা ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে। চিরকূটটা খুলল, লাল কালিতে একটা কথাই লেখা।

ইউ আর লিভিং ডেঞ্জারাসলি!

আশপাশে তাকাল তুষার। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই।

অধ্যায় ১৮

আজমলের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা সম্ভবত অসীম, ধারনা করল শাহরিয়ার। ব্যবসা, রাজনীতিতে ঢোকার পায়তারা করতে গিয়ে লোকটার মেলামেশার গন্ডি ছিল অনেক বড়। জানাজায় অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল, অনেকের সাথে কথা বলেছে, এরমধ্যে বিশেষ একজনকে খুঁজে পেয়েছে সে। এই লোকটা ছিল আজমলের যোগানদার, মদ, মেয়েমানুষ, ব্যবসা, সব কিছুর খোঁজ নেয়ার জন্য আজমলের ডানহাত ছিল বলা যায়। সবাই আজমলের খোঁজখবর নেয়ার জন্য এই লোকটার নামই বলেছে।

ভদ্রলোকের নাম জানে আলম, পরনে লম্বা কলারওয়ালা সবুজ রঙা শার্ট, শার্টে ঢাকনাওয়ালা দুটো ছোট পকেট আছে, চুল একপাশে সিঁথি করা, লম্বা গোঁফ, পরনে সম্ভবত বেলবটম প্যান্ট, ধারনা করল শাহরিয়ার, দেখলে মনে হয় সত্তর দশকের কোন সিনেমা থেকে বের হয়ে এসেছে। দিনে-দুপুরে মদ খেয়ে চোখ লাল করে বসে আছে চেম্বারে। চেম্বারের সামনে লেখা দেখে বোঝা গেল পেশায় ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার, তবে সে ধরনের কাজকর্ম কিছু করে বলে মনে হচ্ছে না। অফিসটা পুরানো ধরনের, ছোট একটা রুমকে দু'ভাগ করা হয়েছে, মাথার উপর বিজবিজ করে চলছে অনেক পুরানো একটা এসি, একপাশে ছোট একটা ফ্রিজার, সেখানে কী রাখা হয় ধারনা করতে পারছে শাহরিয়ার। অন্যপাশে ক্যাবিনেটের উপর ছোট একটা টেলিভিশন রাখা, সেখানে পুরানো ক্রিকেট ম্যাচের হাইলাইটস দেখানো হচ্ছে। শাহরিয়ারকে বসিয়ে রেখে গভীর মনোযোগে সুনীল গাভাস্কারের ঠোকাঠুকি দেখছে জানে আলম।

আরো প্রায় পনেরো মিনিট একটানা টিভি মনিটর থেকে চোখ সরাল না ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার। এরমধ্যে এক কাপ চা খেয়েছে শাহরিয়ার, সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছিল জানে আলম, সেখান থেকে একটা ধরিয়েছে, একটু ইতস্ততবোধ করছিল, বদ্ধ রুমে সিগারেটের ধোঁয়া জমে যাওয়ার কথা, তারপরও ধরিয়েছে, এই লোকটাও সম্ভবত তাই করে। সিগারেটও শেষ হয়েছে কিছুক্ষন হলো।

হাইলাইটস দেখানো শেষ হলে রিমোট দিয়ে টিভিটা বন্ধ করে শাহরিয়ারের দিকে তাকাল জানে আলম।

"স্যরি," দাঁত কেলিয়ে হাসল জানে আলম, "পুরানো এই ক্লাসিক ম্যাচগুলো! অদ্ভুত! দেখলেন তো সুনীল গাভাস্কারের সুইপ শট।"

মাথা নাড়াল শাহরিয়ার, দেখেছে, কিন্তু গাভাস্কারের সুইপ শট দেখার জন্য সে এখানে আসেনি। "তারপর বলুন, কি তথ্য লাগবে আপনার?"

"আজমল চৌধুরি আপনার খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন বলে জানি," শাহরিয়ার বলল, "উনার সম্পর্কে দরকারি কিছু ইনফরমেশন লাগবে।"

"যেমন?"

"ঘটনার দিন রাতে তিনি মাতাল ছিলেন, কোন বারে গিয়েছিলেন বলে আপনার ধারনা?"

"ধারনার কিছু নেই," গম্ভির হয়ে বলল জানে আলম, "আমি ওর সাথেই ছিলাম।"

"তাই? কয়টা পর্যন্তছিলেন? আর কে ছিল সাথে?"

"বারোটা পর্যন্ত, এরপর আমি চলে আসি," জানে আলম বলল, মার্লবোরোর প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরাল, "আমি চলে আসার সময় ও একাই ছিল।"

"একা ছিলেন? উনি বাসায় ফিরলেন না কেন?"

হাসল জানে আলম।

"ভাই, ও আমার বন্ধু ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু ধনী বন্ধুদের সবকথা জিজ্ঞেস করতে নেই," জানে আলম বলল, "তাতে তারা মাইন্ড করে, বুঝছেন।"

"উনার সাথে একটা মেয়ে ছিল ঘটনার রাতে, আপনি জানেন মেয়েটা কে?"

"আমি জানবো কি করে? আমি তো আগেই চলে এসেছি, তাই না?"

"বারের নাম কি?"

"গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল।"

"আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন," শাহরিয়ার বলল, "আপনি তো খুব কাছের বন্ধু ছিলেন, উনার কার কার সাথে শত্রুতা ছিল বলে আপনার ধারনা?"

"ওর তো শত্রুর অভাব নেই," ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল জানে আলম, "সবাই ওর শত্রু, কেবল আমি ছাড়া।"

"বুঝলাম না, একটু ক্লিয়ার করে বলুন," শাহরিয়ার বলল।

"ও কাউকে পাত্তা দিতো না, কারো মন জুগিয়ে কথা বলতো না," জানে আলম বলল, "মুখের উপর যা তা বলে দিতো, এতে কেউ মন খারাপ করল, না কি হলো তাতে ওর থোরাই কেয়ার।"

"তাহলে আপনার সাথেই নিশ্চয়ই ওরকম হয়েছে, তাই না?"

"হা হা, ভালো কথা বলেছেন," জানে আলম বলল, "ওর অপমানগুলো আমি এক কান দিয়ে ঢুকাতাম আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিতাম। তাই আমার সমস্যা হয়নি।"

সমস্যা হয়নি দেখে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করছে জানে আলম, ভাবল শাহরিয়ার, এই লোকটা ভন্ড আর ভন্ডদের কোন আত্মসম্মান থাকে না।

"তবে, মশিউরকে যে অপমানটা করল, সেটা আমার সাথে করলে আমি ওকে

ছেড়ে দিতাম না," যোগ করল জানে আলম।

"মশিউর কে?"

"মশিউর, আজমলের স্কুল ফ্রেন্ড," জানে আলম বলল, "জান-পরানের দোস্ত।"

"ওনার সাথে কি হয়েছিল? ঘটনাটা যদি একটু খুলে বলেন," শাহরিয়ার বলল।

"ঘটনা আর কী! বড়লোক বন্ধুর টাকা মেরে চলতো, আজমল একবার টের পেল, তারপর সবার সামনে ওকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।"

"সেটা কবেকার ঘটনা?"

"মনে নেই, চার-পাঁচ বছর তো হবেই।"

"উনার ঠিকানা জানেন? মোবাইল নাম্বার?"

"না, ঐ শালা নেশাখোর," জানে আলম বলল, "ওর সাথে আমার যোগাযোগ নেই।"

মনে মনে হাসল শাহরিয়ার, মদে চুর হয়ে বসে আরেকজনকে নেশাখোর বলে গাল দিচ্ছে, অদ্ভুত!

"শুধু নাম দিয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না," শাহরিয়ার বলল, "আমার আরেকটু ডিটেইলস লাগবে।"

"ভাই, আমি এসবের মধ্যে নাই," জানে আলম বলল, "এখন বাইরে যাবো, পরে কথা হবে।"

"আপনি ঘটনার রাতে আজমল সাহেবের সাথে ছিলেন," শাহরিয়ার বলল, বুঝতে পারছে জানে আলম তাকে কাটাতে চাইছে, "আমি একটা ইন্টারোগেশনের ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে সব তথ্য আপনি আমাকে সুরসুর করে দিয়ে দেন।"

"হুমকি দিচ্ছেন?" চোখ সরু করে বলল জানে আলম।

"জি, হুমকি দিচ্ছি," শাহরিয়ার বলল। তার কণ্ঠস্বর একদম স্বাভাবিক, যেন প্রতিদিন হুমকি দিয়ে বেড়ানোই তার আসল কাজ।

কিছু একটা ভাবল জানে আলম, টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট একটা ডায়রি বের করে আনল। ডায়রিটা অনেক পুরানো, অন্তত দশ বছরের কম হবে না বয়স। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় থামল জানে আলম।

"এই নাম্বারটা লিখে নিতে পারেন," একটা নাম্বার বলল জানে আলম, নাম্বারটা মোবাইল ফোনে তুলে নিল শাহরিয়ার, "তবে এখনো এই নাম্বারটা খোলা আছে কি না জানি না। আমার সাথে বিশেষ বনিবনা নেই মশিউরের।"

"এই জন্যই কি বেচারাকে ফাঁসিয়ে দিতে চাচ্ছেন?"

"আপনি ভাই অনেক বেঁকা কথা বলেন," জানে আলম বলল, "চাইলে আজমলের চাচার সাথে কথা বলতে পারেন, উনিও সব জানেন।"

"উনার চাচার নাম কি?"

"গিয়াস চৌধুরি।"

উঠে পড়ল শাহরিয়ার, এখানে কাজ শেষ হয়েছে। শাহরিয়ারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জানে আলম যেন শান্তি পেল, হাত মেলাল শাহরিয়ারের সাথে।

"যখন যা লাগবে জানাবেন," জানে আলম বলল, "এই বান্দা আপনার খেদমতে হাজির।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার, খুব ইচ্ছে ছিল জানে আলম বেলবটম প্যান্ট পরেছে কি না দেখবে, তবে লোকটা নিজের চেয়ারে আরো আরাম করে বসেছে, দেখার উপায় নেই।

বাইরে কড়া রোদ উঠেছে, অফিসের মাইক্রোবাসটা বিল্ডিংয়ের নীচে পার্কিং করা, গাড়িতে উঠে আবু জামশেদের নাম্বারে কল করল শাহরিয়ার, উনাকে জানিয়ে রাখা ভালো কী করছে, কোথায় যাচ্ছে। উনি কল রিসিভ করলেন না, সম্ভবত ব্যস্ত।

এবার মশিউরের সাথে কথা বলতে হবে। মোবাইল ফোনে নাম্বারটা সেভ করা হয়েছে, ডায়াল করল।

অধ্যায় ১৯

কাজে মন বসছে না রুবেলের। বয়সের তুলনায় অনেক বড় পদে উঠে গেছে, কাজের চাপও বেশি। কাউকে না বলা যায় না, লোন থেকে শুরু করে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সব ব্যাপারে মাথা গলানো অভ্যাস। হঠাৎ করে এই বদ-অভ্যাস বাদ দেয়া অসম্ভব।

আজমলের মৃত্যু পুরো ব্যাপারটাকে জটিল করে ফেলেছে। যে হুমকিটাকে শুরুতে ঠাট্টা-ফাজলামি মনে হয়েছিল, এখন আর সেটা ফাজলামির পর্যায়ে নেই। আজমলের পরে আঘাত আসার কথা তার উপর কিংবা মশিউরের উপর। আর মশিউরই যদি এসবের পেছনে থাকে তাহলে অবধারিতভাবে এরপরের টার্গেট সে। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। মৃত্যু চিন্তা একবার মাথায় ঢুকে গেলে সেটা ধীরে ধীরে অবসাদে পরিনত হয়, নিজেকে দিয়েই তার প্রমান পাচ্ছে রুবেল। তুষার মাত্র দেশে ফিরেছে, ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এবার তার পালা।

পুলিশ আর স্পেশাল একটা ডিপার্টমেন্ট এই কেসটা নিয়ে কাজ করছে বলে শুনেছে, তবে পুলিশের পক্ষ থেকে যে মামলা করা হয়েছে সেখানে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তদন্ত চলছে, পত্রিকায় লেখালিখি হচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন চাপে আছে। সমস্যা হচ্ছে হুমকির কথাটা পুলিশকে জানানো যাচ্ছে না। এতে আরো বেশি সমস্যা হতে পারে। এরচেয়ে আগামি কয়েকটা দিন নিরাপদে থাকা ভালো হবে। সবচেয়ে ভালো হতো বিদেশে চলে যেতে পারলে। কিন্তু সেটাও সম্ভব না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, অফিস, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর রুবানা, এই বাঁধাগুলোর কারনে দেশ ছাড়া সম্ভব না। রুবানা তার স্ত্রি নয়, বান্ধবী। যে বান্ধবীকে মিরপুরে একটা ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছে রুবেল এবং যেখানে সে সময়ে-অসময়ে হাজির হতে পারে, একঘেয়ে জীবনে এই রুবানাই তার শান্তির সুবাতাস। অন্যান্য দিন রাত পর্যন্ত অফিসে থাকে রুবেল, আজ ভালো লাগছিল না, সন্ধ্যার পরপর ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল। আজ মিরপুরে যাবে। তাতে হয়তো কিছুটা ভালো লাগতে পারে।

পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করতে কিছুটা সময় লাগে। নীচে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ঢাকার রাস্তাঘাট দেখছিল রুবেল। সারাদিন অফিসের এসির বাতাসের মধ্যে থেকে থেকে বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে। একটু বাইরে থাকলেই হাঁসফাঁস লাগে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আজমলের সাথে কয়েকদিন আগে দেখা হবার কথাগুলো ভাবতে লাগল। এই তো সেদিন দুজনে একসাথে গিয়েছিল তুষারের বাসায়, অনেক কথা

হয়েছিল, হাসি-ঠাট্টা, পুরানো দিনের স্মৃতিচারন! সেই মানুষটা আজ নেই। হয়তো যে কোন সময় সেও মারা পড়বে, পুলিশ খুঁজবে আততায়ীকে এবং যথারীতি কোন হদিস করতে পারবে না। ইফতেখার উদ্দিন রুবেল সামান্য একটা ফাইল হয়ে পড়ে থাকবে কোন এক ক্যাবিনেটে। ধীরে ধীরে ধূলোর পাহাড় জমবে সেই ফাইলের উপর, একসময় সবার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে।

দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্ত লাগছিল, ড্রাইভারটাকে পাল্টাতে হবে, এক গাড়ি বের করতে যদি এতোক্ষন সময় লাগে তাহলে সমস্যা। খুনি হয়তো এই মুহূর্তে আশপাশে আছে, প্রতিটি গতিবিধির উপর নজর রাখছে। অসম্ভব কিছু না। চারদিকে তাকিয়ে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কি না দেখার চেষ্টা করল। অসম্ভব ব্যস্ত সব মানুষের ভিড়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকা বিশেষ একজনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ডিসকভারি চ্যানেলে মাঝে মাঝেই চিতা বাঘের শিকার করার দৃশ্য দেখায়। সেখানে

শিকার বুঝতেও পারে না কতো কাছাকাছি চলে এসেছে শিকারি। সে নিজেও হয়তো এমন এক শিকার।

বেসমেন্টের পার্কিং থেকে গাড়ি বের হয়ে আসতে তাতে চড়ে বসল রুবেল। জানালার কাঁচ সব তোলা, এসি চলছে ফুল স্পীডে, দেরি করার জন্য ড্রাইভারকে ধমক দিতে গিয়েও নিজেকে বিরত রাখল।

"মিরপুরে যাও," বলল রুবেল, নরম সিটে একটু হেলান দিয়ে বসল। ড্রাইভার ঠিকানা চেনে, যেতে প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো সময় লাগবে, এই সময়টা চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যায়।

চোখ বুজে ভালো কোন স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল রুবেল। রুবানার মুখটা ভাসছে চোখের সামনে। আসলে রুবানা নয়, ঝাপসা যে ছবিটা চোখের সামনে ভাসছে সে অন্য কেউ। অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া একজন। রুবানা কেবল সেই স্মৃতিটাকেই ধরে রেখেছে কেবল, সেই প্রায় একই চেহারা দিয়ে।

যৌবনের উদ্দাম সময়গুলোতে একজনকেই ভালোবেসেছিল রুবেল, তবে সেই ভালোবাসার কথাগুলো বলার মতো সময় কখনো আসে নি, কিংবা এসেছিল হয়তো, হাতের মুঠো খসে বেরিয়ে গেছে কিছু বুঝবার আগেই। চোখের সামনে দিয়েই সেই মানুষটা অন্যের হয়ে গেছে। কিছু বলতে পারে নি রুবেল, দোষটা তার, আর কারো নয়। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, ততোদিনে চাকরিতে ঢুকেছে, বিয়ে করেছে, ঘর আলো করে এসেছে দু'দুটি সন্তান, তারপর একদিন হঠাৎ রুবানাকে পাওয়া, সম্পূর্ন ভিন্ন এক পরিবেশে। সেই একই চেহারা, একই চাহনি, সবকিছু থেকে ছাড়িয়ে রুবানাকে শুধু নিজের করে রাখার জন্য মিরপুরে এই ফ্ল্যাটটা নেয়া। রুবানার দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকে শুধু। রুবানা হাসে, মনে মনে হয়তো তাকে পাগল ভাবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এটুকুতেই যে কেমন তৃপ্তি তা রুবানা বুঝবে

না, বুঝাবার কোন প্রয়োজনই নেই।

চোখ বুজে থাকতে থাকতে একসময় সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষের মুখটা অনেক অনেক দিন পর পরিষ্কার দেখতে পেল রুবেল। চমৎকার একটা নদী তীর ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে, হাত নেড়ে কাছে ডাকছে তাকে। নাহ! এই চেহারার সাথে রুবানার কোন মিল নেই!

ধড়মড় করে উঠে বসল রুবেল। এসির মধ্যেও ঘামছে। জানালা খুলে দিল।

"স্যারের কি শরীর খারাপ?" ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

"না, তুমি চালাও," রুবেল বলল।

ড্রাইভার আর কথা বাড়াল না, বনানী মোড়টা পার হয়ে ফ্লাইওভার দিয়ে মিরপুরে যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা হয়েছে, সেদিক দিয়েই যাচ্ছে গাড়িটা সবসময়ের মতো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রুবেল। হঠাৎ মনে হলো পরিচিত কারো মুখ দেখেছে, একটা মোটরবাইকে বসা। মশিউরের মতোই মনে হলো। প্রাইভেট গাড়ির ভিড়ে এখন একটু পেছনে পড়ে গেছে। গাড়ির পেছনের কাঁচটা ঘোলাটে ধরনের, এছাড়া সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই পেছনে ঘুরে তাকিয়েও নিশ্চিত হতে পারল না রুবেল।

মোটরবাইকের উপর ভীতি ছিল মশিউরের, এমনকি কারো সাথে পেছনের সিটে বসতেও ভয় পেত, সেই মশিউর ক'বে থেকে মোটরবাইক চালানো শুরু করেছে!

প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যাবে না, সামনে ট্রাফিক জ্যাম হাল্কা হতে শুরু করেছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল আবার, মোটরবাইকটাকে এখন দেখা যাচ্ছে না। মশিউর কি তার পিছু নিয়েছে? আজমলের খুনের পেছনে তাহলে কি মশিউরই জড়িত!

জানালা উঠিয়ে দিয়ে আবার চোখ বুজল রুবেল। সেই মুখটা আবার মনে করার চেষ্টা করল। লাভ হলো না, আগের মতো আবার রুবানার চেহারাই ভেসে উঠছে। মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট মুডে রাখা, পাশের সিটে, অচেনা একটা নাম্বার ভেসে উঠেছে স্ক্রিনে, বার কয়েক বাতি জ্বলে নিভে বন্ধ হয়ে গেল। টের পেল না রুবেল। ঠিক এই নাম্বারটা থেকেই প্রথমবার হুমকি এসেছিল।

আটটার মধ্যেই মিরপুরে চলে এলো রুবেল। আজ রাতটা এখানে কাটানো যায়। বারো তলা বিল্ডিংটা হয়েছে কয়েক বছর হলো, এখনো নতুনের মতো ঝকঝক করছে। সাততলার ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছে বছর তিনেক হলো, এখানে যে তার একটা ফ্ল্যাট আছে এটা কেউ জানে না, এমনকি স্ত্রি সাবিহাও না। জানাতে গেলেই সমস্যা।

নীচের বেসমেন্টের গ্যারেজে গাড়ি পার্কিং করে ড্রাইভার চলে গেছে। বিল্ডিংয়ের নীচে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করল রুবেল, অচেনা একটা নাম্বার থেকে মিসড কল এসেছিল, পরে কল দেবে বলে ঠিক করল, এখন সাবিহার সাথে কথা বলা দরকার, ওর নাম্বারে ডায়াল করল।

"হ্যালো," ওপাশ থেকে সাবিহা'র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। স্ত্রি'র চেহারাটা মনে করল রুবেল।

এই একজনই তাকে ভালোবাসে, অথচ কি এক অদ্ভুত ব্যাপার, এই একজনকেই সবচেয়ে বেশি এড়িয়ে চলে সে। প্রয়োজনের বেশি কথা বলে না, ভাব-ভালোবাসার যে ব্যাপার আছে সেখানেও দায়িত্ব সারে শুধুই একজন স্বামি হিসেবে, টাকা-পয়সা কিংবা গয়নাগাটির কোন অভাব নেই সাবিহার, তবে সেও সম্ভবত অনুভব করতে পারে, তার স্বামি ঠিক তার নেই। কোথাও যেন একটা সুর কেটে গেছে, কবে, কখন, তা দুজনের কেউই বলতে পারবে না।

"সাবিহা, আমি আজ বাসায় নাও ফিরতে পারি," রুবেল বলল, মিথ্যে কথা এমনভাবে বলতে হবে সেটা যেন নিজের কানেও বিশ্বাস্য শোনায়, "তোমাকে বলা হয়নি, আজ তুষারের বাসায় পার্টি, বুঝতেই পারছো, অনেক দিন পরে এসেছে, সব বন্ধু মিলে একসাথে রাতটা কাটাবো।"

"তুষার ভাই? তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া বন্ধু?"

"হ্যা," স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রুবেল, "হঠাৎ এসেছে, সারপ্রাইজ পার্টি দিচ্ছে, বুঝতেই পারছো।"

"যাও, অসুবিধা কি," সাবিহা বলল, "মনে করে ওষুধটা খেও, ড্রিংকসে একদম হাত দেবে না, সাবধান।"

"আরে নাহ, বাসায় কি আর ওসব হবে নাকি," রুবেল বলল, "রাখি তাহলে।"

"আচ্ছা," সাবিহা ফোন রেখে দিল।

মোবাইল ফোনটা পকেটে রাখার পর একরাশ বিষন্নতা গ্রাস করল রুবেলকে, সাবিহা সব বুঝে গেছে, যদিও সেটা তাকে বুঝতে দেয়নি। মোবাইল ফোনটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এখন হয়তো কাঁদছে, মেয়েটা নিশ্চিত জানে না রুবেল কি করছে কিংবা কোথায় যাচ্ছে, তবে এটুকু জানে, রুবেল তার একার নেই। কোনদিনই তার একার ছিল না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল রুবেল। ক্লান্ত লাগছিল। মোবাইল ফোনটা সুইচড অফ করে দিল। বাইরের কারো সাথে আজ আর যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যায় ২০

গিয়াস চৌধুরির খোঁজ পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি, ভদ্রলোকের বেশ বড়সড় দোকান আছে, রড-সিমেন্টের। দোকানের ভেতরে ছোট একটা রুম, কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এই রুমে গিয়াস চৌধুরি বসে আছেন, চোখ বন্ধ, হাতে তসবি, সামনে বসে থাকা অতিথি চারপাশ দেখছে গভীর মনোযোগে। দোকানের নাম চৌধুরি ইন্টারপ্রাইজ, একপাশে সিমেন্টের কিছু বস্তা উঁচু হয়ে আছে, অন্যদিকে রড, মাঝখান দিয়ে চলাচলের সরু রাস্তা। কাঁচের রুমটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ভেতরটা এতোটাই ঠান্ডা হয়ে আছে যে প্রায় কাঁপুনি ধরে যাচ্ছিল।

বেশ অনেকক্ষন সময় নিয়ে চোখ খুললেন গিয়াস চৌধুরি।

"বলেন, কি জানতে চান?" জিজ্ঞেস করলেন গিয়াস চৌধুরি।

"আপনি তো আজমল চৌধুরির আপন চাচা..."

"জি, আপন চাচা, এবার আসল কথায় আসেন," তাড়া দিলেন গিয়াস চৌধুরি।

"আজমল চৌধুরির শত্রু ছিল কারা, আপনার কোন ধারনা আছে, মাকে কে এরকম একটা কাজ করতে পারে?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

"এইটা ঐ মশিউর হারামজাদার কাজ, দেখেন," গলা পরিষ্কার করে নিলেন গিয়াস চৌধুরি, "ব্যবসায় তো গন্ডগোল থাকেই, তাই বলে কি এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ীকে মেরে ফেলে, তাইলে তো দুনিয়ায় ব্যবসা-বানিজ্যই থাকতো না। এইটা ঐ মশিউরের কাজ। ও সবার সামনে হুমকি দিছিল, আজমলরে নাকি দেখে নেবে।"

"ঘটনাটা কি আপনি জানেন?"

"ডিটেইলস তো জানি না, জানার দরকারও নাই," গিয়াস চোধুরি বললেন, হাত ইশারায় কাউকে ডাকলেন, শুকনো মতো একটা ছেলে কাঁচের স্লাইডিং দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে।

"আপনি ঠান্ডা খাবেন না গরম?"

ঠান্ডায় প্রায় কাঁপছিল শাহরিয়ার, তাই চায়ের কথা বলল। ছেলেটা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ায় আবার কথা শুরু করলেন গিয়াস চৌধুরি।

"আমি শুনছি ও হুমকি দিছে, এখন আমার ভাতিজা খুন হইছে," গিয়াস চৌধুরি, "হিসাব পরিষ্কার, আপনারা ওরে নিয়া দুইটা ডলা দেন, সব বের হইয়া যাইবো।"

জানে আলমের কাছ থেকে মশিউরের মোবাইল নাম্বার নিয়েছিল শাহরিয়ার, কলও দিয়েছে কয়েকবার, রিসিভ করেনি। এছাড়া কোন কিছুই এখন পর্যন্তআবু জামশেদকে জানানো হয়নি, মশিউর সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার ছিল, লোকটার ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না সেটা জানতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। এখান

থেকে বেরিয়ে অফিসে যেতে হবে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গেছে।

"আপনি শুনেছেন কার কাছে?"

"ওর তো বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না বড়লোকের পোলা, মাছির মতো লেগে থাকতো পেছনে," গিয়াস চৌধুরি বললেন, "আজও তো দেখা হলো, মশিউর আসছিল, ওরে আমি বাসায় ঢুকতে দেই নাই। আরো কয়েকজন ছিল আজকে, যেমন রুবেল, ওর স্কুলের বন্ধু।"

"মশিউরের ঠিকানা জানেন?"

"না, ওর বাসায় ঠিকানা জানার তো দরকার নাই আমার," গিয়াস চৌধুরি বললেন, এইসময় চায়ের কাপ হাতে ঢুকল ছেলেটা।

"ঐ, তুই চিনস না মশিউররে?" ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন গিয়াস চৌধুরি, হ্যা-সূচক মাথা নাড়াল ছেলেটা।

"ওর বাসা চিনস?"

আবারও মাথা নাড়াল ছেলেটা। শাহরিয়ারের সন্দেহ হচ্ছিল ছেলেটা আসলে বোবা, নাকি ভয়ে কথা বলছে না গিয়াস চৌধুরির সামনে।

"মাথা নাড়িস কেন? হ্যা-না বল," প্রায় গর্জে উঠলেন গিয়াস চোধুরি।

"জি, চিনি।"

"এই ছেলে একসময় আজমলের ফাই-ফরমাস খাটতো, পরে আমি নিয়া নিলাম, দোকানের জন্য, ও আজমলের কিছু বন্ধু-বান্ধবের বাসা চিনতো।"

"আমি ওর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নেবো," শাহরিয়ার বলল, "আচ্ছা, আপনার সাথে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"আমি নিজের ছেলেরেও ওর চেয়ে কম আদর করছি," একটু ভারি হয়ে গেল গিয়াস চৌধুরির কণ্ঠস্বর, "আমারে খুব মানত। এই যে দোকানটা দেখতেছেন, এটাও আজমলের টাকা দিয়ে কেনা, এমনকি মাল-সামানার টাকাও দিছে।"

"আজমল সাহেবের আরো একজন বন্ধুর নাম বললেন, রুবেল না কি যেন?"

"রুবেল, ব্যাংকে চাকরি করে। ভালো ছেলে।"

"ঠিক আছে, আমি আসি তাহলে, ঠিকানা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি," শাহরিয়ার বলল, বেরিয়ে এলো রুম থেকে। ছেলেটা বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, হাত ইশারায় কাছে ডাকল, তবে দেখা গেল সে মশিউরের ঠিকানা জানে না, গিয়াস চৌধুরির সামনে ভয়ে না বলতে পারেনি। অদ্ভুত ব্যাপার! ওকে আর কিছু বলল না।মশিউরের নাম্বারে আবার ডায়াল করল শাহরিয়ার, রিং হচ্ছে। কিন্তু এবারও কল রিসিভ করলো না, কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অচেনা নাম্বার থেকে কল রিসিভ করে না। মশিউরও হয়তো সেরকম কেউ, অথবা এরমধ্যেই হয়তো বুঝে গেছে, পুলিশ খুঁজছে তাকে।

মশিউরের ঠিকানা আছে সাথে, তবে আবু জামশেদের সাথে কথা না বলে এ ব্যাপারে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না, মশিউর আজমলকে হুমকি দিয়েছিল, সেটা কখন, কবে, কি পরিস্থিতিতে দিয়েছিল সে তথ্যগুলো এখনো জানা হয়নি, জানে আলমও পরিষ্কার করে কিছু বলে নি, রুবেল নামে আরেকজন বন্ধুর নাম পাওয়া গেছে, বেসরকারি একটা ব্যাংকে চাকরি করে, প্রয়োজনে ওর সাথেও দেখা করবে বলে ঠিক করল শাহরিয়ার, অফিস এখান থেকে বেশি দূরে নয়, গাড়িতে উঠে সিটে আরাম করে বসল।

এই কেসটা খুব সহজ সরল কিছু হবে না। আগামি কয়েকদিন খুব ব্যস্ত কাটবে বলে মনে হচ্ছে, ব্যস্ততাই চাই শাহরিয়ারের, একজন ব্যস্ত মানুষ অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারে।

অধ্যায় ২১

সন্ধ্যার একটু পর বাসায় ফিরেছে তুষার। গাজীপুর থেকে ঢাকায় বাসায় ফেরার পথ যেন শেষই হচ্ছিল না। একটানা ড্রাইভ করতে খারাপ লাগে নি, এরচেয়ে অনেক লম্বা জার্নি করার অভ্যাস আছে, তবে সেটা আমেরিকায়। দুটো অভিজ্ঞতায় মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। গাড়িটা গ্যারেজে রেখে হাত মুখ ধুয়ে ড্রইং রুমে টিভির সামনে বসল, বাথরুমে ঢুকে গলায় একটা ফাস্ট এইড ব্যান্ড লাগিয়েছে, সেভ করতে গিয়ে কেটেছে বললেই হবে। কাটাটা আরেকটু গভীর হলেই খবর ছিল। বাবা-মা, সুমনা আর ক্রিস্টিনা কেউ বাসায় নেই। না থাকাতেই ভালো হয়েছে। মন ভালো না, এই সময় আশপাশে লোকজন না থাকাই ভালো।

আরিফের রাগটা বুঝতে পারে তুষার, ভেবেছিল দীর্ঘদিন পর সেই রাগ হয়তো অনেক কমে আসবে। রাগ কমে আসে নি, বরং আরো বেড়েছে। আজমলের মৃত্যুর পর সবকিছু কেমন ফাঁকা লাগছে। ঢাকায় ফেরার সময় যে উৎসাহ, উদ্দীপনা কাজ করছিল সব ফুরিয়ে গেছে এক নিমিষেই। বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব ব্যস্ত, বাড়তি সময় নেই কারো হাতে। ইচ্ছে ছিল একটা রি-ইউনিয়ন মতো করার, কিন্তু তাতে শুরুতে কয়েকজনের প্রবল উৎসাহ দেখা গেলেও পরে কারো সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা হয়নি।

টিভি দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি। আটটার উপর বাজে। কেউ ফেরে নি এখনো। টেলিফোন সেটটা সোফাসেটের পাশেই রাখে, বাবা-মা এখনো ব্যবহার করেন, মোবাইল ফোনে খুব একটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি তাই। কারো সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো, পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রুবেলের নাম্বারে ডায়াল করল তুষার। সুইচড অফ বলছে।

রি-ডায়ালে চাপ দিল। এই মূহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়ে দেয়া হল। রুবেলের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকার কথা না, অবশ্য স্মার্টফোনে চার্জ একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে, রুবেলের ফোন হয়তো সেকারনেই বন্ধ।

এবার মশিউরের নাম্বারে ডায়াল করল, অদ্ভুত ব্যাপার, ওর নাম্বারটাও বন্ধ। সবাই কি আজ ফোন বন্ধ করে রেখেছে নাকি?

শার্টের পকেটে হাত দিয়ে গাড়ির সিটে পাওয়া চিরকূটটা হাতে নিল তুষার। লেখাগুলো পড়ল আবার। গাজীপুরের ঐ এলাকায় গাড়ির সিটে চিরকূটটা কিভাবে এলো সেটা একটা রহস্য। আরিফ আর ওর সহকারি লোকটা বাসায়ই ছিল, তারমানে কেউ তাকে অনুসরন করে গাজীপুর পর্যন্ত গেছে, আরিফের বাসায় ঢোকার পর গাড়ির জানালা দিয়ে চিরকুটটা রেখেছে সিটের উপর। কিন্তু পরিস্কার মনে আছে, গাড়ি লক করে আরিফের বাসায় ঢুকেছিল সে, এমনকি গাড়ির জানালার কাঁচও তোলা ছিল। গাড়ির চাবি ছাড়া ভেতরে চিরকূট রেখে আসা কারো পক্ষে সম্ভব না, যদি না... মাথায়

কিছু আসছিল না আর। এখানে ভৌতিক কোন ব্যাপার নেই, দিনে-দুপুরে চিরকূটে হুমকি দিয়ে গেছে এবং হুমকিদাতা চাইছে না আরিফের সাথে তার কোন যোগাযোগ থাকুক। কিন্তু কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা খুব দরকার। বড় কোন ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে সাবধান হওয়া দরকার। নিজের জন্য নয়, অন্তত ক্রিস্টিনার জন্য।

লাল কালিতে হাতে লেখা চিরকূটটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল তুষার। এই চিরকূটটাই হয়তো তাকে পথ দেখাবে।

সবাই চলে আসবে যে কোন সময়। ড্রইং রুমে বসে দম বন্ধ লাগছিল, সিড়ি বেয়ে ছাদে চলে এলো তুষার। চমৎকার বাতাস বইছে। হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে, এই হাওয়া তাকে নিয়ে যাক দূর কোন দেশে, যেখানে পুরানো সব ভুলে নতুন করে জীবনটা শুরু করতে পারবে আবার।

উপর থেকে বাসার গেট খুলতে দেখল, সুমনা আর ক্রিস্টিনা ফিরে এসেছে। ক্রিস্টিনাকে সময়ই দেয়া হচ্ছে না, আগামিকাল ওকে নিয়ে কোথাও না কোথাও যাবে বলে ঠিক করল।

বৃষ্টি শুরু হলো এই সময়। ভিজতে ইচ্ছে হলেও ছাদ থেকে নেমে এলো তুষার। চিরকূটটাকে সাবধানে রাখতে হবে।

* * *

আবু জামশেদ রুমে বসে আছেন, কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটা কেসে হাত দিয়েছেন, সবগুলোর সমাধান হয়েছে। নতুন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে এটাই অনেক বড় অর্জন, তবে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখানে যোগ দেয়ার সময়, তা হলো, কোন ধরনের অসমাপ্ত কেস থাকবে না ডিপার্টমেন্টে। একজন অপরাধি বেঁচে যাওয়া মানে নতুন আরেকটা অপরাধের ভিত তৈরি করে দেয়া।

আজমল চৌধুরির মৃত্যুর পর দুটো দিন কেটে গেছে, অথচ তেমন কোন লিড হাতে আসেনি। শাহরিয়ারের উপর ভরসা আছে, ছেলেটা চালাক-চতুর এবং একই সাথে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসি। এই আত্মবিশ্বাস মাঝে মাঝে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

মনিটরে আজমল চৌধুরির ফাইল দেখছেন মনোযোগ দিয়ে। ব্যবসায়িক মহলে লোকটার শত্রুর অভাব ছিল না, কাউকে ব্যবসার মাঠ থেকে সরানোর জন্য পারলে নিজের পন্য ফ্রি দিয়ে দেয়ার মতো অবস্থার তৈরি করেছিল, এতে সাময়িক ক্ষতি হলেও পরবর্তি সময়ে সে ক্ষতি পুষিয়ে ফেলেছে পন্যের দাম বাড়িয়ে, ততোদিন ঐ পন্যের বাজারে আর কোন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। লোকটার মেধা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই সাথে ছিল চারিত্রিক কিছু দূর্বলতা, ওর বন্ধু-বান্ধবদের সবাই জানতো এ কথা, এমনকি পরিবারের সদস্যরাও সবাই জানে। এটা ওদের পারিবারিক

বৈশিষ্ট্য, আজমল চৌধুরির বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও খুব একটা সুবিধার ছিল না।

আটটা প্রায় বাজে, বাসায় যাওয়া দরকার, পুরো অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু দারোয়ান আর পিয়ন একজন রয়ে গেছে, তিনি বের না হওয়া পর্যন্ত ওরাও বেরুতে পারছে না। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আবু জামশেদ। সময়মতো সব কাজ না করাতে আজ সময় কাটানোর মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। বাসায় যাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে আর কারো উপস্থিতি নেই সেখানে যাওয়া আর না-যাওয়া একই কথা।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিলেন, সাইলেন্ট করা ছিল, কোথাও চাপ লেগে গিয়েছিল সম্ভবত।

বেশ কয়েকটা মিসড কল ভেসে আছে, শাহরিয়ারের নাম্বার থেকে। খুব জরুরি না হলে এতোবার কল করার কথা নয়, তিনি শাহরিয়ারের নাম্বারে ডায়াল করলেন। রিং হচ্ছে।

"শাহরিয়ার, হ্যালো। তুমি কোথায়?"

"চলে এসেছি প্রায়, আপনি অফিসে আছেন?"

"হ্যা।"

"বেশিক্ষন লাগবে না, দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবো।"

"ওকে," বলে ফোনটা রেখে দিলেন তিনি।

অফিসে আরো কিছুক্ষন বসে থাকা যায়, দেখা যাক, নতুন কোন তথ্য নিয়ে আসছে কি না শাহরিয়ার, ছেলেটাকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো।

তিনি আজমল চৌধুরির ফাইলটা বন্ধ করে দিয়ে মাইনসসুয়েপার খেলায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

শাহরিয়ার যখন অসিফে ঢুকল তখন নয়টার কাছাকাছি বেজে গেছে। নিজের ডেস্কে না গিয়ে সরাসরি আবু জামশেদের দরজায় নক করল, 'কাম ইন' শুনে ঢুকল ভেতরে।

"বলো," কম্পিউটারের মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন আবু জামশেদ।

"বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বললাম, সন্দেহভাজন হিসেবে একজনের নাম পেয়েছি, মশিউর রহমান, আজমল চৌধুরির পুরানো বন্ধু। বছর কয়েক আগে ওর মধ্যে কি একটা ঝামেলা হয়েছিল, মশিউর তখন হুমকি দিয়েছিল।"

"বছর কয়েক আগের ঝামেলা, আচ্ছা," একটু থেমে বললেন আবু জামশেদ, "বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঝামেলা হতেই পারে। সেজন্য খুন হয়েছে বলতে চাও? নাকি সবাই তোমাকে ভুল পথে চালাতে চাচ্ছে?"

"শুধু এটুকু ঝামেলা না, যতোটুকু জেনেছি মশিউর কয়েকবছর জেলও খেটেছে এবং তাতে আজমল চৌধুরির হাত ছিল।"

"আচ্ছা।"

"আমি মশিউর রহমানের মোবাইল নাম্বার জোগাড় করেছি, কয়েকবার কলও করলাম, কিন্তু কল রিসিভ করেন নি," শাহরিয়ার বলল, একটু দমে গেছে, কেউ

তাকে ভুল পথে চালাতে চাচ্ছে, ব্যাপারটা এর আগে মাথায় আসেনি। হতেও পারে।

"যাক, তুমি খোঁজ নাও মশিউর সম্পর্কে, আমি আমার মতো করে খোঁজ নিচ্ছি," আবু জামশেদ বললেন, "এখন বাসায় যাও।"

"স্যার, আমার ধারনা এখানে ব্যবসায়িক-রাজনীতিক কোন কারন নেই, পারিবারিক ঝামেলা কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সমস্যা হতে পারে।"

"পারিবারিক ঝামেলা কেমন? আজমল চৌধুরির তো কোন ভাই নেই, এক বোন সেও বিদেশে থাকে।"

"উনার চাচাকে আমার খুব ঘোড়েল লোক মনে হয়েছে," শাহরিয়ার বলল।

"তাহলে সেই খোঁজ-খবর নেয়ার ব্যবস্থাও করছি," আবু জামশেদ বললেন, "আর কিছু?"

"আগামি দুদিন আজমল চৌধুরির কাছের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কথা বলবো, তারপর জানাবো আপনাকে।"

"তুমি কি ভাবছো আমাদের হাতে অনেক সময়!" হাসলেন আবু জামশেদ, "আগামি দু'দিনের মধ্যে আমাকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে, তোমার হাতে সময় আছে আটচল্লিশ ঘন্টা, এখন যাও। বাসায় যাও।"

"ঠিক আছে," বলে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, "স্যার, আপনি যাবেন না?"

"যাবো, আরো পরে," বলে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকালেন।

রুম থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার, ক্লান্ত লাগছিল। সারাদিন অফিসের গাড়িতেই ছিল, কিন্তু এখন আর গাড়ি পাওয়া যাবে না। একটা সিএনজি অটো রিক্সা ডাকল হাতের ইশারায়। অনেক বেশি ভাড়া চাইলেও কিছু বলল না, চেপে বসল। মাথার মধ্যে একটা কথাই ঘুরছে, আগামি দুদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। দুদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে শাহরিয়ার, একদম পারফেক্ট রিপোর্ট, যে করেই হোক।

আরো অনেকক্ষন পর অফিস থেকে বের হলেন আবু জামশেদ। এরমধ্যে কয়েকটা সোর্সে ফোন দিয়েছেন, তথ্যে সংগ্রহের জন্য নিজস্ব কিছু সোর্স তৈরি করেছেন। এই সোর্সগুলোর তথ্যে কোন ভুল থাকে না।

বাসায় যাওয়ার কোন তাড়া নেই, কোনদিন ছিলও না। কাজকেই আপন করে নিয়েছিলেন, ইদানিং মাঝে মাঝে মনে হয় খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছেন। সেই ভুল শোধরানোর উৎসাহ কিংবা সময় হাতে নেই। একা একা বসে টিভি দেখা, বই পড়া, নিজের জন্য কিছু একটা রান্না করে নেয়া, এই কাজগুলোতে বেশি সময় লাগে না, বাকি সময়টা তিনি কাজে লাগান নিজের কিছু শখে। গত কয়েকমাসে ডিপার্টমেন্টে আরো কিছু লোক যোগ দিয়েছে, পুরো একটা টিম কাজ করবে যে কোন দিন থেকে। তখন বাইরের কারো সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। প্রতিটা লোককে বাছাই করে নিয়েছেন তিনি, শাহরিয়ারকে নিয়ে কিছুটা শংকা ছিল, মনে হচ্ছে ছেলেটা পারবে।

অধ্যায় ২২

ছয় মাস আগে

একবছর আগে বইটা বের করা হয়েছে, অনেক ঝুঁকি ছিল, ছদ্মনামে লেখা একটা বই, কতোটুকু চলবে তা নিয়ে দারুন দ্বিধা ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝুঁকিতে কাজ হয়, যেমন এই বইটার ক্ষেত্রে হয়েছে। যথেষ্ট বিক্রি হয়েছে বইটা, পাঠকদের মাঝে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে বলা যায়, সবাই "অরি" নামের পেছনের আসল লেখক কে জানতে চায়, তার সাথে যোগাযোগ করতে চায়। প্রকাশকমহলেও যথেষ্ট কানাঘুষা চলে লেখকের পরিচয় নিয়ে, পত্রিকাগুলোতেও বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু যেখানে আসল প্রকাশকই পরিচয় জানে না, সেখানে বাকিরাও এবিষয়ে রীতিমতো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

লেখকের সেই আইডি এখন নিষ্ক্রিয়, মাঝে মাঝে ফেইসবুকে ঢুকে "অরি" নামধারী প্রোফাইল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে মোফাজ্জল হোসেন, দ্বিতীয় আরেকটা বই যদি বের করা যেতো খুব ভালো হতো। একজনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলা যেত। চেম্বারে পায়চারি করতে করতে জানালার পাশে দাঁড়াল মোফাজ্জল হোসেন।

কুদ্দুসকে নিচে আনতে চা আনতে পাঠানো হয়েছিল, সে কাজ বাদ দিয়ে কার সাথে যেন কথা বলছে। মানুষটা হাল্কা-পাতলা গড়নের, উপর থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল না, এখন এমন কোন শীত পড়েনি যে হুড তোলা টি-শার্ট পরতে হবে, একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বারবার তাকাচ্ছে আশপাশে, জানালার একপাশে সরে এলো মোফাজ্জল, যদি চেহারাটা বোঝা যায়, কিন্তু লাভ হলো না। লোকটা কুদ্দুসের হাতে কী কিছু দিল? আরো ভালো করে তাকাল মোফাজ্জল। কুদ্দুস কি বাড়তি রোজগার করে বই বিক্রি করে? এই জন্যই মাঝে মাঝে হিসেব মেলে না। আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। ও উপরে এলে এর একটা বিহিত করতে হবে। অসৎ কর্মচারি থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। মিনিটখানেকের মধ্যেই গনগন করে হেঁটে চলে গেল লোকটা, কুদ্দুস কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়, তারপর চায়ের ফ্লাস্কটা নিয়ে ফেরার পথ ধরল। জানালার কাছ থেকে সরে চেয়ারে গিয়ে বসল মোফাজ্জল।

ওর হাড্ডিগুড্ডি ভাঙতে হবে, বজ্জাত কোথাকার, মনে মনে বলল মোফাজ্জল হোসেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই রুমে ঢুকল কুদ্দুস, একহাতে ফ্লাস্ক, অন্য হাতে একটা খয়েরি রঙের খাম।

"খাম কিসের?" বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল মোফাজ্জল, কুদ্দুসকে নিয়ে একটু আগে শুধু শুধুই সন্দেহ করছিল।

"ঐ লোকটা দিয়া গেল," কুদ্দুস বলল, "কইল, আপনেরে দেওনের লাইগ্যা। কুরিয়ারের লোক।"

"দে, তাহলে," হাঁফ ছাড়ল মোফাজ্জল, নিজের উপরই রাগ হচ্ছিল হঠাৎ করেই। মানুষকে সময়ে সময়ে বিশ্বাস করতে হয়, এই কুদ্দুস তার এখানে আছে ব্যবসা শুরুর দিন থেকে, আজ পর্যন্ত টাকা-পয়সার হিসেবে কোন গড়মিল করেনি। বইয়ের হিসেবের যেটুকু গন্ডগোল তা হতেই পারে।

তার নিজের অন্তত কুদ্দুসকে সন্দেহ করা ঠিক হয়নি, আসলে মানুষের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা উঠে গেছে একেবারে।

খামটা বাড়িয়ে দিল কুদ্দুস।

"ফ্লাস্ক থেকে চা কাপে ঢেলে দিয়ে যা," মোফাজ্জল হোসেন বলল, খামটা খুলে ফেলেছে। একপাতার একটা লেখা বেরিয়ে এলো, টাইপ করা একটা চিঠি, বাংলায় লেখা চিঠিটা নিম্নরুপঃ "জনাব মোফাজ্জল হোসেন, আশা করি ভালো আছেন। আপনার সাথে আমার চুক্তি মোতাবেক, গত এক বছরে যে পরিমান রয়ালিটি জমা হয়েছে তা আগামি কাল দুপুরের মধ্যে ঢাকার সবগুলো এতিমখানায় সমানভাবে ভাগ করে দেবেন। যদি এর ব্যতয় ঘটে, তাহলে তার পরিনতি মোটেও ভালো হবে না। শুভেচ্ছান্তে, অরি।"

লেখাগুলো বেশ কয়েকবার পড়ল মোফাজ্জল হোসেন। হুমকিটা সরাসরি দেয়া হয়েছে, এই রকম অদ্ভুত মানুষের পাল্লায় পড়া খুব ঝামেলার, কখন কী করে বসবে কে জানে, শেষে জীবন নিয়ে টানাটানি।

রয়ালিটির পরিমান হিসেব করা আছে, তবে হিসেবের ঝামেলা এড়াতে আরো কিছু যোগ করে দেবে বলে মনস্থির করল।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে টেবিলে বসে পড়ল মোফাজ্জল হোসেন। একটু আগেই চিন্তা করছিল দ্বিতীয় কোন বই বের করার, কিন্তু এই চিঠির পর এই অদ্ভুত লেখকের আর কোন বই কখনোই বের করবে না সে। যতো লাভই থাকুক।

অধ্যায় ২৩

বর্তমান

মন ভালো থাকলে হাতে করে গোলাপ ফুল নিয়ে আসে রুবেল, নীচেই একটা ফুলের দোকান আছে, সেখান থেকে। আজ দোকান খোলা ছিল, কিন্তু মন ভালো ছিল না বলে ফুল কেনা হলো না। রুবানা ফুল খুব পছন্দ করে।

লিফটে করে চলে এসেছে সাততলায়, করিডোর ধরে কিছুটা হাঁটতে হয়, একদম কোনার দিকের ফ্ল্যাটটা তার, এখানকার বাসিন্দারা পাশাপাশি থাকলেও তারা পরস্পরের অপরিচিত এবং এই ব্যাপারটাই রুবেলের পছন্দ। ঢাকা শহরের মতো জায়গায় প্রতিবেশিদের সাথে খুব বেশি মেলামেশা হিতে বিপরীত হতে পারে। এই ফ্ল্যাটটা খুব যত্ন করে সাজিয়েছে সে, যেমন ফ্ল্যাটের দরজাটা চমৎকার, সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি, ভেতরে দেয়ালজুড়ে আছে ক্যাবিনেট, কিচেন পুরোটা ইম্পোর্টেড, বাথরুম ফিটিংস, টাইলস, দেয়ালের রঙ, কোথাও কার্পন্য করেনি। ভেতরের আসবারপত্রগুলোও সব দামি, সোফাসেট, বিছানার চাদর-বালিশ, জানালার পর্দা, ড্রইং রুমে ঝাড়বাতি, সব নিজ হাতে কেনা, কলিং বেলে চাপ দিল রুবেল।

এই সময়টা খুব দ্বিধায় কাটে, সাবিহার মুখটা মনে পড়ে, যে মেয়েটা তাকে বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে, অথচ দিনের পর পর তাকেই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে কলিং বেলে চাপ দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে যেতে। পরক্ষনেই আবার রুবানার মুখটা ভেসে উঠে, সন্ধ্যার পর কলিং বেলের আওয়াজের জন্য মেয়েটা উদগ্রিব হয়ে অপেক্ষা করে। এইসব দোলাচলে খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না, এরমধ্যেই দরজা খুলে দেয় রুবানা।

আজকেও তাই হলো। রুবানা দরজা খুলল। মুখটা হাসি হাসি। ভেতরে ঢুকল রুবেল, দরজা আটকে দিল রুবানা।

"আজ মনে হচ্ছিল তুমি আসবে," রুবানা বলল, "মাঝে মাঝে মনে হয় আমি জ্যোতিষী।"

"তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল," রুবেল বলল।

"তাহলে ফুল আনো নি কেন?" কপট রাগের ভান করে রুবানা, পাশে বসে হাত ধরে রুবেলের।

"মনটা খারাপ," রুবেল বলল, "খুব কাছের একজন মারা গেছে।"

"কে?"

"তুমি চিনবে না, আমার খুব ক্লোজ বন্ধু," রুবেল বলল।

"মন খারাপ করে লাভ নেই," রুবানা বলল, "এরচেয়ে রাতে কি খাবে বলো, আমি রান্না করে ফেলেছি, তারপরও দেখি।"

"যা আছে, তাই খাবো," বলল রুবেল। টাইয়ের নট খুলে একটু আরাম করে বসল সোফায়, চোখ বুজল।

কলিং বেলে চাপ পড়ল তখন। চমকে উঠল রুবেল, এই বাসায় আর কারো আসার কথা নয়, কলিং বেলে কে চাপ দেবে।

"তুমি বসো, আমি দেখছি," রুবানা বলল।

ওকে হাত ইশারায় থামাল রুবেল। কোন কথা বলতে নিষেধ করল। কোন শব্দ না করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পিপিং হোলে চোখ রাখল। মাথায় হলুদ রঙের ক্যাপ পড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে, হাতের একটা প্যাকেট, পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল না, তবে মনে হচ্ছে পিজ্জা কিংবা অন্য কোন খাবারের অর্ডার।

"তুমি কি পিজ্জা অর্ডার করেছিলে?" জিজ্ঞেস করল রুবেল, চাপা গলায়।

"না," রুবানা বলল, ওর গলার স্বরটা কেমন ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

"তাহলে পিজ্জা নিয়ে এসেছে যে?"

"কি জানি, খুলেই দেখ না!" রুবানা বলল।

দরজা খুলল রুবেল, পুরোটা না খুলে অল্প একটু খুলেছে, হলুদ রঙের ইউনিফর্ম পড়া একজন দাঁড়িয়ে আছে, ক্যাপে লেখা 'পিজ্জা বাজার' শব্দটা পড়তে পারল রুবেল। এই নামে এই এলাকায় পিজ্জার একটা দোকান আছে, হোম ডেলিভারিও দেয়।

"ম্যাডাম আর আপনার জন্য কমপ্লিমেন্টারি পিজ্জা, স্যার," ডেলিভারিম্যান বলল, টুপি দিয়ে অর্ধেক মুখ ঢাকা, কন্ঠটা ভরাট।

রুবেল তাকাল রুবানার দিকে, রুবানাও শুনতে পেয়েছে, স্বস্তির একটা ছাপ দেখা গেল ওর চেহারায়।

"এই স্লিপে একটা সাইন দেবেন," বলল ডেলিভ্যারিম্যান, ছোট একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল রুবেলের দিকে।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতে গিয়েই বুঝতে পারল রুবেল ভুল হয়ে গেছে। পিজ্জার প্যাকেটের উপরের অংশটা খুলে ফেলল ডেলিভারিম্যান, একটানে। ভেতরে পিজ্জা নেই। কালো চকচকে একটা রিভলবার রাখা প্যাকেটটায়, সাইলেন্সার লাগানো, হলিউডি সিনেমার বদৌলতে এই জিনিস চিনতে ভুল হলো না। হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা লাগানোর চেষ্টা করল রুবেল। পারল না। উল্টো দরজা পুরোটা খুলে গেল। ডেলিভারিম্যান প্যাকেট থেকে রিভলবারটা বের করে ভেতরে ঢুকল, তাক করে আছে রুবেলের দিকে।

এক পা এক পা করে পিছাচ্ছে রুবেল। রুবানার চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে

গেছে। দরজাটা লাগিয়ে দিল ডেলিভারিম্যান, ক্যাপটা মুখের উপরের অংশটুকু পুরোটা ঢেকে রেখেছে, শুধু ঠোটজোড়া দেখা যাচ্ছে। ক্লিনসেভড, শক্ত চোয়াল।এই অংশটুকু চেনে রুবেল, খুব নাছোড়বান্দা লোকদের চেহারাই এমন হয়ে থাকে।

"আমি সব দিয়ে দেবো, যা ইনকাম করেছি সব," কোনমতে বলল রুবেল, "গুলি করবেন না প্লিজ।"

উত্তরে কিছু বলল না ডেলিভারিম্যান, রিভলবারটা এখনও তাক করা রুবেলের বুক বরাবর।

"আমার দুই সন্তান, অল্পবয়সেই ওরা এতিম হয়ে যাবে, ওদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে," রুবেল বলল, তবে এই মুহূর্তে মারা গেলেও সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা নেই তার, যথেষ্ট পরিমান ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে, এছাড়া জমি, ফ্ল্যাট এই রকম অনেক কিছু তো এরমধ্যেই কেনা শেষ।

"টাইম আপ!" চাপা গলায় বলল ডেলিভারিম্যান, পরপর দুবার ট্রিগারে চাপ দিল।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুবেল, কোন ধরনের ব্যথা অনুভব করছে না, মনে হচ্ছে বুকে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে কেউ, দুটো জায়গা অবশ হয়ে গেছে। এই অনুভূতি বেশিক্ষন থাকল না। সোফায় এলিয়ে পড়ল। মৃত্যুর সময় তার চোখের সামনে সাবিহা, রুবানা অথবা হারিয়ে যাওয়া সেই ভালোবাসার ছবি ভাসছিল কি না তা কেউ বলতে পারবে না।

রুবানার দিকে তাকিয়ে রিভলবার তাক করল এবার ডেলিভারিম্যান। দুই হাত উঁচু করে আছে রুবানা, চোখ দুটো বন্ধ, বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, একটু আগেই যে মানুষটার সাথে সে হাসছিল, কথা বলছিল, সে এখন মৃত, মৃত্যু হয়তো খুব কঠিন কিছু নয়, চোখ বন্ধ করার আগে রুবেলের চোখে বিস্ময় আর মুখে হাসি দেখেছে। নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রুবানা।

তবে রুবানার দিকে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না ডেলিভারিম্যানকে, বরং প্যান্টের পেছনে গুঁজে রাখা ধারাল একটা চাপাতি বের করে আনল। আতংকিত রুবানা অবাক হয়ে দেখল ধারাল চাপাতি দিয়ে রুবেলের দুই পায়ের পাতা আলাদা করল লোকটা, পুরো মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শার্টের পকেট থেকে একটা টিস্যু বের করে চাপাতিটা মুছল।

রুবানাকে এই অবস্থায় রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ডেলিভারিম্যান।

অধ্যায় ২৪

সকালে অফিসে পা রাখার সুযোগ পেল না শাহরিয়ার, আবু জামশেদ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন সম্ভবত। শাহরিয়ারকে ডাকলেন হাত ইশারায়।

"তুমি তৈরি তো?"

"জি," কোনকিছু না ভেবেই বলল শাহরিয়ার।

"আজ পুরো টিম নিয়ে যাবো," আবু জামশেদ বলল।

পুরো টিম বলতে কি বোঝাতে চাইছেন দেখার জন্য চারপাশে তাকাল শাহরিয়ার। আবু জামশেদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, পেছনে সাদা রঙের একটা মাইক্রোবাস, ভেতরে কয়েকজন লোক বসে আছে, এদের আগে কখনো দেখে নি, এই লোকগুলোই তাহলে টিম!

কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করল না শাহরিয়ার, গাড়ির পেছনের সিটে আবু জামশেদের পাশে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, পেছন দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে মাইক্রোবাসটাও আসছে পেছন পেছন।

"কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে না?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

"নিশ্চয়ই খুব জরুরি কোন কেস," শাহরিয়ার বলল।

"এবার খুন হয়েছে মিরপুরে, লাশ এখনো সরানো হয়নি, থানার ইনচার্জের সাথে কথা হয়েছে, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে," আবু জামশেদ বললেন।

"কে খুন হলো?"

"নাম শুনলাম ইফতেখার উদ্দিন রুবেল," আবু জামশেদ বললেন, "এর বেশি কিছু জানি না।"

আর কথা বাড়াল না শাহরিয়ার, হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বাজে নি এখনো, এতো সকালে অফিসের নতুন একটা টিম এসে হাজির এবং আবু জামশেদ অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য।

এসবের আলাদা কোন তাৎপর্য আছে, তবে এ নিয়ে মাথা ঘামতে চাইল না শাহরিয়ার। সকাল সকাল মানুষের রক্ত দেখতে হবে ভেবেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে মিরপুরে বারোতলা একটা বিল্ডিংয়ের সাততলায় নিজেকে আবিষ্কার করল শাহরিয়ার। ফ্ল্যাট নং জি-ফোর। ফ্ল্যাটের মালিক ইফতেখার উদ্দিন রুবেল, একটি বেসরকারি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাথা আর বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ফ্ল্যাটের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

ফ্ল্যাটের আরেক বাসিন্দা রুবানা নাম্নি এক মেয়ে, বয়স তেইশ-চব্বিশের কাছাকাছি, ধারনা করা হচ্ছে মেয়েটা ইফতেখার সাহেবের রক্ষিতা। মেয়েটাকে এখনো ফ্ল্যাটের বেডরুমে রাখা হয়েছে, মাঝে মাঝেই অচেতন হয়ে যাচ্ছে।

বিল্ডিংয়ের নীচে পুলিশের গাড়ি, ভ্যান জড় হয়েছে বেশ কয়েকটা, কী হয়েছে জানার জন্য উৎসুক জনতা আর সাংবাদিকদের ভিড় বাড়ছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে সাততলার এই ফ্ল্যাটে আসার সুযোগ দেয়া হয়নি। লিফট আর দরজায় আলাদা পাহারা বসানো হয়েছে। তবে তাতে ঘটনা চাপা থাকে নি, সবাই জানে এই বিল্ডিংয়ে একটা খুন হয়েছে এবং খুনি সম্ভবত একজন মহিলা।

সাততলায় উঠার আগে নীচে মিরপুর থানার ইনচার্জ সোলাইমান আলীর সাথে কথা হয়েছে, তিনি জানালেন ভোরের দিকে মিরপুর থানায় ফোন আসে, ফোন করে রুবানা নামের এক মেয়ে, জানায় যে একজন এসে তার স্বামিকে খুন করে রেখে গেছে। সাথে সাথেই সোলাইমান আলী পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে পুরো বিল্ডিংয়ের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিয়েছে এবং হোমিসাইডের ডিটেকটিভদের জন্য অপেক্ষা করেছে। ভদ্রলোককে এজন্য আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছেন আবু জামশেদ, সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে দেন নি দেখে আরো খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো শাহরিয়ারের কাছে।

বেকায়দা অবস্থায় লাশটা পড়ে আছে, চারপাশে ছোটখাট জমাট রক্তের স্তর জমে গেছে। হাঁটু গেড়ে বসে ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখল শাহরিয়ার, ফর্সা, সুদর্শন একজন মানুষ, পরনে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, সোফার একপাশে ভদ্রলোকের কোট আর টাই দেখতে পেল। তারমানে খুন হবার আগে কোট আর টাই খুলে রেখেছিলেন, সম্ভবত হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোফায়। ভদ্রলোকের পায়ে দামি কালো জুতোজোড়া চকচক করছে, তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম, জুতোসহ পায়ের পাতা ধারাল কিছু দিয়ে পা থেকে আলাদা করা হয়েছে। ঠিক যেরকমটা দেখা গিয়েছিল আজমল চৌধুরির ক্ষেত্রে।

উঠে দাঁড়িয়ে আবু জামশেদের দিকে তাকাল শাহরিয়ার, একটা চেয়ার নিয়ে বেশ আরাম করে বসেছেন। যে টিমটাকে সাথে আনা হয়েছে, ওরা কাজ করছে। ওদের কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখছেন তিনি। শাহরিয়ারও দেখল। চারজন কাজ করছে, এদের মধ্যে দুজনের বয়স ত্রিশের উপর হতে পারে, বাকি দুজন অল্পবয়স্ক, তার সমবয়েসীই হবে, ভাবল। ছবি তোলা হচ্ছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধারের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারায় কথা বলছে চারজন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে দুই বেড ড্রইং-ডাইনিংয়ের ফ্ল্যাট পুরোটা চষে ফেলল ওরা। আরো কিছুক্ষন পর একজন এগিয়ে এলো আবু জামশেদের দিকে, এর বয়স ত্রিশের উপরই হবে, ধারনা করল শাহরিয়ার।

"স্যার, আমাদের কাজ শেষ," লোকটা বলল।

"শেষ?" চিন্তার জগতে ডুবে ছিলেন আবু জামশেদ, সংবিত ভাঙল, "শাহরিয়ার, ওর সাথে পরিচিত হও, এভিডেন্স কালেকশন গ্রুপের টিম লিডার, সাইফুল ইসলাম।"

শাহরিয়ার হাত মেলাল সাইফুলের সাথে।

"সাইফুল, এই কেসটার দায়িত্বে থাকবে শাহরিয়ার, তুমি ওকে রিপোর্ট করবে, কি কি পেয়েছে ক্রাইম সীনে, তা নিয়ে, ওকে?"

"জি, স্যার।"

"আমরা কি তাহলে নীচে চলে যাবো?" জিজ্ঞেস করলো সাইফুল, "আমরা শুধু কিছু স্যাম্পল জোগাড় করেছি, এগুলো যতো শিগগিরি সম্ভব ল্যাবে পরীক্ষা করাতে হবে।"

"যাও, তোমরা যাও," আবু জামশেদ বললেন, "আর নীচে, মি. সোলাইমান আলীকে পাবে, উনাকে বলো একটু উপরে আসতে।"

"জি, আচ্ছা," বলে বেরিয়ে গেল সাইফুল।

এবার শাহরিয়ারের দিকে তাকালেন আবু জামশেদ।

"তোমার কিছু বলার ছিল?"

"জি, স্যার।"

"বলে ফেলো," আবু জামশেদ বললেন।

"স্যার, আমার ধারনা এই খুনটা আজমল চৌধুরির খুনের সাথে রিলেটেড," শাহরিয়ার বলল।

"সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ করে পা থেকে পায়ের পাতা যেভাবে আলাদা করেছে, এই খুনি তো পুরো সাইকোপ্যাথ," বললেন আবু জামশেদ।

"দুটো খুনের মধ্যে কোন একটা লিংক আছে, লিংকটা খুঁজে বের করতে হবে," শাহরিয়ার বলল।

"সেই লিংকটা কি সেটাই জানতে চাচ্ছি," আবু জামশেদ বললেন, তাকে কিছুটা অধৈর্য্য মনে হলো, হয়তো তিনি আশা করছিলেন শাহরিয়ার জানে, লিংকটা কী।

"লিংকটা আমি জানি না, তবে বের করে ফেলতে পারবো," শাহরিয়ার বলল।

শাহরিয়ারের কাঁধে হাত রাখলেন আবু জামশেদ, "মাঝে মাঝে ইনট্যুইশন কাজে লাগে, তবে সব সময় না," এগিয়ে গিয়ে লাশের সামনে দাঁড়ালেন, "তোমার ধারনা খুব একটা ভুল নয়। এই ভদ্রলোক, আজমল চৌধুরির ফ্রেন্ড, ইফতেখার উদ্দিন রুবেল, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা।"

'রুবেল' নামটা কোথাও শুনেছে বলে মনে হতে লাগল শাহরিয়ারের, হ্যা, শুনেছে, জানে আলম আর আজমল চৌধুরির চাচা দুজনেই রুবেল নামটা বলেছিল তাকে।

"এছাড়া আরো একটা দরকারি তথ্য শেয়ার করি," আবু জামশেদ বললেন, "রুবানা মেয়েটা পুলিশের কাছে দাবি করেছে রুবেল ছিল তার স্বামি," একটু থামলেন আবু জামশেদ, "কিন্তু এই দাবির পক্ষে কোন প্রমান দিতে পারে নি, বরং যতোটুকু ধারনা করা হচ্ছে, মেয়েটা মি. রুবেলের রক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই না। ভদ্রলোকের স্ত্রি এবং দুই সন্তান আছে, তারা এখন ঢাকায় আছে। যে কোন সময় চলে আসবে।"

কী একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে অনুমান করতে পারছিল শাহরিয়ার। স্বামিকে কোন রক্ষিতার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করা যে কোন মেয়ের জন্যই একটা যন্ত্রনাদায়ক অভিজ্ঞতা, এই কষ্ট সে সারাজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

সোলাইমান আলী উপরে চলে এসেছেন, তার সাথে রুবানার বিষয়ে কিছু কথা বললেন আবু জামশেদ, কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে মেয়েটাকে রিমান্ডে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও ধারনা করা হচ্ছে মেয়েটা নিজ হাতে এই খুন করে নি, কিন্তু মি. রুবেলের মৃত্যুর অনেকক্ষন পর সে পুলিশকে জানিয়েছে। এটাই সন্দেহজনক, এছাড়া খুনির সাথে মেয়েটার আঁতাত থাকতে পারে। সেই হয়তো খুনির জন্য দরজা খুলে দিয়েছে, খুনি অপ্রস্তুত অবস্থায় রুবেলকে পেয়ে খুন করে পালিয়েছে। আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোয় খবর নিতে হবে, তবে যতোটুকু শুনেছেন, তাতে গুলির শব্দ কেউ পায় নি, খুনি সম্ভবত সাইলেন্সার ব্যবহার করেছে।

সোলাইমান আলীর কাছ থেকে আরো চমৎকার একটা তথ্য পেলেন, রাতে একজন লোক পিজ্জা ডেলিভারি দিতে এসেছিল। এই তথ্য পাওয়া গেছে নিচের দারোয়ানের কাছ থেকে। রুবানা প্রায়ই পাশের ফাস্টফুডে পিজ্জা অর্ডার করতো। তাই সে আটকায়নি। ডেলিভারি দিয়ে লোকটা কখন বেরিয়ে গেছে সেটা অবশ্য বলতে পারে নি দারোয়ান, সে নাকি বেশ কিছুক্ষন বাথরুমে ছিল। পুরো ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে গতরাতে পিজ্জা ডেলিভারি দেয়ার কোন নমুনা পাওয়া গেল না।খুনি সম্ভবত পিজ্জা ডেলিভারি দেয়ার ভান করে উপরে চলে এসেছিল, তারপর দরজা খুলতেই রুবেল সাহেবকে খুন করে পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটা ঘটতে খুব বেশিক্ষন সময় লাগেনি।

রুবানা তার বেডরুমেই ছিল, খোলা জানালা দিয়ে সকালের রোদ আসছে, আবু জামশেদের পেছন পেছন রুমে ঢুকল শাহরিয়ার, সাথে সোলাইমান আলীও আছেন। হেঁটে রুবানার কাছে চলে গেলেন আবু জামশেদ, একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন রুবানার মুখোমুখি, রুবানা তাকিয়েছে তার দিকে, তবে তার মনোযোগ এখন অন্য কোথাও।

"আমরা জানি আপনি মি. রুবেলের বিবাহিত স্ত্রি নন," আবু জামশেদ বললেন, "উনার সাথে তাহলে আপনার সম্পর্ক কি?"

উত্তর দিলো না রুবানা, কান্না থামানোর চেষ্টা করছে, পারছে না, পুরোটা অভিনয় হতে পারে, ভাবলেন আবু জামশেদ, জীবনে অনেক অপরাধির কান্না দেখেছেন, এমনভাবে কথা বলেছে, কেঁদেছে সেসব অপরাধি মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভুল মানুষকে সন্দেহ করেছেন তিনি। সেসব ভুল ভাঙতেও সময় লাগেনি। একটা অনুসিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, চোখের পানি কিংবা কোন ধরনের আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না, সেটা শুধু দূর্বল হৃদয়ের পরিচায়কই নয়, তাতে অনেক সময় আসল অপরাধি ধরা-ছোয়ার বাইরে চলে যেতে পারে। এবার অন্তত সেরকম ভুল হবে না, নিশ্চিত তিনি।

রুম থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার, একটা সিগারেট ধরাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রুবানার সাথে আবু জামশেদের কথাগুলো রেকর্ড হচ্ছে, সেগুলো পরে শুনে নেবে। এভিডেন্স কালেকশন টিমের সদস্যরা সোফায় বসে আছে, কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। শাহরিয়ারকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলো সাইফুল।

"শাহরিয়ার সাহেব," পেছন থেকে বলল সাইফুল, "এটাই কি আপনার প্রথম কেস?"

"জি," শাহরিয়ার বলল, এই কেসটা সে একাই দেখছে তা নয়, আবু জামশেদই সব এখানে, তবু বলল, "হ্যা, এটাই প্রথম।"

"আমাদের অবশ্য এই ডিপার্টমেন্টে আসার পর প্রথম কাজ," সাইফুল বলল, "আমরা আগেও ক্রাইম সীন নিয়ে কাজ করেছি, কিন্তু এখন আমাদের হাতে অনেক ইকুইপমেন্ট আর টেকনোলজি, আশা করছি ভালো কাজ দেখাতে পারবো।"

"হু," কী বলবে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না শাহরিয়ার, সাইফুল লোকটা দেখতে ভালো, কথাবার্তা এবং আচরনও বন্ধুসুলভ, কিন্তু অভাবটা তার নিজেরই। শুরুতেই কারো সাথে মন খুলে কথা না বলতে পারাটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অনেকক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছে এবং তাতে খুব একটা আপত্তি নেই শাহরিয়ারের। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, হাজার চেষ্টা করেও তা জয় করা যায় না।

"ক্রাইম সীন হচ্ছে আয়নার মতো একটা ব্যাপার, এখানে ঘটনার সব কিছু লেখা থাকে, শুধু খুঁজে বের করে দেখার চোখ দরকার," সাইফুল বলল আবার।

বেশ দার্শনিকের মতো হয়ে গেল কথাটা, ভাবল শাহরিয়ার।

"আপনার নিশ্চয়ই সেরকম চোখ আছে," শাহরিয়ার বলল কিছুটা সময় নিয়ে।

"জি, আছে," সাইফুল বলল, কথাগুলো অহংকারি শোনালেও চুপ করে থাকল শাহরিয়ার, "তবে আমাদের কাজ তো এটুকুতেই সীমাবদ্ধ, বাকিটা করার জন্য আপনারা আছেন," যোগ করল সাইফুল।

"হু, তা ঠিক," শাহরিয়ার বলল, বুঝতে পারছে শুধু শুধু বেহুদা কথা বলার জন্য সাইফুল এখানে আসে নি, আরো কিছু বলার আছে লোকটার, "সিগারেট নিন?"

"অনেক কষ্টে ছেড়েছি, কানে ধরেছি, আর সিগারেট খাবো না, তিনমাস হয়ে গেল," বলে হাসল সাইফুল, "আর একটা কথা, এ ব্যাপারে আমি অনেকটাই নিশ্চিত, আপনি পারবেন।"

মনে মনে হাসল শাহরিয়ার, এবার হয়তো আসল প্রসঙ্গে আসবে লোকটা।

"আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম," সাইফুল বলল, "যদি কিছু মনে না করেন।"

"বলুন না," শাহরিয়ার বলল, উৎসাহের সাথে।

আশপাশে তাকাল সাইফুল, সহকর্মিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত, আবু জামশেদ আর সোলাইমান আলী বেডরুমে, রুবানার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, আর কেউ নেই, "চোখ কান খোলা রাখবেন সবসময়, যা বলা হবে তাই বিশ্বাস করবেন না।"

"আপনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন না হুমকি?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার, সদ্য পরিচিত হওয়া একজন লোকের কাছে এরকম কথা শুনতে ভালো লাগে নি তার কাছে।

"আপনি আমার সহকর্মি," সাইফুল বলল, চাপা স্বরে, "আপনাকে হুমকি দিতে যাবো কোন দুঃখে।"

"আপনি কি স্যারের কথা কিছু বোঝাতে চাইছেন? উনি যা বলবেন, তা বিশ্বাস করবো না?" শাহরিয়ার বলল, বিস্মিত কণ্ঠে।

"আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, শাহরিয়ার সাহেব," বলে সাইফুল এগিয়ে এসে শাহরিয়ারের হাত ধরল, "বিচারবুদ্ধিমতো কাজ করবেন।"

বিরক্ত লাগছিল শাহরিয়ারের, উপদেশ শুনতে কখনোই ভালো লাগে নি তার, এখনো লাগছে না। ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়ার পর এমন কিছু চোখে পড়ে নি, কিংবা আবু জামশেদ সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি। এখন পর্যন্ত লোকটাকে ভালো লেগেছে, যতোটুকু পারছে শেখাচ্ছে, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার অভাব দেখেনি। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকাল। কিছু উৎসুক জনতা বিল্ডিংয়ের নীচে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, এদের কৌতুহলের শেষ নেই, এই লোকগুলোই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে রাস্তা কাটা দেখে, চর্ম-যৌনরোগ চিকিৎসার অভাবনীয় ঔষধ বিক্রির জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়ানো হকারের কথায় মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা, ক্বচিৎ কদাচিৎ সেই ঔষধ এরা কিনেও ফেলে, তারপর বুঝতে পারে অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, এরাই আবার ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে, অল্পের জন্য বাস মিস করলে পেছনে পেছনে দৌড়ায়, এই লোকগুলো দেশের সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে, এটার আরেকটা প্রধান কারন হতে পারে যে এরা নিজেদের কাজকে গুরুত্ব দেয় না এবং সেই সাথে বাকি সবার কাজকেও গুরুত্বহীন মনে করে।

সাইফুল গিয়ে বাকি তিনজনের সাথে যোগ দিল, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বেডরুমের দিকে এগুল শাহরিয়ার। কলিং বেল বেজে উঠল এই সময়, সাইফুল গিয়ে দরজা খুলে দিল। যে ঢুকেছে তাকে মহিলা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না শাহরিয়ার, ত্রিশের কোঠায় বয়স হবে, ফর্সা, গোলগাল মুখ, উদভ্রান্ত চেহারায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি মেঝেতে পড়ে থাকা লাশের দিকে। নিজেকে নিয়ন্ত্রনে নেয়ার অনেক চেষ্টা করল, তারপর জ্ঞান হারাল।

বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না ভদ্রমহিলা ইফতেখার উদ্দিনের স্ত্রি। সবাই ধরাধরি করে জ্ঞানহীন দেহটাকে সোফায় শুইয়ে দিল।

আবু জামশেদকে জানাতে হবে, মৃতদেহ এখানে আর বেশিক্ষন রাখা ঠিক হবে না। পোস্টমর্টেম করাতে হবে, এভিডেন্স টিম যা সংগ্রহ করেছে তা অ্যানালাইসিস করতে হবে। কাজ অনেক বাকি। আজমল চৌধুরির খুনের কিনারা করা যায়নি এখনো, এই কেসটার কী হবে মাথায় ঢুকছিল না শাহরিয়ারের।

অধ্যায় ২৫

সকালে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছে তুষার। নাস্তা করে যখন বারান্দায় গিয়ে বসল, তখন প্রায় বারোটার কাছাকাছি বাজে। কয়েকদিন ব্যস্ততায় কাটলেও এখন ব্যস্ততা কমে এসেছে। বসে বসে পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে, খবরের ধরনে এই এতো বছরেও খুব একটা পরিবর্তন আসে নি, সেই আগের মতোই রাজনৈতিক গন্ডগোল, ব্যাংকে সমস্যা, খুন, ধর্ষন আর রাহাজানি।

ক্রিস্টিনা আর সুমনা যথারীতি ঘুরতে বের হয়েছে, সুমনার বাচ্চা দুটো উঠানে খেলছে, দেখতে ভালো লাগছে, বাবা বাজার থেকে ফেরেন নি, মা রান্নাঘরে। বছরে অন্তত একবার এরকম অলস সময় কাটানোর সুযোগ সবারই পাওয়া দরকার। প্রতিদিনের একঘেয়ে কাজ-কারবার থেকে দূরের কয়েকটা দিন সবার প্রাপ্য। মোবাইল ফোনটা টেবিলের উপরেই ছিল, বেজে উঠার সাথে সাথেই রিসিভ করল। মশিউরের ফোন।

"হ্যালো, মশিউর," তুষার বলল, "তুই এতো সকালে?"

যদিও বারোটার কাছাকাছি বাজে, তবে যতোটুকু চেনে মশিউরকে এটাই ওর জন্য অনেক সকাল।

"একটা দুঃসংবাদ আছে," ওপাশ থেকে চাপা গলার মশিউর।

কথাটা শুনেই শক্ত হয়ে গেল তুষার, দুঃসংবাদ শোনার জন্য তৈরি। মনের মধ্যে বেশ কয়েকটা আশংকা ঘোরাঘুরি করছে।

"বল।"

"রুবেল নেই!"

কথাটা শুনে কিছু বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তুষার, মোবাইল ফোনটা হাতে ধরা আছে, কিন্তু সময় যেন স্থির হয়ে গেছে হঠাৎ করে। রুবেল নেই! এটা কিভাবে সম্ভব! রুবেলের হাসিমুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এই সেদিনও না অনেক কথা হলো!

"তুষার শুনতে পাচ্ছিস?"

মশিউরের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল তুষার, কিন্তু সাড়া না দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। পুরো পৃথিবীটাই অর্থহীন হয়ে যেতে শুরু করেছে হঠাৎ করে।

"শুনলাম," তুষার বলল কোনমতে।

"দোস্ত, আমাদের সাবধান থাকতে হবে," ওপাশ থেকে বলল মশিউর, কণ্ঠস্বরটা কেমন মেকি বলে মনে হচ্ছে তুষারের কাছে। যেন জোর করে ভয় ঢুকাতে চাইছে তুষারের মধ্যে।

"তোর তো সাবধান থাকার প্রয়োজন দেখছি না," চাপা গলায় বলল তুষার, রুবেলের মুখটা বারবার ভেসে উঠছে।

"বুঝলাম না, তুই কি আমাকে সন্দেহ করিস?"

"হু, করি," তুষার বলল।

"ওকে, তাহলে পুলিশের কাছে যা," ওপাশ থেকে রেখে দিল মশিউর।

চুপচাপ মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে বসে রইল তুষার। রুবেলের মৃত্যুর খবরটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে, সামান্য হুমকি মনে হয়েছিল সেটা এখন রীতিমতো ভয়ানক আকার ধারন করেছে। এর পেছনে মশিউর থাকতে পারে, থাকতে পারে আরিফও। তবে এই মুহূর্তে আরিফকে বিবেচনার বাইরে রেখেছে তুষার, কিংবা মশিউর'ই বা কী করে হয়! সামান্য কথা-কাটাকাটি কিংবা সবার সামনে অপমানের শোধ কেউ এভাবে নিতে পারে না। মশিউরের সাথে এরকম ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। যতোটুকু মনে হচ্ছে এবার মশিউরের পালা, কিংবা আমার, ভাবল তুষার।

আরিফের সাথে আরেকবার দেখা করা দরকার, ওকে হিসেবের বাইরে রাখা ঠিক হবে না। হয়তো নিজে করছে না, কাউকে দিয়ে করাচ্ছে। যে রাগ-ঘৃনা দেখেছে সেদিন, তাতে আরিফের পক্ষে কাজটা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

এসব কথা অন্য কারো সাথে শেয়ার করা যাচ্ছে না, পরামর্শ দেয়ার কেউ নেই। ক্রিস্টিনা জানতে পারলে এখনই ফেরার তোড়জোড় শুরু করে দেবে, আজমলের মৃত্যুর খবর জেনেছে বাসার সবাই। দূর্ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে, এবার রুবেলের মৃত্যুর খবর জানলে নিশ্চয়ই সেটাকে স্বাভাবিকভাবে নেবে না।

আজকের দিনটা এভাবে শুয়ে বসে কাটানোর ইচ্ছে ছিল। হলো না, বেরুতে হবে। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, কিছু একটা করতে না পারলে বাকি দুজনের মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

ভেতরে ঢুকল তুষার, ড্রইং রুমের টেলিফোনটা বাজছে। সবাই এখন মোবাইলে কল করে, এই নাম্বারে বাবার পুরানো কিছু বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজন যোগাযোগ করে এখনও। রিসিভার তুলল তুষার।

"হ্যালো, তুষার আছে?"

ওপাশের কণ্ঠস্বরটা চিনতে খুব একটা সমস্যা হলো না তুষারের।

"তুষার বলছি, কি খবর আরিফ? এই নাম্বার এখনো তোর মনে আছে।"

"আমার স্মৃতি আমার সাথে কোনদিন প্রতারনা করে নি, তুই তো জানিস।"

"হু, জানি।"

"এরপর কার পালা?"

"সেটা তোর উপর নির্ভর করছে," হেসে বলল তুষার, "তুই কাকে বেশি সময় দিবি সেটা তুই জানিস।"

"আমি সবচেয়ে সহজ টার্গেট," আরিফ বলল ওপাশ থেকে, "এরপর বোধহয় আমার পালা।"

"সত্যি না বানিয়ে বানিয়ে বলছিস?"

"হুমকি শুধু তোদের চারজনকে দেয়া হয়নি," আরিফ বলল, হাসির শব্দ শুনল তুষার, "আমাকেও দেয়া হয়েছিল, তবে ভাগ্য ভালো আমি ফোনটা রিসিভ করিনি।"

"বুঝলাম না," বিরক্ত কণ্ঠে বলল তুষার।

"তুই যে সময়ের কথা বললি, ঠিক সে সময়ে আমার কাছ থেকেও অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল," আরিফ বলল, "আমার নাম্বার খুব বেশি মানুষের কাছে নেই।"

"তাতে কি?"

"কয়েকবার ফোন এলেও আমি রিসিভ করি নি, ব্যস্ত ছিলাম," আরিফ বলল, "পরে আর কল আসেনি।"

"এটা তোর কল্পনা," তুষার বলল, "তোকে কোন হুমকি দেয়া হয়নি।"

"হু, কল্পনাই ভেবেছিলাম শুরুতে," আরিফ বলল, "আজ একটা চিঠি পেয়েছি। নিজের কল্পনাশক্তিতে আমি অভিভূত!"

"কী লিখেছে?"

"সেটা তুই এলে বলবো," আরিফ বলল।

"আচ্ছা, আমি আসবো, কাল দুপুরে," তুষার বলল।

"আয়, তোর সাথে অনেক কথা বাকি আছে," লাইন কেটে দেয়ার আগে বলল আরিফ ওপাশ থেকে।

রিসিভার রেখে সোফায় বসল তুষার। আরিফের এই হঠাৎ পরিবর্তন বুঝতে পারছে না। সত্যিই কি কোন চিঠি পেয়েছে নাকি মিথ্যে বলে নিয়ে যেতে চাইছে ওর বাসায়? এভাবে ফোন করে বাসায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করতে চায় নাকি? মানুষের মন অদ্ভুত জটিলতায় ভরা, একসময়ের চেনা প্রানবন্ত আরিফ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, এখনকার লেখক আরিফ অচেনা একজন মানুষ, হুইলচেয়ারে যার সময় কাটে, কল্পনার জগত ছাড়া পৃথিবীর কোন কিছুর সাথেই ওর লেনদেন নেই, সংসার-সামাজিকতা কিংবা স্নেহ-প্রেম, মায়া-মমতার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। এরকম একজন মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। অনেক কিছু।

অধ্যায় ২৬

অফিসের কনফারেন্স রুমটা চমৎকার, বেশ প্ল্যান করে বানানো হয়েছে বোঝা যায়। দেয়াল জুড়ে সাদা বোর্ড, একপাশে বেশ বড়সড় একটা প্রজেক্টরের পর্দা, ছোট একটা ডায়াস, উল্টোদিকে সারি করে রাখা চেয়ার, পুরো অফিস ওয়াই-ফাই করা, এই রুমটাও তার বাইরে নয়। এখন পর্যন্ত রুমটা সেভাবে ব্যবহার করা হয়নি, আজই প্রথম সবাইকে কনফারেন্স রুমে ডেকেছেন আবু জামশেদ। তিনি ডায়াসে দাঁড়িয়ে আছেন, বাকি সবাই চেয়ারে বসা, সবাই বলতে শাহরিয়ার, এভিডেন্স কালেকশন-অ্যানালাইসিস টিমের চারজন, আর তানভীর হোসেন, এই কয়জন। পুরো রুমে পিনপতন নীরবতা, এসির ঠান্ডা বাতাস সরাসরি লাগছিল শাহরিয়ারের মুখে। ঠান্ডা বাতাসে অস্বস্তি লাগলেও রুমের নীরবতা ভাঙতে ইচ্ছে হলো না।

রুমের সব বাতি নেভানো হয়েছে, প্রজেক্টরের পর্দায় আজমল চৌধুরির মৃতদেহ দেখানো হচ্ছে। একটার পর একটা ছবির স্লাইড শো, এই ছবিগুলো আবু জামশেদ জোগাড় করেছেন, ওসি কামরুল শুরুতে ছবিগুলো দিতে চায় নি, উপরমহল থেকে ফোন করাতে হয়েছে। ঘটনাস্থল দেখে এসেছিল শাহরিয়ার, এবার ছবিগুলো দেখে ক্রাইমসীনটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে আবার।

বেশ অনেকগুলো ছবি একের পর এক দেখানো শেষ হয়েছে, ডায়াসে দাঁড়িয়ে সামনের মনোযোগী দর্শকদের দেখছিলেন আবু জামশেদ, এবার মুখ খুললেন।

"এটা আমাদের প্রথম কেস," আবু জামশেদ বললেন, "জনাব আজমল চৌধুরি, দেশের প্রথমসারির একজন ধনী ব্যক্তি, তার মৃতদেহ এবং ক্রাইম সীনটা আপনারা দেখলেন, এবার কিছু হাইপোথিসিস নিয়ে কথা বলি," সাদা বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন আবু জামশেদ, বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে লিখলেন, "প্রথম হাইপোথিসিস ছিল, তিনি ছিনতাইকারীদের শিকার," পায়চারি করছেন তিনি, "এটা শুরুতেই বাদ, কারন ভদ্রলোকের ম্যানিব্যাগ কিংবা অন্যান্য কিছু চুরি হয়নি, এমনকি তার সাথে যে মেয়েটা ছিল, খুনি, আজমল চৌধুরির প্যান্টের পকেট থেকে টাকা নিয়ে ঐ মেয়েটাকে দিয়েছিল," গলা পরিস্কার করে নিলেন, "তারমানে দাঁড়ায়, ছিনতাই কারীর কাজ নয় এটা, তাহলে এতোগুলো টাকা অচেনা একটা মেয়েকে দিয়ে দিতো না, বাই দ্য ওয়ে, শাহরিয়ার, মেয়েটার কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?"

সামনেই বসা ছিল শাহরিয়ার, বাকিরা তাকাল শাহরিয়ারের দিকে, সবাই উত্তর শোনার জন্য উদগ্রিব।

"না, খোঁজ পাই নি এখনো, তবে শিঘ্রীই পেয়ে যাবো," কোনমতে বলল শাহরিয়ার।

"ওকে, খোঁজ নাও তাড়াতাড়ি," বললেন আবু জামশেদ, "এবার দ্বিতীয় হাইপোথিসিস, তিনি কোন ব্যবসায়িক শত্রুতার শিকার, অনেক বড় ব্যবসা ছিল তার, স্টিল মিল, গার্মেন্টস ব্যবসা, রড-সিমেন্টের ব্যবসা, ঠিকাদারি, এরকম আরো অনেক কিছু, ব্যবসায়িক কোন দ্বন্ধ থেকেও খুন হতে পারেন ভদ্রলোক," একটু থামলেন, "তবে এরচেয়ে আরো বড় একটা কারন হতে পারে পুরানো কোন শত্রুতা, ওর বন্ধু-বান্ধবদের কেউই এই কাজটা করতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহের তালিকায় আছে এই ভদ্রলোক," প্রজেক্টরের পর্দায় মশিউরের ছবি ভেসে উঠল, চোখে সানগ্লাস, হাতে সিগারেট, হাস্যোজ্জল একটা ছবি, "এই ভদ্রলোকের নাম মশিউর রহমান, আজমল চৌধুরির স্কুল ফ্রেন্ড, যে সবার সামনে আজমল চৌধুরিকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত আরেকজন ব্যক্তি, তার নাম ইফতেখার উদ্দিন রুবেল, যার লাশ আমরা আজ সকালেই পেয়েছি।"

"তাহলে মশিউর রহমানকে ধরা হচ্ছে না কেন?" জিজ্ঞেস করল তানভীর হোসেন, সবাই একযোগে তাকাল, কিছুটা বিব্রত মনে হলো তানভীরকে।

"সে জায়গায় আসছি, তানভীর," আবু জামশেদ বললেন, "আমাদের হাতে কোন প্রমান নেই, স্রেফ ধারনার উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না, অন্তত..."

"স্যার, এই লোকের উপর অভিযোগ আছে যে সে মৃত ব্যক্তিতে হুমকি দিয়েছিল, সেটাই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা," তানভীর বলল আবার।

"সমস্যা হচ্ছে," গলা পরিস্কার করে নিলেন আবু জামশেদ, "হুমকির বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার। সত্যিই কি হুমকি দিয়েছিল মশিউর নাকি কেউ ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।"

"জানে আলম আর গিয়াস চৌধুরি এই দুজনের কাছ থেকে এই হুমকির কথা শোনা গেছে এবং এই দুজনের পুরানো রেকর্ড আমার কাছে আছে," আবু জামশেদ বললেন, "গিয়াস চৌধুরির ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে মশিউরের সাথে, মশিউরের কারনেই গিয়াস চৌধুরির কিছু অপকর্ম ফাঁস হয়ে যায় আজমল চৌধুরির কাছে, সে কারনে পৈত্রিক বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় গিয়াস চৌধুরিকে, এটা অবশ্য অনেক আগের ঘটনা, কাজেই গিয়াস চৌধুরি কোন কিছু হলেই যে মশিউরকে ফাঁসাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, বাকি রইল জানে আলম," পায়চারি করছেন আবু জামশেদ, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন সামনে বসা সহকর্মিদের দিকে, "জানে আলম একটা টাউট, বাটপার, মিথ্যে স্বাক্ষী, জাল দলিল, দালালীসহ যাবতীয় কুকর্ম করে বেড়ায়, ওর কথার কোন ভিত্তি নেই আমার কাছে।"

"তাহলে এখন আমরা কি করবো?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

"তুমি ঐ মেয়েটার খোঁজ বের করো, তাহলেই হবে, আর তানভীর," তানভীরের

দিকে তাকালেন আবু জামশেদ, "ফিল্ড ওয়ার্কে তোমার প্রথম কাজ হবে মশিউরকে চোখে চোখে রাখা। আমার মনে হয় ঘটনা এখানেই থেমে থাকবে না।"

"ইফতেখার সাহেবের কেসের কি হবে?" আবারও প্রশ্ন করলো শাহরিয়ার।

"দুটো কেস একই সুতোয় গাঁথা," আবু জামশেদ বললেন, "প্রথমটা সমাধান করতে পারলে দ্বিতীয়টা আপনাআপনি মিলে যাবে। তারপরও, আমি এখনো পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাই নি, এভিডেন্স অ্যানালাইসিসও শেষ হয়নি, রুবানা মেয়েটাকে পুলিশ গ্রেফতার করে রিমান্ডের আবেদন করেছে, ওর কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য আশা করছি, হয়তো আগামিকালের মধ্যে কাজ শুরু করা যাবে।"

"শেষ একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার?" তানভীর হোসেন বলল।

"বলো," আবু জামশেদ বললেন।

"আমি কি একাই কাজ করবো, না সাথে কেউ থাকবে?"

"তুমি আর শাহরিয়ার দুজন আলাদা আলাদাভাবে কাজ করবে," আবু জামশেদ বললেন, "প্রয়োজনমতো দুজন দুজনকে সাহায্য করবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সুনামের প্রশ্ন জড়িত এখানে। দ্রুত কেস সলভ করতে না পারলে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে আমাকে।"

ক্ষনিকের নীরবতা নেমে এলো কনফারেন্স রুমে।

"আজকের মতো ডিসমিস, সবাই কাজে নেমে পড়ো," বললেন আবু জামশেদ, রুমের বাতি জ্বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, এক এক করে বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

আবু জামশেদ রয়ে গেলেন। প্রজেক্টরের পর্দায় রুবেলের মৃতদেহের ছবি দেখছেন। তার চোখে-মুখে বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর মতো কঠিন শাস্তি এই মানুষটা কেন পেল? খুব বড় কোন পাপ করেছিল জীবনে? হতে পারে। এর অতীত খুঁড়ে দেখতে হবে। সেই অতীতেই আছে এই খুনের হিসেব। তৃতীয় হাইপোথিসিসটা ওদের বলেন নি, এই কাজটা একজন সাইকোপ্যাথের, যে হিসেব করে করে খুন করছে এবং এক এক করে বার্তা রেখে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে পুরো খবর দেয়া হয়নি, বিশেষ করে খুন করার পর পায়ের পাতা বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়েছে। চেপে যাওয়ার একটাই কারন, এই ধরনের খবর ছাপা হলে তাতে জনমনে আতংক ছড়াবে, এতে খুনি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে, কোন সন্দেহ নেই।

নিজের রুমে চলে এলেন কিছুক্ষনের মধ্যে। তারপর ব্যস্ত হয়ে গেলেন ফোনে, মোবাইলে আর কম্পিউটারে। একাকী জীবনে যতো বেশি ব্যস্ত থাকা যায় ততোই ভালো, অতীত ভুলে থাকার জন্য এরচেয়ে ভালো কোন পন্থা জানা নেই তার।

কনফারেন্স রুম থেকে বের হয়ে নিজের ডেস্কে ফিরল শাহরিয়ার, আজমল চৌধুরির সাথে যে মেয়েটা ছিল সেই মেয়েটার খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি। গোল্ডেন

ট্রায়াঙ্গল নামে একটা বারের কথা বলেছিল জানে আলম। সেই বারে যেতে হবে আজ। বারগুলো সাধারনত সন্ধ্যার পরপর জমতে শুরু করে। কাজেই এখন সেখানে গিয়ে লাভ নেই। এরচেয়ে ডেস্কে কোন কাজ থাকলে তা সেরে নেয়া যেতে পারে। রুমের অন্য পাশের ডেস্কে তানভীর হোসেন বসে আছে, ওকে আগেও পছন্দ হয়নি, আজকে ওর কথাবার্তা শুনতে আরো বিরক্ত লেগেছে, কেমন নাকি গলার কথা বলে আর কথা বলার ভঙ্গিটাও খুব একটা ভালো ছিল না, বেয়াদপ ধরনের একটা মানুষ। এই ছেলে এরকম একটা ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেল কী করে!

তানভীর হোসেন এক ফাঁকে তাকিয়েছে তার দিকে, বুঝতে পারছে শাহরিয়ার, এই ছেলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, আবার আবু জামশেদের কথার বাইরে যাওয়ারও উপায় নেই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল, পুলিশের কয়েকটা গাড়ি ঢুকতে দেখল অফিসে, দুই পুলিশ কর্মকর্তা সোলাইমান আলী আর কামরুল ইসলাম সরাসরি ঢুকে গেল আবু জামশেদের রুমে। জরুরি কোন মিটিং নিশ্চয়ই। ওদের হাঁটাচলার মধ্যে তাড়াহুরার একটা ভাব লক্ষ্য করেছে শাহরিয়ার।

কোন সূত্র পেয়েছে নিশ্চয়ই, ব্যাপারটা জানার জন্য নিজের মধ্যে অস্থিরতা টের পাচ্ছে। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে বসের রুমের দিকে তাকাচ্ছে। তানভীর তাকিয়ে আছে তার দিকে, ওর চোখে কেমন সন্দেহের দৃষ্টি। ভেতরে ঢুকে কম্পিউটারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শাহরিয়ার, মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্য এরচেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

ইফতেখার উদ্দিন রুবেলের ফাইলটা খুলল। এই ভদ্রলোক সম্পর্কে গিয়াস চৌধুরি বলেছিলেন, ভালো ছেলে, ব্যাংকে চাকরি করে। কতোটা ভালো ছেলে সেটা পরিস্কার হয়ে গেছে।

রক্ষিতার বাসায় যার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রি আর দুই সন্তানের কথা ভাবল, ভদ্রমহিলা হয়তো কোনদিনই স্বামিকে মাফ করতে পারবেন না, আবার একই সাথে সারাজীবন তার জন্য কাঁদবেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার।

অধ্যায় ২৭

কাউকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই পৃথিবীতে। সেই কষ্ট অনেক প্রকার হতে পারে, তবে শারীরিক কষ্ট দেয়ার মধ্যেই বেশি আনন্দ। মাঝে মাঝে মনে হয় একধরনের অশরীরী ক্ষমতা ভর করেছে তার উপর, নইলে বাকি পৃথিবীর কাছে যে কাজটা খুবই খারাপ সে কাজটা করেই আনন্দ পায় সে।

ঘরটা প্রায় অন্ধকার, ছোট একটা মোমবাতি জ্বলছে শুধু। সেই মৃদু আলোয় আবছাভাবে একজনকে পায়চারি করতে দেখা যাচ্ছে। বিড়বিড় করে একমনে কিছু একটা বলছে, মাঝে মাঝে থামছে, দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেয়ালে অনেক লেখাজোখা, পত্রিকার কাটিংয়ে দেয়াল ভর্তি হয়ে আছে।

লোকটার হাতে একটা মোবাইল ফোন, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কী মনে করে মোবাইল ফোনটা মেঝেতে ছুঁড়ে মারল। নিমিষেই চৌচির হয়ে গেল ফোনটা। এককোনায় ছোট একটা বিছানা, বালিশ, চাদর সব এলোমেলো হয়ে আছে, মশারিটা একপাশে অর্ধেক খোলা অবস্থায় ঢেকে রেখেছে বিছানার কিছুটা অংশ। বালিশটা তুলে নিয়ে দুই হাত দিয়ে টেনে টেনে ছিড়ল। বেশ কিছুক্ষন হাঁপাল, তারপর কাঁদতে শুরু করল।

মাত্র দুটো কাজ শেষ হয়েছে। পথ এখনো অনেক বাকি। ধৈর্য্য হারা হলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা করে প্ল্যান করে এগুতে হবে। এক ফুতে মোমবাতি নিভিয়ে দিল সে। ঘুমানো দরকার, দিনের পর দিন না ঘুমানোতে দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সব উল্টেপাল্টে গেছে, এক ঘুমে তা ঠিক হবে না। তবে সেরকম শান্তির ঘুম ঘুমানোর সময় এখনো আসেনি। এখনো না।

অধ্যায় ২৮

আজকে আরিফের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন রুবেলের জানাজায় সামিল হওয়া। রুবেলের বাসা বনানীতে, এখানেই স্ত্রিকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে থাকতো। পুরো ফ্ল্যাট ভর্তি লোকজন, বেশিরভাগই রুবেলের শ্বশুড়বাড়ির দিকের আত্মীয়, কান্নাকাটি চলছে, এরকম শোকাবহ পরিবেশে চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল তুষার। লাশ নিয়ে আসা হয়েছে সকালে, দুপুরে বনানী কবরস্তানে কবর দেয়া হবে। রুবেলের বাবা-মা দুজনই মারা গেছেন, ছোট ভাই আর বোন ঢাকার বাইরে থাকে, ওরা সকালে এসে পৌছেছে। এই দুজনের সাথে অল্পস্বল্প পরিচয় ছিল, কিন্তু আজকের দিনে সে পরিচয়ের সূত্র ধরে সান্ত্বনা দেয়ার অবস্থায় নেই তুষার।

বন্ধু হিসেবে তুলনা ছিল না রুবেলের, সব কাজে ছিল সমান উৎসাহ, দৌড়ঝাঁপ হৈ-হুল্লোড়ে সবার আগে, বন্ধুরা তাই পছন্দও করতো। এখন বন্ধুরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পত্র-পত্রিকায় খবর এসেছে রুবেলের মৃত্যুর, এমন মৃত্যু কেউ আশা করে নি, অনেকে হয়তো কিছুটা বিব্রতও। রুবেলের শ্বশুড়বাড়ির কয়েকজনকে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে শুনেছে তুষার, তাদের ধারনা রুবেলকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে কেউ, ঐ মেয়ের সাথে রুবেলের কোন সম্পর্ক নেই, কোনদিন ছিলও না, রুবেলের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। রুবেলের স্ত্রির সাথে পরিচয় হয়নি, রুবেল বেঁচে থাকতে যে পরিচয় হয়নি, এখন আর নতুন করে পরিচিত হবার প্রয়োজনবোধ করছে না তুষার। ছেলে দুটোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, কেঁদে মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ স্নেহে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্যগুলো দেখে এই প্রথমবারের মতো হাহাকার অনুভব করল তুষার। এরকম করে কেউ কাঁদবে না তার জন্য।

বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই এসেছে, তুষারের সাথে দেখা হয়েছে, কুশল বিনিময় হয়েছে, তারা চলেও গেছে। আরো বেশ কিছুক্ষন থাকার প্রয়োজন অনুভব করছে তুষার, মশিউরের দেখা মেলেনি। ওর আসার কথা, এতো কাছের একজন মানুষ মারা গেল অথচ মশিউর আসবে না তা হয় না। সকাল থেকেই মশিউরের মোবাইল ফোনটা বন্ধ।

যোহরের নামাজের পর বাকি সবার সাথে বনানী কবরস্তানে গেল তুষার। দৃশ্যটা হৃদয়বিদারক, লাশ নামানো হচ্ছে, ছেলেদুটো তারস্বরে কাঁদছে, ওরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ওদের বাবা নেই, এখানে আসার পর থেকেই নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রেখেছিল তুষার, এবার আর পারল না। চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল।

এই সময় কাঁধে হাত পড়াতে পেছন ফিরে তাকাল। মশিউর দাঁড়িয়ে আছে, ওর চোখেও পানি।

ঘন্টা দুয়েক পর দুপুরের কড়া রোদ পড়ে এসেছে কিছুটা, বনানীর এক ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকল তুষার, মশিউরকে সাথে নিয়ে। ক্যাফেটা প্রায় অন্ধকার, হাল্কা একটা সুর ভেসে বেড়াচ্ছে পুরো ক্যাফেতে, লোকজন খুব একটা নেই। এক কোনায় একটা টেবিলে বসল দুজন, মুখোমুখি। আবছা আলোতে মশিউরকে খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গত কয়েকদিনেই বয়স বেড়ে গেছে অনেকটা। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে, কণ্ঠার হাড়টা বেখাপ্পা রকমের উঁচু হয়ে আছে।

দুটো কাপুচিনো অর্ডার করল তুষার, তারপর চুপচাপ মুখোমুখি বসে রইল দুজন, কেউ কোন কথা বলছে না। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ।

"এরপর কি?" যেন নিজের মনেই কথা বলছে মশিউর, "আজমল মরেছে, রুবেল মরেছে, আমিও মরবো, পৃথিবীর সবাই মরবে।"

ওয়েটারের দিকে তাকাল তুষার, ইশারায় এক গ্লাস পানি দিতে বলল।

"মৃত্যুকে খুব কঠিন মনে হয় মাঝে মাঝে, আবার মনে হয় খুব সোজা," বিড়বিড় করেই চলেছে মশিউর, "তবে সামনাসামনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস আমার নেই। পারলে মৃত্যু যেন পেছন দিক দিয়ে আসে..."

ওয়েটার পানির গ্লাস দিয়ে গেল, ঢক ঢক করে পানি খেল তুষার।

"তোকে আমার সন্দেহ হয়," এবার সরাসরি তুষারের দিকে তাকিয়ে বলল মশিউর, "তুই চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারিস, পদ্ধতিটা আমিই বলে দিচ্ছি, ঐ কফির সাথে কোন পয়জন মিশিয়ে, এখান থেকে বের হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু, এমন কোন জিনিস ব্যবহার করিস যেন সেটার কোন অস্তিত্ব না থাকে। সবাই ভাববে হার্ট অ্যাটাকে মরেছি। নেশা করি, হার্ট অ্যাটাক হওয়া স্বাভাবিক।"

মশিউরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুষার। ওর খেলাটা বুঝতে পারছে না, সন্দেহের তীর এভাবে তার দিকে ছুঁড়ে মারবে এটা মাথায়ও আসেনি। ওর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়।

"ছোটবেলার কথা তোর মনে আছে, উল্টাপাল্টা সব বুদ্ধি ছিল তোর মাথায়, কিন্তু ধরা খেতাম আমরা, মনে আছে? একবার তোর বুদ্ধিতে সিনেমা দেখতে গেলাম ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, কিন্তু তোর কিছু হলো না, তুই কিভাবে কিভাবে যেন স্যারকে বোঝালি যে তুই সিনেমা দেখিসনি, পেট ব্যথার কারনে বাসায় গিয়েছিল। মার খেলাম আমরা। স্যার তোকে উল্টো আদর করলেন, মনে আছে?"

কিছু বলল না তুষার, কফি দিতে এতো দেরি হচ্ছে কেন, বিরক্ত লাগছিল তার।

"তোর চেহারাটাই ছিল ভোদাই মার্কা, এখনো তাই আছে। মনে হয় তুই দুনিয়ার কিচ্ছুটি বুঝিস না, তোকে কেউ সন্দেহই করতো না, সব দোষ ছিল আজমলের,

তারপর আমার আর রুবেলের, মনে পড়ে?"

হ্যা, এ ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হবে, চেহারাটা তার বোকাসোকা ধরনের, চেহারায় সহজ সরল ভাবটা আপনাআপনিই এসেছে, তৈরি করে নিতে হয়নি। এটা নিশ্চয়ই তার দোষ নয়, কিন্তু মশিউর এসব কথা কোন দিকে নিতে চাচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন, ভাবল তুষার।

"তুই চৌদ্দ বছর পর বিদেশ থেকে এলি, আর আমার জান-পরানের দুজন বন্ধু মরে গেল, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?"

ইচ্ছে করছিল হো হো করে হাসতে, তবে এরকম চমৎকার একটা পরিবেশ পাগলের মতো অট্টহাসি শোভা পায় না, কোনমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করল তুষার, সন্দেহ করার মত একজনই আছে, সে হচ্ছে মশিউর, অথচ ব্যাপারটা কি চমৎকারভাবে অন্য দিকে চালানোর চেষ্টা করছে।

কফি চলে এসেছে, মুখে তেলতেলে হাসি নিয়ে ওয়েটার দুজনের সামনে বড় দুটো কফির মগ রেখেছে, গন্ধটা ভালো, স্বাদও ভালো হবে নিশ্চয়ই।

"আর তুই যে ওদের দুজনকে হুমকি দিয়েছিলি, দেখে নিবি বলে, একথা তো সবাই জানে," মুখ খুলল তুষার, কফির কাপে চুমুক দিল, "ওদেরকে খুন করার পেছনে যথেষ্ট কারন আছে তোর। আর আমাকে যে পরিমান ঘৃনা করিস, তাতে মনে হয় না এই ক্যাফে থেকে বেঁচে ফিরতে পারবো।"

কফির মগ নিয়ে বসে আছে মশিউর, ওর নাক কুঁচকে আছে, বোঝাই যাচ্ছে কফিতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়, এরচেয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কন্ডেন্সড মিল্কের চা তার পছন্দের।

"আমি তোকে ঘৃনা করি না, তবে তোর অভিনয়টাকে অপছন্দ করি," মশিউর বলল, "তুই ভালো অভিনয় জানিস। আরিফের "

এবারও নিজেকে নিয়ন্ত্রন করল তুষার, হাসি চলে আসছিল, এতো চমৎকার প্রশংসা কেউ কখন করেনি। জীবনে অভিনয় সবাই করে, কম আর বেশি, কারোটা চোখে লাগে, কেউ সুনিপুন অভিনেতা, সে নিজেও জানে না মাঝে মাঝে যে সে অভিনয় করছে। তার ক্ষেত্রেও হয়তো ব্যাপারটা এরকম, ভাবল তুষার।

"কাল আরিফের সাথে দেখা করতে যাবো," তুষার বলল, "তুই যাবি?"

"না," কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল মশিউর, না করতে পেরে সে যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

"চল, ওর সাথে দেখা করে আসি, অনেকদিন নিশ্চয়ই ওর সাথে তোর দেখা হয় না," তুষার বলল।

"তোর হাতে অফুরন্ত সময়, আমার এতো সময় নেই," মশিউর বলল, "আমি ঢাকার বাইরে যাবো, কয়েকদিনের জন্য। তারপর দেখা যাক।"

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"তোকে বলা যাবে না, সিক্রেট।"

এবার নিজেকে থামাতে পারল না তুষার, হেসে ফেলল, কফি মগ থেকে কিছুটা ছলকে পায়ের উপর পড়ল।

"তোর মাথাটা দেখা," তুষার বলল, "তুই সম্ভবত পাগল হয়ে যাচ্ছিস, কোন রিহ্যাবে ভর্তি হয়ে যা। এখনো সময় আছে।"

"কিছু কিছু পাগলামি আছে দেখা যায়, কিছু কিছু দেখা যায় না।"

"তোর ধারনা আমি খুন করতে দেশে এসেছি?" তুষার বলল, "তা এখনো বসে আছিস কেন? পালা, এমন কোথাও যা যেখানে আমি তোকে খুঁজে পাবো না।"

ভালো কফি খেতে হয় আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে। তবে মশিউর কফিতে অভ্যস্ত নয়, মুখ কুঁচকে ফেলছে বারবার।

"আমি আসলেই পালাচ্ছি, অন্তত কয়েকদিন ঢাকা থেকে দূরে থাকতে চাই," মশিউর বলল, "ভালো থাকিস।"

উঠে পড়ল মশিউর। বের হয়ে গেল ক্যাফে থেকে। ওর হাঁটাচলাও ঠিক স্বাভাবিক নয়, নেশা বোধহয় বেশি করেছে। চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল তুষার। চমৎকার একটা সুর বাজছে, সুরটা চেনা চেনা। মনে করার চেষ্টা করল, পারল না। আরো প্রায় মিনিট দশেক বসে থেকে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো তুষার। বাসায় যাওয়া দরকার, মোবাইল ফোনের চার্জ শেষ, ক্রিস্টিনা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

অধ্যায় ২৯

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বারটা চমৎকার, ছিমছাম, আগে বারগুলোতে বুড়ো কিছু মানুষকে বসে বসে ঝিমাতে দেখা যেত, এখন মনে হচ্ছে দিন পাল্টেছে, তরুনরা সেই জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছে, ব্যবসায়িক অনেক ডিল হচ্ছে বারগুলোতে, সেই সাথে হৈ-হুল্লোড়ও বেড়েছে। বারে যাওয়ার অভ্যাস নেই শাহরিয়ারের, এর আগে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কয়েকবার গেছে, সেটা অ্যালকোহলের আসক্তি থেকে নয়, বরং কৌতুহল মেটানোর জন্য। কয়েকবার গিয়েই কৌতুহল মিটে গেছে, এই জিনিস খেয়ে কী লাভ এখন পর্যন্ত মাথায় ঢোকে নি তার, বিদঘুটে স্বাদের জিনিসটা এতো আনন্দ নিয়ে মানুষ খায় কি করে!

অন্ধকার এক কোনায় বসেছে শাহরিয়ার, একটা বিয়ারের অর্ডার দিয়েছে। আলো-আধারির খেলা চলছে বারটাতে, মানুষজনের মুখ দেখা যাচ্ছে আবার যাচ্ছে না। সবাই যেন অদ্ভুত এক মুখোশ পড়ে আছে। এখানে তরুনদের ভিড় কম, অভিজাত বয়স্কদের বেশি দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত এখানকার জিনিসপত্রের দামও একটু বেশি। দেয়ালে ঝুলানো টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে, বিয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে খেলায় মনোযোগ দিল শাহরিয়ার। দূর থেকে দেখতে হচ্ছে বলে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

একটা সিগারেট ধরাল শাহরিয়ার, চারপাশটা দেখল আবার। লোকজন আছে যথেষ্ট, তবে সেই তুলনায় কথা-বার্তা বলছে না তেমন কেউ। এখান থেকেই শুরু করতে হবে, আজমল চৌধুরির সাথে সেদিন রাতে যে মেয়েটি ছিল তা এখানকার কেউ না কেউ জানে।

বিয়ার চলে এসেছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যান খুলল শাহরিয়ার, চারপাশে নজর রাখছে, প্রায় ন'টা বাজে, এখনই কাস্টমারদের আসার সময়, দরজার কাছটা অন্ধকার, তবে মাত্র যে লোকটা ঢুকল তাকে চিনতে খুব একটা কষ্ট হলো না, জানে আলম। বোঝা যাচ্ছে বারের রেগুলার কাস্টমার, বেশ কয়েকজন ওয়েটার এগিয়ে গিয়ে সালাম দিল, বারের মাঝখানের চমৎকার সোফায় বসাল তাদের কাস্টমারকে। এই লোকটা কিছু একটা জানে, সেদিন বলে নি, আজ বের করতে হবে। ওয়েটারকে ইশারায় ডেকে আরেকটা বিয়ার আনতে বলল শাহরিয়ার, এক বিয়ার নিয়ে বেশি সময় বসে থাকা যাবে না।

জানে আলম একাই বসে আছে, মাঝে মাঝে হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, কারো জন্য অপেক্ষা করছে বোঝা যায়। ওয়েটার এসে মিনারেল ওয়াটারের বোতলের সাথে বরফের টুকরোভাসা সাদা একটা জগ রেখে গেল টেবিলে, কিছু একটা অর্ডার দিল

জানে আলম, হেসে চলে গেল ওয়েটার।

দরজার দিকে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ার, লোকজনের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে, ওয়েটাররা ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে। জানে আলম এরমধ্যেই খাওয়া শুরু করেছে, দূর থেকে পেটমোটা ছোটখাট একটা বোতল দেখতে পেল শাহরিয়ার, ওয়েটার রেখে গেছে একটু আগে। বিয়ার খেতে ভালো না লাগলেও মাঝে মাঝেই ক্যানে চুমুক দিচ্ছিল শাহরিয়ার, পরের ক্যানটা এখনো খোলাই হয়নি। ঠিক সাড়ে ন'টার দিকে জানে আলমকে দেখা গেল প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কারো সাথে কথা বলছে। তারপর খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, ওয়েটারকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বের হয়ে গেল বার থেকে।

এতো তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল লোকটা যে মনে হলো ভীষন তাড়া আছে, টেবিলে পড়ে থাকা বোতল এখনো শেষ করে নি, তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, এখন বিল নিয়ে ঝামেলা করার মানে নেই, ওয়েটারকে ডেকে এক হাজার টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে বার থেকে।

সিড়ি দিয়ে নামার সময় দৌড়ে নামার ইচ্ছাটা কোনমতে নিয়ন্ত্রন করল, অনেক লোকের আনাগোনা, এরমধ্যে সন্দেহজনক কিছু করা ঠিক হবে না। জানে আলমের সাথে এর আগে সরাসরি কথা হয়েছে, দেখলেই চিনে ফেলবে। তিনতলা সিড়ি বেয়ে নামতে বেশিক্ষন লাগল না, নীচে এসেই দেখল সাদা একটা টয়োটা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জানে আলম, জানালার কাঁচ উঠানো, আর ল্যাম্পপোস্টের ঝাপসা আলোয় পরিস্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। জানে আলম গাড়িতে উঠার জন্য দরজা খুলতেই একটা মেয়েকে দেখতে পেল শাহরিয়ার।

সাথে করে গাড়ি আনে নি, জানে আলমকে অনুসরন করা খুব ঝামেলার কাজ হয়ে যাবে, আশপাশে কোথাও কোন সিএনজিও দেখা যাচ্ছে না। একটু অন্ধকারে দাঁড়াল শাহরিয়ার, জানে আলমের চোখে পড়া যাবে না, এবার সুযোগ হাতছাড়া হলেও পরে যাতে ঝামেলা না হয়। গাড়িটা চলে যাবার কথা এতোক্ষনে, তবে যায়নি, এখনো দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। মিনিট দুয়েক একই জায়গায় রইল গাড়িটা, তারপর জানে আলমকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

এগিয়ে গিয়ে জানে আলমের পথ আটকাল শাহরিয়ার, লোকটা তাকে দেখে চমকে গেলেও সামলে নিয়েছে সাথে সাথে।

"আপনি? এখানে?" বেশ অবাক হয়ে বলল জানে আলম।

"জানে আলম সাহেব, আপনার সাথে কথা শেষ হয়নি এখনো, তাই এলাম," শাহরিয়ার বলল, এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত রাখল।

"আর কি কথা?"

"অনেক কথা," শাহরিয়ার বলল, "আপনাকে ছোট একটা গল্প বলি, শুনবেন?"

"হ্যা, বলেন," অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল জানে আলম।

বারের দিকে না গিয়ে এবার পাশের রাস্তায় চলে এলো শাহরিয়ার, জানে আলমকে সাথে নিয়ে।

"গল্প না বলে সত্যি ঘটনাও বলতে পারেন," শাহরিয়ার বলল, "বলবো?"

"আমার একটু তাড়া আছে, তাড়াতাড়ি বলেন।"

"আমি তখন ক্লাস নাইনে, একবার এক ক্লাসমেটের সাথে আমার খুব গন্ডগোল লাগে, সামান্য খেলা নিয়ে, এরপর ওর সাথে আমি ভাব করে ফেলি, কেন বলুন তো?"

"আমি জানি না।"

"রাইট, আপনার জানার কথাও না," শাহরিয়ার বলল, "ভাব করার কারন ছিল প্রতিশোধ নেয়া, বুঝতে পারছেন? তো, একদিন সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম।"

"কিভাবে?"

"দুজনে সাইকেল করে একসাথে ফিরছিলাম, প্রাইভেট পড়া শেষে, রাস্তা ফাঁকা ছিল, ছোট শহর, বুঝতেই পারছেন সন্ধ্যার দিকে রাস্তায় তেমন লোকজন ছিল না, উল্টোদিক দিয়ে আসা একটা ট্রাকের সামনে পড়ে যাই আমরা দুজন, তারপর..." একটু বিরতি নিল শাহরিয়ার।

"তারপর কি?"

"ট্রাকটাকে পাশ কাটানোর সময় আমি পেছন থেকে ওকে ধাক্কা দিলাম, সাইকেলসহ ও ট্রাকের পেছনের দুই চাকার ভেতর ঢুকে গেল।"

"কেউ দেখল না? ট্রাকের ড্রাইভার, আশপাশের লোকজন, কেউ না?"

"না।"

"এই ঘটনা আমাকে বলার মানে কি?"

"মানে একটাই," বলে শাহরিয়ার হাসল, "চারদিকে দেখেন, কেউ নেই, সবাই আছে, অথচ ঠিক রাস্তার যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে কেউ নেই, এখন যদি কিছু হয়ে যায় কেউ জানতেও পারবে না।"

"হুমকি দিচ্ছেন? হুমকি দিয়ে জানে আলমকে কিছু করা যাবে না," চাপা গলায় বলল জানে আলম।

"হুমকি দেয় বোকারা," শাহরিয়ার বলল, "একটা সম্ভাবনার কথা বলছি।"

"কি জানতে চাচ্ছেন বলুন," জানে আলম বলল, সে কিছুটা ভয় পেয়েছে বলা মনে হলো।

"মেয়েটা কে আর এখন কোথায় আছে? আপনিই তো আজমল সাহেবকে সাপ্লাই দিতেন, তাই না?"

"হু," মাথা নাড়াল জানে আলম, "কিন্তু এর সাথে ঐ মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই,

আমি কতো মেয়ে সাপ্লাই দিয়েছি আমি নিজেও জানি না, ঘটনার রাতের মেয়েটাকেও আমি দিয়েছি, ঘটনার পর ঐ মেয়েটা কোনমতে জান নিয়ে পালিয়েছে।"

"এখন কোথায় সে?"

"হাসপাতালে ভর্তি, অসুস্থ, সামনাসামনি এমন ঘটনা দেখার পর নার্ভাস ব্রেকডাউন হইছে।"

"এ কথাগুলো আগে বলেন নি কেন?"

"ভাবলাম ঝামেলা থেকে দূরে থাকি," জানে আলম বলল, হাসল, "আজমল ছিল আমার ইনকামের মূল উৎস, এখন নতুন কাস্টমার ধরতে হবে।"

"মেয়েটার নাম ঠিকানা দিন," শাহরিয়ার বলল।

"ওরে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই," জানে আলম বলল, "ও কী দেখছে না দেখছে কিছুই বলতে পারে না।"

"লাভ আছে কি নেই সেটা আমি বুঝবো," শাহরিয়ার বলল, "আপনি ঠিকানা আর নাম দিন।"

জানে আলম গড়গড় করে নাম ঠিকানা বলল, সাথে নোটপ্যাড ছিল, লিখে নিল শাহরিয়ার, লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিএনজি ডাকল, ঐ মেয়েটার কাছে খুব জরুরি কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, রাত দশটার কাছাকাছি বাজে, বিয়ার খেয়ে অস্থির লাগছিল, সারাদিনের ক্লান্তি হঠাৎ যেন জাঁকিয়ে ধরেছে, বাসায় যেতে হবে, ঘুম পাচ্ছিল খুব। একটা সিএনজি অথবা ট্যাক্সি নেই আশপাশে, বাসা এখান থেকে অনেক দূর, হাঁটতে থাকল শাহরিয়ার। মনের মধ্যে কু-ডাক দিচ্ছিল, জানে আলম লোকটার কথা বিশ্বাস করে ওকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হয়নি। মেয়েটার নাম ঠিকানা ঠিক দিয়েছে কি না কে জানে। কাল সকালেই মেয়েটার খোঁজ লাগাতে হবে।

অধ্যায় ৩০

এখন পর্যন্ত ক্রিস্টিনাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে বের হয়নি তুষার, এ নিয়ে কিছুটা মন খারাপ ছিল ক্রিস্টিনার, তবে এখনো আরো কিছুদিন ঢাকায় থাকা হবে, সময়ও খারাপ কাটছে না, তুষার দীর্ঘদিন পর দেশে এসেছে, সবার সাথে দেখা-সাক্ষাতেই সময় চলে যাচ্ছে। কাজেই এ ব্যাপারে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আরো কয়েকটা দিন দেখা যাক, স্বামি হিসেবে তুষারের তুলনা হয় না, গত কিছুদিন ধরে ওকে কিছুটা অন্যরকম লাগছে, মনে হচ্ছে কিছুটা একটা লুকাচ্ছে তার কাছে, চেহারায় উদাসিন একটা ছাপ পড়েছে, কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে এসব নিয়ে একসময় কথা হলেও ইদানিং তুষার একদম চুপ মেরে আছে। ওকে আপাতত ঘাটাবে না বলে ঠিক করেছে ক্রিস্টিনা, বাংলাদেশে যতোদিন আছে নিজের মতো থাকুক।

আজ সকাল সকাল তুষারকে গাড়ি বের করতে দেখে মন খারাপ হলো ক্রিস্টিনার, আজ রবিবার, এখানে অবশ্য ছুটির দিন নয়, তারপরও প্রতিটা রবিবার দুজন একসঙ্গে কাটায়, ইচ্ছে ছিল আজকের দিনটা অন্তত তুষার বাসায় থাকবে। হলো না। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে বলল কিছু বলল না, শুধু বলল সন্ধ্যার আগে আগে চলে আসবে। আজকে রাতে অন্তত ওর সাথে কথা বলতে হবে এসব ব্যাপার, স্বামি-স্ত্রির মধ্যে কোন কিছু নিয়ে লুকোচুরি ভালো জিনিস নয়।

সুমনা বাপের বাড়িতেই স্থায়ি হয়ে গেছে তারা এখানে আসার পর থেকে, ওর স্বামি এখনো বিদেশ থেকে আসেনি। এই মেয়েটা না থাকলে এখানে দম বন্ধ হয়ে মারাই পড়তো সে।

বারান্দায় বসে ইংরেজি একটা পত্রিকা নিয়ে বসেছে ক্রিস্টিনা, এদেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই তার, সময় কাটানোর জন্য এই পত্রিকা পড়া। দুই মগ ধোঁয়া উঠা কফি নিয়ে সুমনা এলো বারান্দায়।

"গুড মর্নিং, ক্রিস্টিনা, কফি নাও," কফির একটা মগ বাড়িয়ে দিল সুমনা।

ক্রিস্টিনার হাতের পত্রিকাটা চোখে পড়ল সুমনার। পেছনের পাতায় ছোট করে ছাপানো খবরটা দেখে চমকে উঠল। ওর চমকে উঠা নজর এড়াল না ক্রিস্টিনার।

"কিছু হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টিনা।

পত্রিকাটা হাতে নিল সুমনা, খবরটা দেখাল ক্রিস্টিনাকে।

"উনি ভাইয়ার বন্ধু," সুমনা বলল, "স্কুলে একসাথে পড়েছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয় ঘটনা।"

"দ্বিতীয় ঘটনা মানে?"

"সপ্তাহখানেক আগে ভাইয়ার আরেক বন্ধু মারা গেছে, আজমল চৌধুরি নাম," সুমনা বলল, কফির মগ রেখে খবরটা পড়ল, "এবার মারা পড়ল আরেকজন,

অদ্ভুত!"

"তুষারের দু'দুজন ফ্রেন্ড মারা গেল, কিন্তু আমাকে তো কিছু বলল না?" অবাক হয়েছে ক্রিস্টিনা, তুষার সাধারনত তার কাছে কিছুই লুকায় না।

"হয়তো ভেবেছে তুমি চিন্তা করবে," সুমনা বলল।

"তোমার কী মনে হয় না এটা চিন্তার বিষয়?" ক্রিস্টিনা বলল, "গত কিছুদিন ধরেই তুষারকে তাই কিছুটা আনমনা দেখা যায়।"

"হু, আমিও খেয়াল করেছি।"

"তোমার কি ধারনা?"

"আমার কোন ধারনা নেই, ক্রিস্টিনা," সুমনা বলল, "তবে দুজনই যে ভাইয়ার বন্ধু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।"

"আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না," বলল ক্রিস্টিনা, তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে, "আমাদের মনে হয় চলে যাওয়া উচিত।"

"আরে নাহ," সুমনা বলল, "ভাইয়া এদেশে এসেছে অনেক বছর পরে, যতোদূর জানি বন্ধুদের সাথেও তার কোন যোগাযোগ ছিল না।"

"কিন্তু..."

"সেরকম কিছু হলে ভাইয়া নিজেই বলতো," সুমনা বলল, "চিন্তার কিছু নেই।"

"আমি ওকে ফোন করছি, দাঁড়াও," বলে মোবাইল ফোনে তুষারের নাম্বার ডায়াল করল ক্রিস্টিনা। রিঙ বেজে বেজে কেটে গেল।

বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল ক্রিস্টিনা, তার মধ্যে অস্থিরতা ভর করেছে, তুষার বাসায় ফেরা না পর্যন্ত শান্তি নেই।

সুমনা ড্রইং রুমে চলে গেল। আজমলের মৃত্যু খবরটাকে একটা দূর্ঘটনা হিসেবে নিয়েছিল, কিন্তু এবার রুবেলের মৃত্যুর পর ব্যাপারটা স্রেফ দূর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এর পেছনে বড় কোন ঝামেলা আছে। ঐ দুজনের খুব ঘনিষ্ট বন্ধু বলে এরপর তুষারের উপর কোন আঘাত আসবে কি না কে জানে। ক্রিস্টিনার সামনে এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা যাবে না। মেয়েটা খুব নরম, ওকে দুশ্চিন্তায় রেখে কোন লাভ নেই। আজ তুষার আসলে ওর কাছ থেকে জানতে হবে, সত্যিই ঘটনা দুটি দূর্ঘটনা না এর পেছনে অন্য কোন কারন আছে। যদি সত্যিই কোন কারন থাকে, তাহলে উচিত হবে যতো শীঘ্রই সম্ভব ঢাকা ছেড়ে যাওয়া। আমেরিকায় থাকলে অন্তত দুশ্চিন্তা থাকবে না।

ড্রইং রুমে এসে তুষারের নাম্বারে ডায়াল করল সুমনা, একটু আগে ক্রিস্টিনা যখন কল করেছিল তখন রিং বেজেছে, স্পিকারে দেয়া ছিল বলে শুনেছে, কিন্তু এখন বলছে মোবাইল সুইচড অফ। দুশ্চিন্তা করতে না চাইলেও একরাশ দুশ্চিন্তা ভর করল সুমনাকে।

অধ্যায় ৩১

প্রথমবার জায়গাটা চিনতে অসুবিধা হলেও এবার চিনতে কোন সমস্যা হলো না। এখানে আসার পথে নিজের বিদেশি পাসপোর্ট দিয়ে এক বোতল অ্যালকোহল কিনেছে তুষার। ঢাকায় আসার পর এই প্রথম কেনা, কাগজের প্যাকেটে মোড়ান বোতলটা পাশের সিটে রাখা। বাসায় এ জিনিস খাওয়া যাবে না, ক্রিস্টিনাও পছন্দ করে না। অনেকদিন পর আজ হয়তো আরিফের সাথে মন খুলে কিছু কথা বলা যাবে, একসাথে হয়তো খাওয়াও যাবে, যদি আরিফের আপত্তি না থাকে তো।

বারোটার কাছাকাছি সময়ে আরিফের বাসার কাছাকাছি পৌছে গেল তুষার। ঠিক আগের জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে চারপাশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা বাড়িটার দিকে এগুল। কলিং বেল চাপল, ছোট একটা ক্যামেরা বসানো একপাশে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল, হাতে কাগজের প্যাকেটে মোড়ান জিনিসটা ক্যামেরার সামনে ধরল। দরজা খুলতে এগিয়ে আসছে কেউ, মোবাইল ফোনটা বের করল পকেট থেকে, কেউ ফোন করেছিল কি না দেখার জন্য। লাভ হলো না, মোবাইলে চার্জ নেই, রাতে ঠিকমতো চার্জ দেয়া হয়নি।

দরজা খুলল আরিফ, হুইল চেয়ারে বসে দরজা খোলার ব্যবস্থা রেখেছে, একটু অবাক হলো তুষার, দরজা খোলার মতো কাজটা অন্তত বাসায় থাকা কাজের ছেলেটা সহজেই করতে পারে, তবে কিছু জিজ্ঞেস করল না, ভেতরে ঢুকে গেল।

সোফায় বসে আছে তুষার, আরিফের মুখোমুখি, দুজনের চেহারাই গম্ভির, সামনে টিভি খোলা, খবর দেখছে দুজন একসাথে। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টিভি অফ করে দিল আরিফ।

"দেশে কোন ভালো খবর নেই," তুষার বলল, "রাজনৈতিক গন্ডগোল, খুন-খারাপি, রাহাজানি এসবই চলছে।"

"শুধু বাংলাদেশে না, সব জায়গায় একই রকম অবস্থা," আরিফ বলল, সামনে ছোট টেবিলে তুষারের আনা বিদেশি মদের বোতলটা খোলা হয়েছে, দুটো গ্লাসে ঢালা হয়েছে, একটা গ্লাস নিজের দিকে নিল, আরেকটা বাড়িয়ে দিল তুষারের দিকে।

"তা ঠিক, তবে এখানে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, চৌদ্দ বছর আগে যেমন দেখে গেছি তেমনই আছে সব," তুষার বলল।

"চৌদ্দ বছর আগে আমি দুই পায়ে হাঁটতাম, দৌড়াতাম!"

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও আটকে গেল তুষার, ঠিক এভাবে আঘাত আসবে বুঝতে পারেনি।

"আমি ঠিক তা বোঝাতে চাই নি," তুষার বলল, "তুই ভালো করেই জানিস।"

"ওকে, এ প্রসঙ্গে কোন কথা নয়," আরিফ বলল, একটা সিগারেট ধরাল, তাহের আগেই সবকিছু রেখে গিয়েছিল ছোট টেবিলটায়, সিগারেট, দেয়াশলাই, এক বোতল কোক, কিছু চিপস।

"তুই একটা চিঠি দেখাবি বলেছিলি," তুষার বলল।

"হু, দেখাবো, একটু ধৈর্য্য ধর," আরিফ বলল, নিজের গ্লাসে আরেকটু ঢালল।

এর আগেও এই ঘরটায় এসেছিল তুষার, তখন ভালোভাবে দেখা হয়নি, চমৎকারভাবে সাজানো এই ড্রইং রুমটা, বেশিরভাগ জিনিসপত্রই হয় কাঠের কিংবা বাঁশের তৈরি। বেশকিছু তেলচিত্র শোভা পাচ্ছে দেয়ালে, একপাশে কাঠের শেলফে থরে থরে বই রাখা। আরিফের আগে থেকেই বই পড়ার নেশা ছিল, এখন সম্ভবত আরো বেশি পড়ে, ধারনা করল তুষার।

"আজমল মারা গেল, রুবেলও," আরিফ বলল, "কেন?"

"কেউ একজন ওদের হুমকি দিয়েছিল, ঐ তালিকায় আমি আছি, মশিউরও আছে," তুষার বলল, "এবার হয়তো আমার পালা, কিংবা মশিউরের।"

"তোদের হুমকি দিয়েছে ভালো কথা," আরিফ বলল, "কিন্তু আমিও এই লিস্টে চলে এলাম কেন?"

"তোকে তো কেউ ফোন করে নি," তুষার বলল, "তোর সাথে তো আগেও আমার কথা হয়েছে, তখন তো কিছু বলিসনি।"

"আমাকে ফোন করেছে হয়তো," আরিফ বলল, "কিন্তু আমার ফোন বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে, নয়তো অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলে আমি রিসিভ করি না, তাই চিঠি পাঠিয়েছে।"

"চিঠিটা দেখা?"

"তার আগে বল, এটা কি তুই লিখেছিস?" আরিফ বলল, "তোকে দিয়ে সব সম্ভব।"

"আমাকে দিয়ে সব সম্ভব? তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস, আমাকে দিয়ে সব সম্ভব? এমনকি কাছের বন্ধুদের মেরে ফেলাও?"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তফাতটা খুব সীমিত," হেসে বলল আরিফ, "বিশ্বাসের আগে শুধু একটা 'অ' বসিয়ে নিলেই হয়। আর আমার নিজের বিশ্বাসের উপরও আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই। নাহলে এভাবে পচে মরতাম না।"

"তুই পচে মরছিস কোথায়? সারা দেশে তোর এতো নামডাক," তুষার বলল।

"তাহলে আমার জায়গায় চলে আয়, তোকে ল্যাংড়ালুলা করে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিই, জনপ্রিয় রোমান্টিক ঔপন্যাসিকের টাইটেল লাগিয়ে দেই, তাহলে বুঝবি।"

"যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আফসোস করে লাভ আছে, তুই বল?"

"তুই আফসোস করবি কেন?" আরিফ বলল, "তুই একজন পিএইচডি হোল্ডার, বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে পড়াস, ঘরে বিদেশি বৌ, টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি, যা ঘটে গেছে তাতে তোর কোন ক্ষতি হয়নি, নাকি হয়েছে?"

চুপ করে থাকল তুষার, হ্যা, তাতে তার কোন ক্ষতি হয়নি।

"নে, আরেক পেগ খা," বলে তুষারের দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিল আরিফ।

গ্লাসটা হাতে নিল তুষার, মশিউরের মতো আরিফও তাকে সন্দেহ করছে, ব্যাপারটা অদ্ভুত। একটা লোক যে কিনা অনেক অনেকগুলো বছর পার করে হাজার মাইল দূর থেকে দেশে ফিরেছে সে কেন নিজের ঘনিষ্ট বন্ধুদের খুন করতে যাবে! অদ্ভুত চিন্তাভাবনা।

হুইল চেয়ারে করে ড্রইং রুমের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাচ্ছে আরিফ, গুন গুন করে পরিচিত একটা গানের সুর তুলছে, বোঝা যাচ্ছে নেশা হয়েছে। খুব বেশি না খেলেও মাঝে মাঝে নেশা হয়ে যায়, এই মুহূর্তে মাথাটা কেমন ভারভার লাগছে তুষারের কাছে। দিনে দুপুরে অ্যালকোহল ঠিক জমে না, এর জন্য প্রয়োজন শান্ত, অন্ধকার পরিবেশ। আরিফের এই ড্রইং রুমটা যথেষ্টই শান্ত এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অন্ধকার, বাইরের রোদের ছিটেফোঁটাও ঢোকে না, কিন্তু তারপরও মানসিক একটা অনুভূতি দরকার, রাত নার্ভকে শান্ত করে, স্থির করে।

টেবিলের উপর একটা খাম পড়ে থাকতে দেখল তুষার, বহুদিন এরকম হলুদ খাম চোখে পড়ে না। ডাক বিভাগের এই খাম সম্ভবত লুপ্ত হতে চলেছে পৃথিবী থেকে। এই চিঠিটার কথাই সম্ভবত বলছে আরিফ। হাত বাড়িয়ে খামটা নিতে গিয়েও নিল না, সময় হলে আরিফই দেবে।

গুনগুন করা শেষ হলে তুষারের দিকে এগিয়ে এলো আরিফ, ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারল ভালো নেশা হয়েছে। নেশায় নাকি মানুষের ভেতরের সব ভান মুছে যায়, সত্যিকারের মানুষ বেরিয়ে আসে, হয়তো সেরকম কিছুই ঘটবে, তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত সে।

টেবিল থেকে খামটা নিয়ে তুষারের মুখের দিকে ছুঁড়ে দিল আরিফ।

"নে, পড়," আরিফ বলল, "পড়ে জানা, আমি কেন তোদের দলে, আমি কী করেছিলাম?"খামটা খোলাই ছিল, ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে আনল তুষার, খুব সাবধানে, এই খামটা পাঠিয়েছে খুনি, ভেতরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকার কথা, তবে এই খাম কিংবা চিঠি পুলিশের হাতে পৌছাবে না, কাজেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা চিন্তা না করলেও চলবে।

হাতে লেখা চিঠি নয়, কম্পিউটারে টাইপ করা, বাংলায়, চিঠিটা পড়ল তুষার।

জনাব আরিফুল হক,

আপনি একজন বিশিষ্ট রোমান্টিক ঔপন্যাসিক, লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে

সাহিত্যসেবা করে যাচ্ছেন। আপনি জানেন কি, আপনি যা লেখেন আমি সব পড়ি, ভালো না লাগলেও পড়ি এবং অবাক হই, আপনি এতো মিথ্যেবাদী কেন? কারন আমি জানি, ভেতরে ভেতরে আপনি একজন স্বার্থবাদি, অক্ষম কাপুরুষ, প্রতিবাদ করার শক্তি আপনার নেই, নেই মেনে নেয়ার মতো বুকের পাটা।

যাই হোক, আসল কথায় আসি, আপনার কাছে আমার দুটো চাওয়া, আপনি আত্মহত্যা করুন অথবা সব কিছু স্বীকার করুন। এই চিঠি পাওয়ার পর খুব বেশি সময় পাবেন না। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবেন না আশা করছি। শুভেচ্ছান্তে 'আপনার একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত।'

চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়ল তুষার। আরিফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"আমি কী তাহলে সুইসাইড করবো?" আরিফ বলল, "নাকি সব স্বীকার করে নেব? কিন্তু স্বীকার করবো কি? তুই বলে দে আমাকে?"

হুইল চেয়ারটা ছেড়ে তুষারের কলার চেপে ধরল আরিফ, রাগে ফোঁসফোঁস করছে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে মুহূর্তেই। নিজেকে কোনমতে ছাড়াল তুষার, মাথা কাজ করছে না, শরীরটা কেমন হাল্কা লাগছে। নিয়ন্ত্রন রাখতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেছে আরিফ, অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে তুষারের দিকে।

"তুই চলে যা, এই মুহূর্তে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি," চেঁচাল আরিফ, তার চিৎকার হাহাকারের মতো শোনাল, "আমার হাতে একটা পিস্তল থাকলে তোর মাথাটা এখানেই গুড়িয়ে দিতাম।"

কিছু বলল না তুষার, বোতল পুরোটা খালি হয়ে গেছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতর থেকে গেট লক করা। গেটের চাবি টেবিলের উপর দেখে এসেছে, আবার ঢুকল ঘরে।

চাবিটা নিল টেবিলের উপর থেকে।

"যাচ্ছি তাহলে," বলল তুষার, কোন উত্তর এলো না, মাথা নীচু করে বসে আছে আরিফ।

গেট খুলে বেরিয়ে এলো, চাবিটা ঝুলতে থাকল, আরিফের একজন সহকারি আছে, ছেলেটা হয়তো আশপাশেই আছে, বেশ লাজুক সম্ভবত, এইজন্য কাছে আসছে না।

বাইরে তুমুল রোদ, রাস্তার পাশে গাড়িটা যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। টলতে টলতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল তুষার। এখনই ড্রাইভ করা যাবে না, মাথাটা যতোক্ষন পরিস্কার না হচ্ছে ততোক্ষন বসে থাকতে হবে, নইলে দূর্ঘটনা ঘটবে নির্ঘাত। ড্রাইভিং সিটে বসল তুষার, জানালা খুলে দিল, ভেতরটা গরম হয়ে আছে। মাথাটা ভার লাগছিল বলে হেলান দিয়ে বসল এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার আগে আগে ঘুম ভাঙল। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল কোথায় আছে, দিনে-দুপুরে রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে মাথাটা এখন হাল্কা লাগছে। গাড়ির চারপাশে ছোট ছোট কিছু ছেলেমেয়ে ভিড় করেছিল, তাকে জেগে উঠতে দেখে দৌড়ে পালিয়েছে। ওরা হয়তো অন্যরকম কিছু ভেবেছিল। এই জায়গাটা নির্জন হলেও অনেক দূরে কিছু বাড়িঘর দেখেছে, ওরা হয়তো সেখান থেকেই এসেছে, ভাবল তুষার।

গাড়ি স্টার্ট দিল। বাসায় সবাই চিন্তা করছে নিশ্চয়ই, ক্রিস্টিনা নিশ্চয়ই ফোন করে করে অস্থির হয়ে গেছে। দিনের আলোয় এই রাস্তা দিয়ে আসা যতোটা সহজ ছিল সন্ধ্যার এই সময়টাই তা ততোটাই কঠিন মনে হচ্ছিল। সরু রাস্তা, দুপাশ ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে, একটু এদিক-সেদিক হলেই গাড়ি নিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে।

জীবনে অ্যালকোহল কম খায় নি তুষার, মাথা ঘুরেছে, বমি হয়েছে, কিন্তু এভাবে ঘুমিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা নেই। সম্ভবত জিনিসটা ভালো ছিল না।

আরো প্রায় ঘন্টাখানেক চালানোর পর হাইওয়েতে উঠল তুষার, মোবাইল ফোনের জন্য প্যান্টের পকেটে হাত চালাল, নেই। শার্ট-প্যান্টের সবগুলো পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজল। ফোনটা আরিফের ড্রইং টেবিলে রয়ে গেছে সম্ভবত। অনেক দূও চলে এসেছে, এখন আর ফেরত যাওয়া যাবে না। বাসায় না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না।

অধ্যায় ৩২

সকালে অফিসে এসেই বেরিয়ে পড়েছে শাহরিয়ার, মোহাম্মদপুরের যে ঠিকানাটা আছে সাথে সেটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষন লাগল না। চারতলা একটা বাসা, পুরানো ধরনের। তিনতলায় ডান দিকের ফ্ল্যাটে কলিং বেল চাপল শাহরিয়ার। শুকনোমতো একটা ছেলে বেরিয়ে এলো।

"কাকে চাই?"

"রিনা বাসায় আছে?"

"রিনা? এখানে এই নামে কেউ থাকে না," ছেলেটা বলল।

জানে আলম এই নামই বলেছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না শাহরিয়ার, সরে আসতে যাবে এই সময় একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

"ভেতরে আসুন," মেয়েটা বলল। শুকনো ছেলেটা কিছু বলতে গিয়েও বলল না, ভেতরে চলে গেল।

খুব ছোট একটা ফ্ল্যাট, পুরানো দিনের আসবাবপত্র ড্রইংরুমে, দেয়ালের রঙ মলিন হয়ে গেছে, কতোকাল রঙ করানো হয় না কে জানে। সোফায় বসল শাহরিয়ার, মেয়েটা একটু সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, খুব সাধারন সালোয়াড়-কামিজ পরনে, শ্যামলা মেয়েটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব বিব্রতবোধ করছে।

"আলম ভাই বললেন, আপনি আসবেন," মেয়েটা বলল, "চা খাবেন?"

"না," শাহরিয়ার বলল, "আপনি বসুন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে।"

"বাসায় আমি রিনা নই, আমার নাম শাহেলা, কাজটা শখ থেকে করি না, বাধ্য হয়ে করতে হয়," বলল মেয়েটা, এখনো দাঁড়িয়ে আছে, "কি জিজ্ঞেস করবেন, করুন।"

"আমি ঘটনাটা জানতে চাচ্ছি? ঐদিন রাতে কী হয়েছিল?"

"খুব বেশি কিছু মনে নেই," শাহেলা ওরফে রিনা বলল, "আজমল চৌধুরির সাথে আগেও গিয়েছিলাম, তাই আলম ভাই বলাতে মানা করি নি, কিন্তু ওরকম কিছু হবে জানলে কখনোই যেতাম না।"

"ডিটেইলস বলুন?"

"এতো ডিটেইলস বলতে পারবো না," রিনা বলল, "আমরা বাসার নীচে পৌছান মাত্র হামলা হয়। আজমল লোকটা আমাকে ঢাল বানিয়েছিল, এমনভাবে ধরেছিল যে দুজনের গোলাগুলিতে আমি মরতাম, কিন্তু খুনি লোকটা এতোটাই ঠান্ডা মাথার যে দূর থেকে ঠিক গুলি করে বসে। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।"

"তারপর?"

"জ্ঞান ফেরার পর দেখি, আমার পাশে আজমল চৌধুরির লাশ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমি কোনমতে দৌড়ে রাস্তায় চলে আসি, সেখান থেকে একটা সিএনজি নিয়ে সরাসরি বাসায়।"

"এই ঘটনাটা আর কে দেখেছে?"

"আমি জানি না।"

"খুনি দেখতে কেমন?"

"অন্ধকার ছিল বলে লোকটার চেহারা ঠিকমতো দেখতে পাই নি, তবে যতোটুকু মনে পড়ে, বড়বড় চুল, লম্বার আপনার মতোই হবে, মুখে দাঁড়ি ছিল, আর..."

"আর?"

"বাসায় ফিরে দেখি আমার পার্সে অনেকগুলো টাকা, প্রায় বিশ হাজারের মতো, এই টাকা কিভাবে আমার কাছে এলো জানি না।"

"খুনি এই টাকা আপনার পার্সে ঢুকিয়ে দিয়েছে? নিজ হাতে?"

"আমি জানি না, আমার মনে নেই।"

"আমার আরেকটু ডিটেইলস দরকার?"

"যেমন?"

"আজমল চৌধুরি আপনাকে পিক করে কোথা থেকে?"

"আমি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বারের নীচেই ছিলাম, আলম ভাইয়ের গাড়িতে।"

"বাহ! পুরোপুরি হোমসার্ভিস!"

মেয়েটার মুখ ছাইবর্ন হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে বেশ বিব্রত হয়েছে। ওকে এভাবে ছোট করাটা ঠিক হয়নি, ভাবল শাহরিয়ার, অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া দরকার দ্রুত।

"উনাকে কি কোন কারনে চিন্তিত মনে হচ্ছিল?"

"না, আজমল চৌধুরি কাউকে মানুষই মনে করতো না," রিনা বলল, "বলতো, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে এমন লোক কেউ নেই।"

"এসব কথা কোন প্রসঙ্গে বলতো? এমনি এমনি?"

"না, দাঁড়ান," কি যেন একটা মনে পড়েছে বলে মনে হলো রিনার কাছে, "হ্যা, গাড়িতে উঠার পরপরই বলছিল, তার কোন বন্ধু নাকি বিদেশ থেকে এসেছে। একদিন আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা।"

"আর বলেছিল, মাত্র তিনজন বন্ধু আছে তার পৃথিবীতে। খুব গল্প করার মুডে ছিল।"

"বন্ধুদের নাম বলেছিল কিছু?"

"না, নাম বলে নি, আসলে রাস্তা ফাঁকা ছিল, কম সময়েই আমরা চলে আসি বাড়ির সামনে। তারপর তো জানেন।"

"হু, জানি।"

"আর কিছু জানতে চান?"

"না, আমি আসি," বলে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

মেয়েটা কিছু বলল না, দরজা লাগিয়ে দিল।

মোহাম্মদপুরে এসে কোন লাভ হয়নি, মেয়েটার কাছ থেকে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

আজমল চৌধুরি আর তার তিনবন্ধু সম্পর্কে আরো খোঁজ নিতে হবে, দুটো নাম এরমধ্যেই জানা, মশিউর রহমান আর রুবেল, রুবেল মৃত, মশিউরের কোন খোঁজ নেয়া হয়নি এখনো। কাজটা ঠিক হয়নি, এসব ব্যাপারে কোন ফাঁক রাখা যাবে না। এবার চতুর্থ নামটা দরকার, সেটা পাওয়ার একটাই উপায়। গিয়াস চৌধুরি। গিয়াস চৌধুরির সাথে একবার দেখা হয়েছে, আবার দেখা করলে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি করবেন না ভদ্রলোক।

বারোটার কাছাকাছি বাজে। একটা সিএনজি ভাড়া করলো শাহরিয়ার। আজ অফিস থেকে বেরুনোর সময় গাড়ি নিয়ে বের হওয়া দরকার ছিল।

চৌধুরি এন্টারপ্রাইজে গিয়ে গিয়াস চৌধুরিকে পাওয়া গেল। তবে জোহর নামাজের সময় হয়ে গেছে, অন্তত আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে শাহরিয়ারকে। আপত্তি নেই তাতে শাহরিয়ারের, দোকানের বাইরের চায়ের স্টলে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল একটা। চা বানাতে বলল দোকানিকে। দুপুরের কড়া রোদ উঠেছে। বারবার রিনা মেয়েটার চেহারাটা চোখে ভাসছিল। এই ধরনের মেয়ে আগেও দেখেছে শাহরিয়ার, মানে এই পেশার, কিন্তু এই মেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম, কথাবার্তায় অনেক সাবলীল, যেকোন কিছু খুব সহজেই ধরতে পারে। ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের সাথে মিশেছে, খুব কাছ থেকে দেখেছে ওদের, বন্ধু হয়েছে, কিন্তু এরপর এগুনো হয়নি। মনে হয়েছে সেইসব মেয়েদের কেউই তার সঙ্গি হওয়ার মতো নয়, কেন নয় সেই কারনটাও খুঁজে বের করতে পারে নি কোনদিন। কিন্তু রিনাকে দেখেই বুকের মধ্যে কেমন ধাক্কা লেগেছে, মনে হয়েছে এই মেয়েটাই হয়তো সেই বিশেষ কেউ। কিন্তু...রাস্তায় বাস-প্রাইভেট কারের পাল্লা দিয়ে চলা দেখতে দেখতে কিছুক্ষনের মধ্যে অন্য চিন্তায় ডুবে গেল। খুব সহজ সাধারন কোন জীবন ছিল না তার, নিজেকে কিভাবে এতোদূর টেনে নিয়ে এলো সেটা ভাবতে গিয়ে এখন খুব অবাক লাগে। জেদ ছিল, পড়াশোনার আগ্রহ ছিল, নইলে কী হতো কে জানে।

"চলেন, ভেতরে চলেন," গিয়াস চৌধুরি দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। নামাজ শেষ করে চলে এসেছেন, আধ ঘন্টা সময় খুব দ্রুতই কেটে গেল মনে হচ্ছে শাহরিয়ারের কাছে।

ভেতরে ঢুকে কাঁচ ঘেরা রুমে বসল দুজন।

"এখন কি জন্য? মশিউররে ধরছেন?"

"না," শাহরিয়ার বলল।

"রুবেলও তো মরল, খবর পড়লাম," বেশ আফসোসের সুরে বললেন গিয়াস চৌধুরি, "ঐদিনও দেখা হইল। ভালো ছেলে ছিল।"

"আজমল সাহেবের খুব ঘনিষ্ট তিনজন বন্ধু ছিল, আপনি জানেন ওরা কারা?"

"জানবো না কেন? ও সব কথা আমাকে বলতো।"

"নামগুলো বলবেন?"

"নাম তো আপনি জানেন, মশিউর, রুবেল আর..." একটু চিন্তা করছেন গিয়াস চৌধুরি, নামটা মনে পড়েও পড়ছেনা যেন।

"আর?"

"তুষার। আজমলের জানাযার দিন আসছিল, বিদেশ থাকে," গিয়াস চৌধুরি বললেন।

"উনার বাসা কোথায়?"

"ধানমন্ডির দিকে মনে হয়।"

"ঠিকানা দিতে পারবেন?"

"দাঁড়াও, ঠিকানা আছে কি না দেখি," বলে ড্রয়ার থেকে একটা পুরানো ডায়রী বের করলেন গিয়াস চৌধুরি, বেশ কিছুক্ষন ঘাটাঘাটি করলেন, তারপর পেলেন, একদম শেষ দিকের পাতায়, ছোট একটা চিরকুটে ঠিকানাটা লিখে বাড়িয়ে দিলেন শাহরিয়ারের দিকে।

"বাবা, আসল হারামি ঐ মশিউর, তুষাররে খুঁজে কি লাভ? ও কয়েকদিনের জন্য আসছে আবার চলে যাবে।"

"আপনি শিউর মশিউরের হাত আছে?"

"আমি তো শিউর, বাকিটা আপনারা বুঝবেন," গিয়াস চৌধুরি বললেন।

"মশিউরের ঠিকানা আছে?"

"না, কেন ঐদিন ঐ পোলার কাছ থেকে নেন নাই?"

"নিয়েছিলাম, হারিয়ে ফেলেছি," শাহরিয়ার বলল।

"তাইলে খুঁজে বের করেন, আমি জানি না।"

"ঠিক আছে, আমি আসি," বলে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার।

নতুন আরেকটা নাম পাওয়া গেল। তুষার। এখন এই তুষার আর মশিউর দুজনের খোঁজ লাগানো দরকার। এই দুজনকে পাওয়া গেলে অনেক কিছু খোলাসা হবে সম্ভবত। সবার আগে দরকার মশিউরকে। জানে আলম আর গিয়াস চৌধুরি দুজনই মশিউরকে সন্দেহ করছে।

মশিউরের মোবাইল ফোনে পরপর কয়েকবার ডায়াল করল শাহরিয়ার, ফোন

বন্ধ। এই লোকটাকে আগে ট্র্যাক করা দরকার ছিল, আরো আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ছিল, মাঝখানে নতুন মার্ডার কেসটা চলে আসাতে ব্যাপারটা পিছিয়ে গেল। শেষবার এই মোবাইলের লোকেশন দেখিয়েছিল ঢাকায়, অফিসে গিয়ে প্রথমে এই নাম্বারটার শেষ লোকেশন চেক করতে হবে। লোকটার ঠিকানা নেই, আর মনে হচ্ছে ঠিকানা থাকলেও এখন এই মানুষটাকে বাসায় পাওয়া যাবে না। এর চেয়ে তুষার আহমেদের সাথে কথা বলা যায়, গিয়াস চৌধুরির দেয়া ঠিকানাটা দেখল।

ক্ষুধা পেয়েছে খুব, অফিসে দুপুরের খাবার দিয়ে যায় পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে। তবে এখন অফিসে ফেরার ইচ্ছে নেই। অনেক কষ্টে একটা সিএনজি ভাড়া করল শাহরিয়ার। গরমে-ঘামে আর ক্ষুধায় সিএনজির মধ্যেই ছোটখাট একটা ঘুম দিয়ে যখন চোখ খুলল তখন গন্তব্যে প্রায় চলে এসেছে সে। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে স্মার্টফোনের চার্জ শেষ, আবু জামশেদকে এখানে আসার কথা জানিয়ে রাখা দরকার ছিল। কি না কী হয় কে জানে।

তবে তেমন কিছুই হলো না। তুষারের বাসার ঠিকানা পাওয়া গেলেও দারোয়ান বলল তুষার বাসায় নেই, সকালের দিকে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। মোবাইল নাম্বার, বাসার টেলিফোন নাম্বারটা চেয়েও লাভ হলো না, বুড়ো দারোয়ান দিল না, বলল সে এইসব নাম্বার জানে না, বোঝাই যাচ্ছিল সত্যি কথা বলছে না, কিন্তু আপাতত বুড়ো দারোয়ানের সাথে ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছিল না। বাসায় জোর করে ঢোকা ঠিক হবে না, কাজেই এরপর ঘন্টা তিনেক বাসার সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল শাহরিয়ার, রাস্তার পাশের টি-স্টল থেকে একগাদা চা-সিগারেট খেল, এরমধ্যে কাউকে ঐ বাসায় ঢুকতে কিংবা বেরুতে দেখা গেল না। খুব বেশি পরিশ্রম হয়নি, তারপরও ক্লান্ত লাগছিল। মোবাইল ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষন আগে, এখান থেকে অফিসে ফিরতে এখন দুই ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে, কাজেই বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিল শাহরিয়ার।

* * *

মন মেজাজ বিগড়ে আছে আবু জামশেদের। একটার পর একটা ফোন আসছে, পরপর দুটো মার্ডার কেস তার হাতে, দুটোর কোনটারই কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। সপ্তাহখানেক সময় দেয়া হয়েছে, এরমধ্যে কিছু করতে না পারলে পুলিশের হাতে চলে যাবে কেস দুটো। পুলিশ কিছু করতে পারবে কি না সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু নিজের ব্যর্থতা মেনে নেয়ার মতো লোক নন আবু জামশেদ। যে করেই হোক হিসেব মিলাতে হবে।

দুটো আলাদা ফাইল পাশাপাশি রেখেছেন, ফাইলগুলোতে আজমল চৌধুরি আর

ইফতেখার উদ্দিন রুবেল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে। এই দুজন পরস্পরের পরিচিত, বন্ধু, একসময় একই এলাকায় বসবাস ছিল, পড়েছেও একই স্কুলে, কিন্তু তারপর দুজনের পথ দু'দিকে চলে গেছে, একজন পৈত্রিক ব্যবসার হাল ধরেছে, অপরজন যোগ দিয়েছে চাকরিতে। আজমল চৌধুরির চারিত্রিক দোষ ছিল, সেটা সবাই জানে, রুবেল সম্পর্কে সেরকম কোন তথ্য না থাকলেও যে মেয়েটার ওখানে তাকে পাওয়া গেছে, সে মেয়েটা স্রেফ একটা প্রস্টিটিউট ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়া রুবেল বড় ধরনের ব্যাংকিং দূর্নীতির সাথেও জড়িত ছিল, যদিও সেসব কিছুই প্রমানিত হয়নি, কিন্তু কথা চাপা থাকে না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে পরপর কয়েকটা নাম্বারে ডায়াল করলেন। তেমন কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

আজ সারাদিন শাহরিয়ারের খবর নেই, সকালে বের হয়েছে, বিকেল গড়িয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত ফেরার নাম নেই। ওর মোবাইল ফোনটাও বন্ধ। এমনকি তানভীরও বের হয়েছে কী একটা কাজে। ওকেও ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন, এভাবে সারাদিন অফিসে বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানে নেই। কিছু কাজ সেরে আসা যেতে পারে।

অধ্যায় ৩৩

বাসায় ফিরে কারো সাথে কথা বলল না, ক্রিস্টিনা বারান্দায় বসে ছিল সারাদিন, অপেক্ষায়। বাবা-মা, সুমনার চেহারায়ও দুশ্চিন্তার ছাপ। কাউকে কিছু না বলে সরাসরি বেডরুমে ঢুকে পড়ল তুষার। খুব ক্লান্ত লাগছে, এতোটা ক্লান্ত সাধারনত লাগে না, কিন্তু আজ শরীরটা দূর্বল লাগছে, বিশেষ করে দুপুরে অ্যালকোহল পেটে যাওয়ার পর থেকেই, ঘুম যতোটুকু হয়েছে মনে হচ্ছে তারচেয়ে অনেক বেশি ঘুম জমে আছে চোখে। ক্রিস্টিনার উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। বিকেলের আগে রওনা দিয়েছে গাজীপুরের সেই এলাকা থেকে, এখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে। ডাইনিং টেবিলে খাবার বাড়া ছিল, কিন্তু ক্ষুধাও পায়নি। কোনমতে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়ল তুষার। একটু পর ক্রিস্টিনা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেও তার কিছুই টের পেল না, এতোটাই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। জেগে থাকলে সব টিভি চ্যানেলে দেখানো বিশেষ খবরটা নিশ্চয়ই চোখে পড়তো তার। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক আরিফুল হকের বাসস্থানে আগুন, পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের লোকজন গিয়েও আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে পারে নি, হতাহতের বিবরন পাওয়া যায়নি, তবে ধারনা করে হচ্ছে, আরিফুল হক যেহেতু হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতেন, তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম, এ ব্যাপারে সারারাত ধরে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ আপডেট প্রচার করবে। লেখকের প্রতি স্মৃতিচারনমূলক অনুষ্ঠান এরমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সবাই দাবি করছে প্রয়াত লেখকের আরো অনেক কিছু দেয়ার ছিল, যা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হলো।

অধ্যায় ৩৪

আজ বাসায় কেউ নেই, একজন গেছে দেশের বাড়িতে, আরেকজনের কোথায় নাকি দাওয়াত আছে, কাজেই একা একা বসে বিরক্তির হাত থেকে বাচতে টিভি ছাড়ল শাহরিয়ার, চ্যানেল ঘুরাতে ঘুরাতে দেশিয় চ্যানেলগুলোর বিশেষ লাইভ খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। খবরটা একই সাথে ইন্টারেস্টিং আবার দুঃখজনক। লেখকের কয়েকটা বই পড়া হয়েছিল, ভালো লিখতেন, বিশেষ করে প্রেমের উপন্যাসগুলো, সেই লেখক ভদ্রলোক মারা গেছেন, একটু আগে তার হুইল চেয়ারে বসা পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়িটা কাঠের তৈরি, খুব দামি আসবাবপত্র ছিল বাসায়, আগুন লাগার কারন জানা যায়নি, শট-সার্কিট হতে পারে, তবে অন্য কোন সম্ভাবনাও বাতিল করে দেয়া যাচ্ছে না। লেখক সাহেবের এই ঠিকানা শুধু কাছের একজন প্রকাশক আর কিছু বন্ধু হয়তো জানতো, আত্মীয়-স্বজন থাকলেও তাদের সাথে লেখক কোন যোগাযোগ রাখতেন না। এরকম অনেক তথ্য দেয়া হচ্ছে একের পর এক, দমকলবাহিনীর তৎপরতা দেখানো হচ্ছে একটু পর পর। বাড়িটা এমন জায়গায় বানানো যে আগুন ঠিকমতো নিয়ন্ত্রন করা না গেলে আশপাশের পুরো এলাকায় আগুন লেগে যেতে পারে।

বুয়া রান্না করে দিয়ে গেছে সন্ধ্যায়, নিজের জন্য খাবার নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসল শাহরিয়ার, বাসায় ঢুকেই মোবাইল ফোনটা চার্জে দিয়েছে। খেতে খেতে টিভি দেখছিল আর ভাবছিল, এভাবে আগুন লাগাটা কী দূর্ঘটনা, নাকি আত্মহত্যা, নাকি খুন! নিজের মাথায় ছোট করে একটা ঘুষি বসাল, সব কিছুতে সন্দেহ করা এখন বাতিকের মতো হয়ে গেছে। এটা হয়তো সাধারন একটা দূর্ঘটনা, এরকম একজন লেখকের এতো বড় শত্রু থাকার কথা না যে পুরো বাড়িসহ তাকে পুড়িয়ে ছাড়বে।

খাওয়া শেষ করে আরাম করে একটু বসার সাথে সাথেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। আবু জামশেদের কল, এর আগে কখনো রাতের এই সময়ে ভদ্রলোকের সাথে কথা হয়নি, জরুরি কিছু নিশ্চয়ই।

"শাহরিয়ার, তুমি কোথায়?"

"বাসায়।"

"আমি নীচে আছি, চলে এসো, কাজ আছে।"

"আসছি," বলল শাহরিয়ার, রাতের এই সময়ে কী কাজ আছে ধারনা করতে পারছে না, তবে আপাতত এসব নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে, খুব জরুরি কিছু না হলে এই সময় উনার ফোন করার কথা না, এমনকি তিনি এখন বাসার নীচে দাঁড়িয়ে।

বাসায় এসে কাপড়-চোপর পালটানো হয়নি, তৈরি হয়ে নেয়ার কোন ঝামেলা

নেই, মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে দরজা লক করে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার। আজ রাতে মনে হচ্ছে আর ফেরা হবে না।

ঢাকা কখনো ঘুমায় না, এখানকার মানুষেরা সম্ভবত সারারাত সজাগ থাকে, এগারোটার কাছাকাছি সময়ে উত্তরা পার হয়ে টঙ্গীর দিকে ঢুকতে গিয়ে প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে গাড়িটা।

এই পুরো সময়টা আবু জামশেদের সাথে শুধু মাত্র একটা বিষয়েই কথা হয়েছে, সেটা হচ্ছে শাহরিয়ার ডিনার করেছে কি না। হ্যা-বোধক উত্তর পাওয়ার পর থেকে আর কোন কিছু বলেন নি আবু জামশেদ। মুখ গম্ভির, মোবাইল ফোনে কিছু একটা ঘাটাঘাটি করছেন আর বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন।

আরো প্রায় আধঘন্টা পর টঙ্গী পার হয়ে গাজীপুর চৌরাস্তার দিকে চলে এলো গাড়িটা। জানালা খুলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন আবু জামশেদ, তার চোখ-মুখ থেকে এখনো বিরক্তির ছাপ কাটেনি। এতো দীর্ঘসময় কোন কথাবার্তা ছাড়া চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছো?" দীর্ঘক্ষনের নীরবতা ভাঙলেন আবু জামশেদ।

"জি, আমি টিভিতে খবরটা দেখেছি," শাহরিয়ার বলল।

"তোমার কি ধারনা?"

"স্যার, কোন ধারনা নেই।"

"গুড, সত্যি কথা স্বীকার করার জন্য," ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন আবু জামশেদ, "তবে আমার একটু ধারনা আছে।"

উনার ধারনাটা কী সেটা নিজ থেকে না বললে জিজ্ঞেস করাটা কেমন হয়ে যায়, ভাবল শাহরিয়ার।

"এই ঘটনার সাথে আজমল চৌধুরি আর মি. রুবেলের মৃত্যুর সংযোগ আছে, বুঝলে কিছু?"

"কি রকম সংযোগ, স্যার?"

"আমি জানি না, জানবো," বলে চুপ করে গেলেন আবু জামশেদ।

আবারো নীরবতা নেমে এলো গাড়িতে, চৌরাস্তা পার হয়ে গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। ঠিক কোথায় লেখকের বাড়ির অবস্থান জানা নেই শাহরিয়ারের, তবে আবু জামশেদ সম্ভবত ঠিকানা জানেন। ড্রাইভারকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

আরো প্রায় আধঘন্টা পর হাইওয়ে থেকে ডানে সরু একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল গাড়িটা। ঘটনাস্থল খুব বেশি দূরে নয়, বুঝতে পারছে শাহরিয়ার, রাতের এই সময়েও প্রচুর লোকসমাগম চারদিকে।

বারোটার উপর বাজে। আজ রাতে আর ঘুম হবে না, দমকল বাহিনীর লোকজন

দেখা যাচ্ছে, আছে পুলিশের দুটো ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স আর টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্রের কিছু লোকজন। ভিড় ঠেলে পুলিশের ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল দুজন। এতো ভিড়ের মাঝেও মনে হলো কেউ যেন অনুসরন করছে তাকে। চারপাশে তাকাল শাহরিয়ার, তারপর চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে।

* * *

তুষারের খুব ভাঙল খুব ভোরে, মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, ক্রিস্টিনা ঘুমাচ্ছে। আমেরিকায়ও সাধারনত ঘুম ভাঙে ভোরের দিকে, তারপর বাইরের ফাঁকা রাস্তায় কিছুক্ষন জগিং করে তুষার, বাসায় ফিরে দেখে নাস্তা নিয়ে বসে আছে ক্রিস্টিনা, এভাবে চলেছে এতোদিন, শুধু ঢাকায় আসার পর থেকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে, আজকেই প্রথম এতো ভোরে ঘুম ভাঙল।

সুটকেস খুলে ট্র্যাকিং ট্রাউজার আর টি-শার্ট পড়ে নিলো তুষার, আজ জগিং করা যায়, শীত আসে নি এখনো, তবে এই ভোরের আলাদা একটা শীতল আমেজ আছে, ধানমন্ডি লেক বাসা থেকে খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল বাসা থেকে। বুড়ো দারোয়ান ঘুমাচ্ছিল, সাত-সকালে তুষারকে এই রকম বেশে দেখে একটু অবাক হলেও গেট খুলে দিতে দেরি করেনি।

দীর্ঘদিন পর ঢাকার রাস্তায় এতো সকালে বের হওয়া, পথ-ঘাট সব আগের মতোই আছে, শুধু আমিই বদলে গেছি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল তুষার, তারপর ধীর লয়ে দৌড়াতে শুরু করল।

ঠিক ঘন্টাখানেক পর রাস্তার একপাশে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল তুষার, গত কিছুদিনের অনাভ্যাসে কষ্ট হয়েছে দৌড়াতে, বাকি দিনগুলো আর ফাঁকি দেয়া যাবে না। টি-স্টলে সবেমাত্র চা বসানো হয়েছে, এক কাপ চা খেয়ে বাড়ির পথ ধরবে বলে ঠিক করল। সময় কাটানোর জন্য সামনে দিয়ে যাওয়া হকারের কাছ থেকে একটা বাংলা দৈনিক কিনে নিলো।

খবরটা প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তুষার।

খবরটা দেখে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হেডলাইন আর একটা ছবি, আগুনে পুড়ছে একটা বাড়ি, চারপাশে দমকল বাহিনীর কিছু লোক। হেডলাইনটার সাথে মোটেও একমত নয় তুষার, "অগ্নি দূর্ঘটনার শিকার লেখক আরিফুল হক"।

আরিফ কোন দূর্ঘটনার শিকার নয়, আরিফকে খুন করা হয়েছে ঠান্ডা মাথায়। খুনটা কে করেছে সেটাই মাথায় আসছে না। মশিউর বলেছিল সে ঢাকার বাইরে চলে গেছে। এছাড়া মশিউরের সাথে আজমল আর রুবেলের সাথে ঝামেলা থাকলেও

আরিফের সাথে কোন ঝামেলা ছিল না, এমনকি তার সাথেও নেই। তাহলে কে এভাবে এক পর এক করে খুন করে চলেছে।

চায়ের অপেক্ষায় না থেকে উঠে দৌড়াতে শুরু করল তুষার, মোবাইল ফোনটা আরিফের বাসায় ভুলে রেখে এসেছিল, ঐ ফোন এখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, নতুন একটা নাম্বার নিতে হবে, ভাগ্য ভালো পুরানো সব নাম্বার আইফোনের অ্যাকাউন্টে ব্যাকআপ নেয়া আছে, বাসায় ঢুকে প্রথমেই আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা বাড়তি মোবাইল ফোনটা কাজে লাগাতে হবে, সুমনাকে বলে সীম জোগাড় করতে হবে। এরপর মশিউরকে ফোন করে দেখতে হবে ও কোথায় আছে, প্রয়োজনে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অথবা শেষ আরেকটা সমাধান আছে, সেটা হচ্ছে যতো দ্রুত সম্ভব দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। তবে এতোদিন পর পালিয়ে যাওয়ার জন্য আসেনি। এর শেষ না দেখে কখনো যাবে না।

অধ্যায় ৩৫

ভোর রাতের দিকে বাসায় ফিরেছে শাহরিয়ার, ফ্ল্যাটের বাকি সদস্যরা কিছুটা বিরক্ত হলেও কেউ প্রকাশ করেনি। বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই এরকম রাত শেষে ফিরতে হতে পারে, সে ক্ষেত্রে নিজের জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা করা দরকার, বাকিদের শুধু শুধু বিরক্ত করার কোন মানে নেই। বিছানায় শোয়ার সময় বাইরে আকাশে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছিল। অ্যালার্ম ঘড়িটা বালিশের পাশে রেখে চোখ বুজল শাহরিয়ার, ঘুম ভাঙল ঠিক ন'টার দিকে। আজ অফিসে একটু দেরি করে গেলেও সমস্যা কিছু ছিল না, কিন্তু গতরাতের ঘটনার পর নিজের ভেতর থেকেই একটা তাড়া অনুভব করছে সে।

একজন বিশিষ্ট লেখক, এভাবে পুরো বাড়িসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হলেও নিজের চোখকে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। খুব বেশি লোকজনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না লেখকের, প্রকাশকও মাত্র একজন, সেই ভদ্রলোক হুইলচেয়ারে বসে থাকা পুড়ে যাওয়া দেহটা দেখে সনাক্ত করেছেন, লেখকের সার্বক্ষনিক একজন সহকারি ছিল, সমস্যা হলো, সহকারির মৃতদেহ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুরো বাড়িটা এখনো অবশ্য খুঁজে দেখা বাকি।

আজকের মধ্যেই খবর পাওয়ার কথা। যদি সহকারির দেহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে অন্যরকম কিছু চিন্তা করতে হবে। এমনও হতে পারে, এখানে লেখকের সহকারির কোন হাত আছে।

তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শাহরিয়ার। আবু জামশেদ শেষ রাতে বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছেন, আসার পথে দুজনের মধ্যে কোন কথা হয়নি। ভদ্রলোক কী চিন্তা করছেন, কিভাবে দেখছেন বিষয়গুলো বুঝতে পারলে খুব সুবিধা হতো।

একটা সিএনজি ভাড়া করল শাহরিয়ার, আজ বাসে উঠার ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না।

ঠিক দশটায় আবু জামশেদের রুমে ডাক পড়ল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক, চেহারায় ক্লান্তির কোন ছাপ নেই, অথচ ঘুম কম হওয়ায় সবকিছুতেই কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল শাহরিয়ারের। একজন অতিথি আছে, এই লোকটাকে গতকাল রাতেও দেখেছিল, পরিচয় জানা হয়নি। শাহরিয়ারকে বসার জন্য ইশারা করলেন আবু জামশেদ।

"পরিচিত হও, ইনি হচ্ছেন ফুলকলি প্রকাশনির মালিক, মি. মোফাজ্জল হোসেন," আবু জামশেদ বললেন।

মোফাজ্জল হোসেনের সাথে হাত মেলাল শাহরিয়ার, ভদ্রলোককে দেখে মনে

হচ্ছে এই লোকের উপর পৃথিবী ভেঙে পড়েছে, সব হারিয়ে গেলে মানুষের চেহারায় যেমন অসহায়ভাব চলে আসে তেমন অবস্থা। কোনমতে হাত মিলিয়ে আবু জামশেদের মুখের দিকে তাকাল।

"স্যার, আমি তো শ্যাষ, আমার প্রকাশনি টিকেই ছিল এই লোকের উপর, এখন কী হবে চিন্তা করতেই ঘাম দিচ্ছে," মোফাজ্জল হোসেন বলল।

"এই প্রসঙ্গে পরে আসি," আবু জামশেদ বললেন, এই সময় রুমে তানভীর ঢুকল, ওকে দেখে একটু বিরক্ত হলো শাহরিয়ার, তানভীরকে ডাকার প্রয়োজন কি। তানভীর মোফাজ্জল হোসেনের ডান দিকে বসল, হাত মেলাল।

"আরিফ সাহেবের সাথে যে থাকতো, তাকে চিনতেন?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

"চিনতাম না, কয়েকবার এসেছে, আমার পিয়ন কুদ্দুসের সাথে কথা হয়েছে, পেমেন্ট নিতে আসতো, তবে বেশিরভাগ পেমেন্টই আমরা সরাসরি ব্যাংকে ডিপোজিট করতাম," মোফাজ্জল হোসেন বলল।

"ওর নাম কি ছিল?"

"তাহের আলী কিংবা তাহের ইসলাম, এইরকম কিছু।"

"পানি খাবেন?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ, মোফাজ্জল হোসেনকে যথেষ্ট নার্ভাস দেখাচ্ছে।

"না, বাসায় যাবো, ঘুমাবো, তারপর বাকি সব।"

"পানি খাবেন না?"

"ও আচ্ছা, পানি? দেন," নার্ভাসভাবে বলল মোফাজ্জল হোসেন।

"আচ্ছা, আরেকটা কথা," আবু জামশেদ বললেন, "উনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস আমাকে দেবেন, কোন ব্যাঙ্ক, অ্যাকাউন্ট নাম্বার কতো, এইসব।"

"আচ্ছা।"

"এক কাজ করুন, আপনি চলে যান, মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে যান, প্রয়োজন হলে কল করবো," আবু জামশেদ বললেন।

মোফাজ্জল হোসেন যেন এই কথাটার অপেক্ষা করছিল, উঠে বেরিয়ে গেল দ্রুত। যাবার সময় শাহরিয়ারের দিকে তাকাল একবার, তবে সেটা খুব অল্পসময়ের জন্য। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না।

"শাহরিয়ার আর তানভীর," দুজনের উদ্দেশ্যে বললেন আবু জামশেদ, "এই নিয়ে তিনটা কেস আমার হাতে। তোমরা এখন পর্যন্ত কিছু বের করতে পারোনি।"

"আমি ঐ মেয়েটার সাথে দেখা করেছি," শাহরিয়ার বলল, "আজমল চৌধুরি আর রুবেল সাহেবের আরেকজন বন্ধুর নাম জোগাড় করেছি, তাকে ট্র্যাক করতে হবে এখন।"

"কী নাম?"

"তুষার আহমেদ, কিছুদিন হলো আমেরিকা থেকে এসেছে।"

"এই ভদ্রলোক আসার পর থেকেই কি ঘটনা দুটো ঘটেছে?"

"আমি জানি না, উনি কবে এসেছেন, আমি ঠিকানা পেয়েছি, কিন্তু ভদ্রলোককে পাই নি," শাহরিয়ার বলল, "মনে হয় এই কেসগুলোর সাথে আজমল চৌধুরি আর রুবেল সাহেবের বন্ধু-বান্ধব জড়িত। ব্যবসায়িক কিংবা অন্য কোন কারনে খুন হন নি তারা, অন্তত এখন পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"আরেকজন আছে না, মশিউর? তার খবর কি?"

"মোবাইল ফোন নাম্বার দিয়ে লোকেশন ট্র্যাক করেছি, ভদ্রলোকের অবস্থান এখন বগুড়ায়।"

"মোবাইল ফোনটা হয়তো বগুড়ায়, সে হয়তো ঢাকায় এসে কাজ শেষ করে গেছে, হতে পারে না?" তানভীর বলল পাশ থেকে।

উত্তরের জন্য শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছেন আবু জামশেদ।

"হতে পারে," শাহরিয়ার বলল, "তবে হওয়ার সম্ভাবনা কম।"

"আমরা এখন আর সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলবো না," আবু জামশেদ বললেন, "আমার দরকার ফলাফল। এই খুনগুলো একজনের কাজ না এখানে আরো কেউ জড়িত আছে তা এখনি বের করতে হবে। আজমল চৌধুরি আর রুবেল সাহেবের মৃত্যুর সাথে গতকালের দূর্ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কি না সেটাও খুঁজে দেখতে হবে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আরিফুল হকের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ এতো কম ছিল যে, তার সম্পর্কে বাড়তি তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে।"

"আর উনার সহকারি?"

"আমরা এখনো নিশ্চিত না, পুরো বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এরমধ্যে কোথাও কোন লাশ থাকলে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমাদের আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।"

"পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে, স্যার?"

"না, তবে পোস্টমর্টেম করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না, পুড়ে একদম কয়লা হয়ে গেছে," আবু জামশেদ বললেন, "ওটা এখন শুধু একটা ফর্মালিটি ছাড়া আর কিছুই না।"

"উনার পরিবারের কাউকে পাওয়া গেছে?"

"চাচাতো ভাই-বোন যোগাযোগ করেছে, আরিফুল হকের ছোট এক বোন আছে, কিন্তু সে দেশের বাইরে, বাবা-মা অনেক আগেই মারা গেছে, কোথায় কবর দেয়া হবে জানতে চেয়েছিলাম, ওরা বলল আজিমপুর কবরস্তান," তানভীর বলল পাশ থেকে, "চাচাতো ভাই-বোনদের সাথেও খুব একটা যোগাযোগ ছিল না ভদ্রলোকের।"

"শাহরিয়ার, তুমি মশিউর আর তুষার আহমেদের খবর নাও," আবু জামশেদ বললেন, "তানভীর, তুমি আরিফুল হকের সহকারির খোঁজ-খবর নাও। কেন জানি

মনে হচ্ছে ঐ সহকারির বড় কোন ভূমিকা আছে। হয়তো লেখকের সব টাকা-পয়সা মেরে দিয়ে পালিয়েছে। আমরা আপাতত একটা রেড-এলার্ট দিয়ে রাখছি, তাহের নামের কেউ যেন সহজে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।"

"ঠিক আছে, স্যার," তানভীর বলল।

"তোমরা যাও এখন, আমি বাইরে যাচ্ছি, সন্ধ্যায় আপডেট চাই," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আবু জামশেদ।

রুম থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার। অফিসের গাড়ি বাইরে তৈরিই ছিল, ধানমন্ডির ঠিকানাটা বলল ড্রাইভারকে। রবীন্দ্রসঙ্গিত বাজছিল গাড়িতে, ড্রাইভারের রুচির প্রশংসা করতেই হয়। রাতে ঘুম হয়নি, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো। ঘন্টাখানেকের বেশি সময় লাগার কথা, এই সময়টা ছোটখাট একটা ঘুম দেয়া যায়। ঘুমিয়ে পড়ল শাহরিয়ার, অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখল পুরো সময়টা।

বুড়ো দারোয়ান চিনতে পারল তাকে। গতকালই দেখা হয়েছিল, চিনতে না পারার কথা নয়।

"তুষার সাহেব আছেন?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

অফিসের গাড়িটা রাস্তার একপাশে পার্ক করা হয়েছে, আজ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে শাহরিয়ার, যে করেই হোক তুষারের সাথে দেখা করতে হবে, নাহলে অন্তত ফোন নাম্বারটা নিতে হবে।

"আছে, আপনের নাম?" জিজ্ঞেস করল বুড়ো দারোয়ান।

"আমার নাম শাহরিয়ার, বলবেন, খুব জরুরি দরকারে দেখা করতে এসেছি," শাহরিয়ার বলল।

"আপনে দাঁড়ান," বলে ভেতরের দিকে চলে গেল বুড়ো দারোয়ান।

গেটের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শাহরিয়ার। তুষার আহমেদ যেহেতু বাসায় আছে, দেখা করতেই হবে যে করেই হোক। বুড়ো দারোয়ান কখন আসবে কে জানে, অপেক্ষা করার মুহূর্তগুলোর চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছুই নেই।

তবে খুব বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না, বুড়ো দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল শাহরিয়ার।

ড্রইং রুমে চুপচাপ বসে আছে শাহরিয়ার, পুরানো আমলের বাড়ি, ড্রইংরুমটাও সেই ধাঁচের, দামি সব আসবাবপত্র, তবে সবই পুরানো দিনের, কোন আমলে বানানো হয়েছে, তারপর আর বদলানো হয়নি, তবে জিনিসপত্রগুলো এখনো ঝকঝকে, তকতকে। দেয়াল ভর্তি সাদাকালো রঙিন অনেক ছবি, পারিবারিক ছবিসব, বাবা-মা, ভাই-বোন, হাসিখুশি একটা পরিবারের ছবি, তবে ছবিগুলোও পুরানো, কারন ছবিতে যে ছেলেটাকে তুষার বলে ধারনা করছে তার বয়স বড়জোর বাইশ-তেইশ হবে। এখনকার তুষার আহমেদের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হওয়ার কথা।

শাহরিয়ারের ধারনা ভুল নয়, লম্বা, সুদর্শন যে মানুষটা ঢুকল ঘরে তার বয়স

চল্লিশের কাছাকাছি, মাথাভর্তি চুল, জুলপির কাছে কিছু পেকেছে, ভদ্রলোকের পেছনে একজন বিদেশি মহিলাকেও দেখতে পেল, সেও যথেষ্ট সুন্দরী, তবে বিদেশি মহিলা একঝলক তাকে দেখেই ভেতরে ঢুকে গেল। চেহারায় যথেষ্ট উদ্বিগ্নতার ছাপ।

উল্টোদিকের সোফায় বসল লোকটা, তাকিয়ে আছে শাহরিয়ারের দিকে।

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল।

"জি, আমি শাহরিয়ার জামিল, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট," শাহরিয়ার বলল, উঠে হাত মেলাল।

"আমি তুষার আহমেদ, বলুন, কিভাবে সাহায্য করতে পারি," তুষার বলল।

"আমার কিছু তথ্য দরকার, আপনি কি আজমল চৌধুরিকে চিনতেন?"

"জি, আমার ক্লাসমেট ছিল, ঘনিষ্ট বন্ধু।"

"ইফতেখার উদ্দিন রুবেল?"

"সেও আমার ঘনিষ্ট বন্ধু।"

"আপনি জানেন বোধহয়, আপনার ঘনিষ্ট দুই বন্ধুই মারা গেছেন, স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কোনটাই।"

"জি, জানি, পত্রিকায় পড়েছি।"

"ঢাকায় আসার পর আপনার সাথে দেখা হয়েছিল?"

"হয়েছিল, আমি রুবেলের অফিসে গিয়েছিলাম, আজমলের সাথেও দেখা হয়েছে।"

"আচ্ছা," শাহরিয়ার বলল, "দুটো মৃত্যুই অস্বাভাবিক, কোন মোটিভ খুঁজে পাই নি এখনো আমরা।"

"হু," তুষার বলল, আরো কিছু বলতে গিয়েও বলল না, বয়স্ক একজন লোক ঢুকলেন ঘরে, তুষার আহমেদের বাবা হবেন, চেহারা প্রায় একই ধাঁচের। সাথে সাথেই বেরিয়ে গেলেন।

"আমরা ধারনা করছি দুটো মৃত্যুই পরস্পর সম্পর্কিত, তবে সেই সম্পর্কটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আমার কোন ধারনা নেই," তুষার বলল।

"শেষবার যখন দেখা হলো, আজমল চৌধুরি কিংবা মি. রুবেল কি কোন ঝামেলার কথা বলেছিল আপনাকে?"

"না, আসলে অনেকদিন পরে দেশে এসেছি, ঝামেলার কথা আমাকে বলার কথাও না," তুষার বলল।

"আমি যতোদূর জানি, আপনার চারজন খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, স্কুলে-কলেজে, সবখানে। এরমধ্যে আজমল চৌধুরি, মি. রুবেল মারা গেছেন। মশিউর বলে আরেকজন বন্ধু আছে আপনার, তাই না?"

"জি, মশিউর।"

"তার সাথে দেখা হয়েছিল?"

"হ্যা, হয়েছে।"

"তিনি এখন কোথায়?"

"আমি জানি না," তুষার বলল, তাকে বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছিল, ভদ্রলোক নিজেকে শান্ত রাখার প্রানপন চেষ্টা চালাচ্ছেন, ব্যাপারটা চোখ এড়াল না শাহরিয়ারের।

"আপনার এতো ঘনিষ্ট বন্ধু অথচ আপনি জানেন না?"

"মন দিয়ে শুনুন, আমি আমেরিকা থেকে এসেছি চৌদ্দ বছর পর, যতো ঘনিষ্ট বন্ধুত্বই থাক, এই দীর্ঘ যোগাযোগহীনতার ফলে আমাদের মধ্যে সেই আগের সম্পর্ক ছিল না।"

"জি, এটা খুবই স্বাভাবিক।"

"কাজেই, ওরা এখানে কি ঝামেলায় ছিল কিংবা কেন কী হচ্ছে এসব সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই নেই।"

আসলেই তাই হওয়ার কথা, ভাবল শাহরিয়ার। একজন মানুষ চৌদ্দ বছর পর এসে আগের মতো মিশে যেতে পারবে না, তাতে কিছুটা সময় অবশ্যই লাগবে।

"খুব বেশি সময় নেবো না," শাহরিয়ার বলল, "এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন।"

আশপাশে কেউ নেই, নিজে উঠে ভেতরে চলে গেল তুষার, পানি আনতে। ড্রইং রুমটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিলো শাহরিয়ার, কিছুক্ষনের মধ্যেই পানির গ্লাস হাতে ঢুকল তুষার।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকল শাহরিয়ারের কাছে, সে অপরিচিত, ঠিক আছে, কিন্তু এক কাপ চা অফার করার মতো ভদ্রতা আশা করেছিল তুষার আহমেদের কাছ থেকে। কিংবা...

হ্যা, লোকটা নিশ্চয়ই খুব টেনশনে আছে, তাই ভদ্রতা করে চা অফার করার কথা মাথায় আসে নি নিশ্চয়ই। কী নিয়ে এতো টেনশন!

পানির গ্লাস রাখতে রাখতে চা-বিস্কিট ভর্তি ট্রে নিয়ে একজন ঢুকল। ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের একজন মহিলা, চিনতে সমস্যা হলো না, দেয়ালভর্তি অনেকগুলো ছবিতে এরমধ্যেই চেহারাটা পরিচিত হয়ে গেছে, ইনি নিশ্চয়ই তুষার আহমেদের বোন।

চায়ের কাপ তুলে নিলো শাহরিয়ার, চমৎকার একটা গন্ধ আসছে চা থেকে। সম্ভবত এলাচি দিয়েছে।

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি কিছু একটা জানেন, আমার সাথে শেয়ার করছেন না," চায়ের চুমুক দিতে দিতে বলল শাহরিয়ার।

"আমি কিছু জানি না," তুষার বলল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ারের দিকে, "আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি?"

"কোথায়?"

বেশ কিছুক্ষন একদৃষ্টতে তাকিয়ে থাকল তুষার, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

"না, ভুল হচ্ছে, আপনাকে দেখি নি," বলল তুষার, "বাই দ্য ওয়ে, আপনার সাথে শেয়ার করার মতো কোন তথ্য নেই আমার কাছে, যদি কোন তথ্য পাই, জানাবো।"

"ঠিক আছে," বলে একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল তুষারের দিকে, "এখানে আমার নাম্বার আছে, প্রয়োজনে কল দেবেন।"

ভিজিটিং কার্ডটা শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল তুষার।

এবার যাবার সময় হয়েছে, চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার, "আসি তাহলে।"

শাহরিয়ারকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল তুষার।

ক্রিস্টিনা, সুমনা, বাবা-মা সবাই ড্রইং রুমে বসে আছে তার অপেক্ষায়। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের একজন কেন তার কাছে এলো, ঝামেলার কোন ব্যাপার আছে কি না জানার জন্য সবাই উদ্রগ্রীব হয়ে আছে। ওদেরকে খুব সাবধানে বোঝাতে হবে। নইলে ঢাকায় বাকি যে কয়দিন আছে বাসা থেকেই বের হতে দেবে না। ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তুষার। মশিউরের খোঁজ নিতে বেরুতে হবে। ও কি আদৌ বেঁচে আছে কি না কে জানে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল তুষার, কারো সাথে কোন কথা বলল না, বাইরে এসে একটা সিএনজি ডাকল, উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি।

সিএনজি অটোরিক্সা চলতে শুরু করেছে, তার পেছন পেছন আসছে কালো একটা মাইক্রোবাস।

ড্রাইভারকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে শাহরিয়ার, কোনভাবেই দৃষ্টির আড়াল করা যাবে না অটোরিক্সাটাকে, তবে ঢাকার রাস্তার ট্র্যাফিক জ্যামে একটা অটোরিক্সা যেভাবে ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে যায়, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

অধ্যায় ৩৬

দুপুরের পরপর অফিস থেকে বেরিয়েছেন আবু জামশেদ। মাথাটা ভার হয়ে আছে, শরীরটাও ভালো লাগছে না। এভিডেন্স কালেকশন টিমকে সকালে আরিফুল হকের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে, ওরা ফিরে এসে কল দেবার কথা। এখনো ফিরে আসে নি নিশ্চয়ই, ঐ ধ্বংসস্তুপে তেমন কিছু পাওয়ার কথা না, তবু সাবধানতার মার নেই।

মাথায় দিনরাত নামগুলো ঘুরছে শুধু, আজমল চৌধুরি, ইফতেখার আহমেদ রুবেল, আরিফুল হক, এরপর কে? সত্যিই কী ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি একটার সাথে একটার সম্পর্ক আছে? শাহরিয়ারের উপর যথেষ্ট ভরসা আছে, তানভীরের উপরও। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে এই কেসগুলোতে তার নিজেরও একটু মাঠে নামতে হবে। মাঠে নামার প্রাথমিক অংশ হিসেবে ধানমন্ডির একটা স্কুলকে বেছে নিয়েছেন তিনি। এই স্কুলের ছাত্র ছিল আজমল চৌধুরি আর ইফতেখার আহমেদ রুবেল। স্কুল থেকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ন তথ্য পাবেন বলে মনে হচ্ছে না, কারন ওরা স্কুল ছেড়েছে অনেক আগে। ততোদিন আগের কেউ স্কুলে আছে কি না কে জানে।

স্কুলটা ঢাকার পুরানো এবং ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর অন্যতম, ভালো রেজাল্টের দিক থেকে প্রথম দশের মধ্যেই থাকে। তিনি স্কুলের গেটের উল্টোদিকে গাড়ি পার্ক করলেন। স্কুল ছুটি হয়েছে অনেক আগে, এইসময় স্কুলে তেমন কারো থাকার কথা নয়, তবু এগিয়ে গেলেন তিনি।

ভাগ্য ভালোই বলা যায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষককে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আরেকটু দেরি হলেই পাওয়া যেতো না। প্রধান শিক্ষকের রুমে বসে আছেন আবু জামশেদ।

প্রধান শিক্ষক মোঃ শামসুর রহমানের বয়স পঞ্চান্নের কাছাকাছি, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মুখভর্তি দাঁড়ি, শক্তপোক্ত গড়ন।

"আপনি যাদের কথা বললেন ওদের আমি চিনি," মোঃ শামসুর রহমান বললেন, "আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারন, বুঝলেন।"

"জি।"

"আমি তখন মাত্র জয়েন করেছি স্কুলে, ওরা তখন ক্লাস নাইনে কি টেনে পড়ে, একদম বিচ্ছু ছিল, বিশেষ করে রুবেল আর আজমল।"

"বাকি দু'জন?"

"বাকি দু'জন একটু কম, কিন্তু আজমল ছিল একদম সীমার বাইরে, একবার স্কুলে খেলনা পিস্তল নিয়ে এসে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল," মোঃ শামসুর রহমান বললেন,

"ওর বাবা ছিল স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান, তাই কিছু করা যায়নি, নইলে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হতো।"

"মশিউর আর তুষার?"

"ওরা ভালো ছিল, তবে একবার একটা ঘটনা ঘটলো যে," বলতে বলতে থেমে গেলেন মোঃ শামসুর রহমান, "আপনি কী আমার কথা রেকর্ড করছেন নাকি?"

"না, রেকর্ড করছি না, আপনি নির্ভয়ে বলুন," আবু জামশেদ বললেন।

"বয়স হয়েছে, এখন আর কোন ঝামেলায় যেতে চাই না, বুঝতেই পারছেন," মোঃ শামসুর রহমান বললেন, "ওদের গ্রুপের একটা নাম ছিল, ফোরস্টার গ্রুপ। গ্রুপ লিডার ছিল আজমল। একবার হলো কি, স্কুলের এক ছেলেকে ওরা চারজন মিলে পেটাল, কারন কি জানি না, একদম রক্তারক্তি অবস্থা, পুলিশ এলো, চারজনকেই ধরে নিয়ে গেল, পরে সবাইকে ছাড়ান হলেও তুষারের বাবা খুব কড়া ছিলেন, তিনি তুষারকে ছাড়াতে যাননি।"

"কে ছাড়াতে গিয়েছিল?"

"আমি, আর কে?" মোঃ শামসুর রহমান বললেন, "ওর জন্য খুব মায়া লাগছিল।"

"আচ্ছা, এছাড়া আর কোন ঘটনা আছে যা আপনার এখনো মনে পড়ে?"

"না, আর তেমন কিছু মনে নেই, অনেক আগের কথা তো।"

সত্যিই অনেকদিন আগের কথা, এরবেশি কিছু মনে রাখাও কঠিন, ভাবলেন আবু জামশেদ।

"ঠিক আছে, আমি আসি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," মোঃ শামসুর রহমানের সাথে হাত মিলিয়ে বাইরে চলে এলেন তিনি।

এখানে এসে খুব একটা লাভ হয়নি, তবে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, একসময় এই চারজনই বেশ ভায়োলেন্ট ছিল, মারামারি-গন্ডগোল পছন্দ করতো। এই কেসে ব্যাপারটা কোন না কোনভাবে কাজে লাগবে।

গাড়ি স্টার্ট দিলেন, অফিসে যাওয়া দরকার। তুষার আর মশিউর, কেন জানি মনে হচ্ছে এই দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছে কালপ্রিট। কিন্তু এদের সাথে আরিফুল হকের এখন পর্যন্ত সংযোগ পাওয়া যায়নি, আরেকটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে।

আরিফুল হকের চাচাতো ভাইদের একজনকে ডেকেছিলেন, সন্ধ্যার দিকে অফিসে আসবে বলেছে, ওর কাছ থেকে লেখক সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ইচ্ছে হচ্ছিল সব ছেড়েছুড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল, সাইফুলের ফোন।

"হ্যা, সাইফুল, বলো," গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন তিনি।

"স্যার, কিছু এভিডেন্স পেয়েছি, কিন্তু আর কোন বডি পাওয়া যায়নি," সাইফুল বলল ওপাশ থেকে।

"তুমি নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত, স্যার। পুরো ধ্বংসস্তুপ তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে।"

"এভিডেন্স কি পেয়েছো?"

"তেমন কিছু না, কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তবে সেগুলো সম্ভবত লেখক আর তার সহকারির হবে।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করিয়েছো?"

"না, স্যার, কাল সকালে রিপোর্ট করতে পারবো, আমরা মাত্র অফিসে ঢুকলাম।"

"রিপোর্ট বের না করেই ধারনার কথা বলাটা মানায় না, সাইফুল। আমি তোমার কাছ থেকে কোন ধারনা চাইনি।"

"স্যরি, স্যার।"

মোবাইল ফোনটা একপাশে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে কিছু একটা পাওয়ার আশা করছিলেন তিনি, সাইফুলের কথায় হতাশ হয়েছেন। এই খুন খুব সাধারন কোন কারনে হয়নি, আরিফুল হকের সহকারির বোধ-বুদ্ধি নিশ্চয়ই এতোটা কম না যে এতো বড় একজন লেখককে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করবে।

"ওকে, রাখি।"

সাইফুলের সাথে কথা শেষ করে এক্সেলেটরে চাপ বাড়ালেন তিনি। অফিসে ফিরে একটা প্ল্যান করতে হবে।

অধ্যায় ৩৭

মশিউরের বাসা বদলায়নি, আগে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। একতলা বাসাটা পুরাতন, ছাদটা টিনের, ঢাকা শহরের বুকে এখনো এইরকম একটা বাসা টিকে আছে কিভাবে কে জানে। সুমনার কাছে সীম পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই ব্যবহার করছে এখন তুষার, মশিউরের মোবাইল ফোন বন্ধ, বাসার গেটের কাছে গিয়ে দেখল সেটাও বাইরে থেকে তালা মারা। খুব বাজে একটা সন্দেহ হচ্ছিল, মশিউরের হয়তো খুব খারাপ কিছু হয়েছে। কিংবা এই সব কিছুর পেছনে আছে মশিউর। আরিফের উপর সন্দেহ কিছুটা থাকলেও সেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এখন। ওর জন্য খারাপ লাগছিল, সেদিনও দেখা হলো, আর সেদিন রাতেই দূর্ঘটনা ঘটল, অবশ্য ওটা দূর্ঘটনা না, কেউ সাজিয়েছে সুন্দরভাবে।

এই কেউটা কে সেটা মাথায় আসছে না। একজন একজন করে সরিয়ে দিচ্ছে, অথচ কাউকে সন্দেহও করা যাচ্ছে না। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ছেলেটাকে যথেষ্ট স্মার্ট মনে হয়েছে, কালো একটা মাইক্রোবাসে করে পিছু নিয়েছিল, লাভ হয়নি, সময়মতো টের পেয়েছিল, নইলে পিছু নিয়ে চলে আসতো এখানে। ওরা কিভাবে এগুচ্ছে জানে না, তবে কোথাও কোন সূত্র পেয়েছে যা ওকে ধানমন্ডি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, ছেলেটার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে খোলামেলাভাবে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো, তবে ওরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতো না, এমনকি তাকেও পারলে সন্দেহ করতো। কেননা এখন বেঁচে আছে মাত্র দুজন, মশিউর আর সে। খুনি অন্য কেউ নয়, এই দুজনের কোন একজন, কারন বাকি আর কেউ কিছু জানে না, জানা সম্ভব না। গেট থেকে চলে আসবে এই সময় একটা শিসের শব্দ শুনতে পেল তুষার। শিসটা পরিচিত এবং অনেক অনেক বছর আগে স্কুলে পড়ার সময় প্রায়ই এরকম করে শিস বাজাত। মশিউর আশপাশে আছে নিশ্চয়ই, চারপাশে তাকাল, শব্দের উৎসের খোঁজে, কাউকেই চোখে পড়ল না।

এবার চোখে পড়ল, মশিউর বাসায় আছে, গেটের ভেতরেই আছে, শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। এগিয়ে গেল তুষার।

"তুই ভেতরে?" গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তুষার।

"তোর ডান দিকে ছোট একটা ইটের টুকরা আছে, ওটা সরালে গেটের চাবি পাবি," গেটের ওপাশ থেকে চাপা গলায় বলল মশিউর।

ছোট কয়েকটা ইটের টুকরো তুলে দেখল তুষার, একটার তলায় গেটের চাবি পেল। গেটের তালায় ঢোকাতেই খুলে গেল। তুষারকে প্রায় টান দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল মশিউর।

গেটটা ভেতর থেকে লাগাল সাথে সাথে।

মশিউরের চোখ দুটো লাল, মুখ ফোলা, ঠোঁটের নীচটা ফাটা, খানিকটা রক্ত জমে আছে সেখানে।

"কি হয়েছে তোর?" জিজ্ঞেস করল তুষার।

"কথা পরে, আগে ভেতরে ঢোক," বলে তাড়া দিল মশিউর।

সামনের রুমটায় ঢুকল তুষার, অন্ধকার একটা রুম, অন্ধকার সয়ে আসতে একটু সময় লাগল, রুমটা আগের মতোই আছে, তবে এখন আসবাবপত্র নেই বললেই চলে, একপাশে টিভি চলছে, সাউন্ড একদম লো ভলিয়ুমে দেয়া, বেশ মোটাসোটা একটা জাজিম বিছানো মেঝেতে, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সিগারেটের প্যাকেট, কোকের বোতল, তেহারীর প্যাকেট।

তুষারের পেছন পেছন ঢুকল মশিউর।

"দোস্ত, আমি যে বগুড়ায় ছিলাম, তুই কাউকে বলেছিস?" মশিউর জিজ্ঞেস করল।

"না'তো। কাকে বলবো?"

জাজিমে বসল মশিউর, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

"আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেখানে কে নাকি আমার খোঁজ করছে, আমি বাইরে ছিলাম," একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল মশিউর, "আমি হোটেলে ঢুকেই আর দেরি করি নাই, সোজা ঢাকায়।"

"কবে আসলি?"

"গতকাল রাতে।"

"আরিফের খবর তো জানিস?"

"হু, পুরা বাড়ি সুদ্ধা উড়াইয়া দিছে," মশিউর বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকতাছে না।"

"এখন আমাদের কী করা উচিত?"

"তুই আমেরিকা চলে যা, আমি দেখি কী করা যায়," মশিউর বলল।

"চলে যাবো, কার ভয়ে?"

"জানি না, তবে জান বাঁচানো ফরজ।"

"আমি যাবো না," তুষার বলল, "অন্তত কে আমাদের পেছনে লেগেছে সেটা বের না করা পর্যন্ত।"

"বের করে কী লাভ! এতো রিস্কের কী দরকার! তুই আমেরিকা ছিলি, ওটাই তো ভালো ছিল।"

"তাহলে তুই কী করবি?"

"আপাতত কয়েকদিন গর্তে লুকিয়ে থাকি, তারপর দেখা যাবে।"

ঘরটার দিকে আরেকবার তাকাল তুষার, একসময় সুন্দর সাজানো গোছান ছিল, এখন একদম হতশ্রী অবস্থা।

"তুই এই বাড়িটার একটা গতি করছিস না কেন? চাইলেই তো ডেভেলপাররা নিয়ে নেবে।"

"আমি একা মানুষ, আগে পরে কেউ নাই, বিয়ে শাদি জীবনে হবে না, এসব ঝামেলা করার দরকার কি।"

"বিয়ে করতে তোকে মানা করেছে কে?"

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মশিউর, তুষারের দিকে তাকাল, তবে কিছু বলল না। তুষার হয়তো ভুলেই গেছে, একসময় ওর বোনকে ভালোবাসতো সে, সেই ভালোবাসাই যে তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এতোটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেনি।

"বাদ দে, ওসব কথা, চল, দুজনে মিলে কিছু খাই, তেহারি আনাবো?"

"তোকে তেহারি এনে দিচ্ছে কে?"

"ব্যবস্থা আছে," বলে বালিশের নীচ থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে আনল মশিউর, ফোনটা অন করে একটা নাম্বারে ডায়াল করল, "সামনের রেস্টুরেন্টের একটা ছেলে ম্যানেজ করছি, ফোন করলে যা যা লাগবে এসে দিয়ে যাবে, যাবার সময় বাইরে দিয়ে গেট তালা মেরে যাবে, বুদ্ধিটা কেমন?"

"ভালোই," তুষার বলল, তেহারি খাওয়ার মতো রুচি নেই এখন, বাসায় যাওয়া দরকার, ক্রিস্টিনা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে, ওকে কিছু বলে আসা হয়নি।

"তুই তেহারি খা, আমি বাসায় যাই," বলে উঠে দাঁড়াল তুষার।

"তোর জন্যও তো অর্ডার করলাম," মশিউর বলল।

"আরেকদিন খাবো, এখন যাই," ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তুষার, গেটের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

"গেটটা লক করে চাবিটা ঐ ইটের তলায় রেখে যাস," মশিউর বলল।

"আচ্ছা, আর তুই কোন ঝামেলা হলে আমাকে ফোন দিবি," তুষার বলল।

মশিউর এসে ওর সাথে হাত মেলাল, কাঁধে চাপড় দিল।

মন খারাপ হয়ে গেল তুষারের, তবে কিছু বলল না, বাইরে এসে গেটটা লক করে চাবিটা একটা ইটের টুকরোর নীচে চাপা দিয়ে রাখল। আজ সাথে গাড়ি আনে নি, একটা সিএনজি ডাকল তুষার। বাসায় যাবে, যদিও পালিয়ে যাওয়াটা খুব একটা শোভন দেখায় না, কিন্তু এখন একটা পথই খোলা আছে, অন্তত ক্রিস্টিনার মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আমেরিকায় চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অচেনা শত্রুর সাথে যুদ্ধ চলে না।

সিএনজি চলতে শুরু করেছে। একবুক হতাশা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে তুষার।

অধ্যায় ৩৮

সারা সকাল কাজের মধ্যে চলে যায়। এই বাড়িতে আসার পর থেকে রান্না-বান্নার দায়িত্বটা নিজের উপর নিয়ে নিয়েছে সুমনা। রান্না-বান্নার ক্ষেত্রে ক্রিস্টিনার কথাটা আলাদাভাবে মাথায় রাখতে হয়, মেয়েটা ঝাল খেতে পারে না, এমনি দেশি খাবার খাচ্ছে খুব আগ্রহ করে, তারপরও ওর জন্য স্পেশাল করে কিছু না কিছু রান্না করতেই হয়, তুষারকে নিয়ে ঝামেলা নেই। যা রান্না করা হয় সবই নাকি তুষারের ভালো লাগে। বহুদিন পর ভাইকে খাওয়ানোর মধ্যে আলাদা একটা শান্তি পায়।

সকাল সকাল পুলিশের কোন এক ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ছেলে এসেছিল। এ নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন সে, এতোবছর দেশে ফিরে কোন ঝামেলায় পড়ে যায় তুষার কে জানে। হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই ওদের জন্য ভালো হবে, ভাবল। গুন গুন করে একটা গান গাইতে গাইতে ঠিক করল আজ খিচুরি রান্না করবে, যদিও আজ বৃষ্টি হচ্ছে না, বাইরে কড়কড়ে রোদ, তবু ক্রিস্টিনাকে এখনো খিচুরি খাওয়ানো হয়নি, মেঘলা দিনের অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ নেই।

ক্রিস্টিনার কথা ভাবতে ভাবতে সুমনা দেখল ক্রিস্টিনা ঢুকছে রান্নাঘরে। হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরেছে, ফর্সা মানুষ, তাই খুব চমৎকার মানিয়েছে রঙটা। প্রতিদিন নিয়ম করে ক্রিস্টিনা রান্নাঘরে ঢোকে, একটা চেয়ার নিয়ে বসে থাকে একপাশে, দুজনের মধ্যে গল্প হয়, হাসি-ঠাট্টা হয়, ক্রিস্টনাকে দেখে হাসল সুমনা, আজ হাতে করে একটা পত্রিকা নিয়ে এসেছে, কথা বলার ফাকে ফাকে মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাবে।

"আজ খিচুরি রান্না করছি, নাম শুনেছো এই জিনিসের?" সুমনা বলল।

হাসল ক্রিস্টিনা, বিজ্ঞের হাসি, "তোমার ভাই আমাকে খিচুরি রান্না করে খাইয়েছে। খিচুরি দুই রকমের হয়, নরম আর শক্ত, রাইট?"

"ভাইয়ার হাতে খিচুরি! অবিশ্বাস্য! সে জিনিস খেয়েও তোমার কিছু হয়নি?"

"না তো," একপাশে চেয়ার নিয়ে বসল ক্রিস্টিনা, "আজকের পত্রিকা দেখেছো?"

সুমনা তাকাল ক্রিস্টিনার হাতের ইংরেজি পত্রিকাটার দিকে, না, আজ সকালে পত্রিকা পড়া হয়নি।

"না, কেন?"

"তোমাদের এখানকার একজন বিশিষ্ট লেখক মারা গেছেন, দূর্ঘটনায়। পুরো বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই, সাথে লেখকও।"

"তাই? লেখকের নাম কি?"

"দাঁড়াও, দেখে বলছি," বলে পত্রিকার পাতা দেখল ক্রিস্টিনা, "উনার নাম আরিফুল হক, খুব বিখ্যাত লেখক ছিল মনে হচ্ছে।"

সুমনার মনে হচ্ছিল তার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে, মাথাটা ঘুরে উঠল। একটান দিয়ে ক্রিস্টিনার হাত থেকে পত্রিকাটা নিল। খুব স্বাভাবিকভাবে খবরটা পড়ার চেষ্টা করল, পারল না।

নিজের অজান্তেই তার দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। কান্না চেপে কোন মতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের রুমের দিকে দৌড়াল সুমনা।

সুমনার প্রতিক্রিয়ায় বেশ অবাক হয়েছে ক্রিস্টিনা, পত্রিকাটা মেঝেতে পড়ে আছে, তুলে নিল। লেখক হয়তো সুমনার খুব প্রিয়, তাই খুব আঘাত পেয়েছে মৃত্যু সংবাদ শুনে, ভাবল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমে চলে এলো ক্রিস্টিনা। সুমনার দুই যমজ ছেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মাথাভর্তি কালো চুলের এক যুবকের দুই পা জড়িয়ে ধরে। যুবকের তাতে কোন আপত্তি দেখা যাচ্ছে না, তার দুই হাতে দুটো গিফটের প্যাকেট, কোনটা কাকে দেবে তা নিয়ে খেলছে ছেলেদুটোর সাথে।

ক্রিস্টিনাকে দেখে এগিয়ে এলো যুবক। হেসে হাত বাড়াল।

"নাইস টু মিট ইউ, ক্রিস্টিনা," যুবক বলল।

অবাক হলেও হাত মেলাল ক্রিস্টিনা, কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে।

"তুমি জুনায়েদ?" পরিষ্কার বাংলায় বলল ক্রিস্টিনা, গত কিছুদিনে তার উচ্চারনে অনেক উন্নতি হয়েছে।

"আপনি তো দেখি সুপার বাংলা বলেন," হাসল যুবক, "হ্যা, আমি জুনায়েদ। তা তুষার ভাই কোথায়? বাকিরা?"

"তুষার বাইরে," ক্রিস্টিনা বলল, "সুমনাকে ডেকে আনছি।"

"আপনার যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি," বলে ভেতরের রুমের দিকে পা বাড়াল জুনায়েদ, ছেলে দুটো এখনো ওর দুই পা ধরে ঝুলে আছে, দেখে হাসি পেল ক্রিস্টিনার।

"তুমি বসো, আমি ডাকছি," বলল ক্রিস্টিনা, সুমনা এখনো কাঁদছে কি না জানে না, তবে এই মুহূর্তে জুনায়েদের সামনে না পড়াই ভালো। লেখক হোক আর যাই হোক, অচেনা পুরুষের জন্য একজন মেয়ের কান্নাকাটি তার স্বামি হয়তো ভালোভাবে নাও নিতে পারে।

* * *

"আমি তোমাকে কোথাও খুঁজে পাই নি," সুমনা বলেছিল সেদিন, বিকেলের শেষ আলো মুছে যাবে যে কোন সময়, তার সামনে বসে থাকা মানুষটার মুখে সেই বিকেলের আলো এসে পড়েছে, বিষাদমাখা মুখটাকে আরো বিষাদময় করে তোলার জন্যই যেন।

"আমি চাই নি আমাকে কেউ খুঁজে পাক," বলল মানুষটা, "আমি ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছি।"

"একবারও আমার কথা ভাবলে না," সুমনা বলল আবার, এবার কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলার স্বর ভেঙে এলো কিছুটা।

"ভেবেছি বলেই তো হারিয়ে গেছি," ম্লান হাসিতে মুখ ভরে গেছে মানুষটার, সুমনার ইচ্ছে করছিল দৌড়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। কিন্তু অদ্ভুত এক সংকোচ ঘিরে রেখেছে তাকে, চাইলেও অনেক কিছু করা যায় না।

"এখন কি করছো?" জিজ্ঞেস করল সুমনা।

"দেখি, লেখালিখি করে কিছু করা যায় কি না," মানুষটা বলল, "এখন তো হাত দুটোই সম্বল।"

সুমনা তাকাল তার প্রিয় মানুষটার দিকে। হ্যা, এই মানুষটার লেখার ক্ষমতা আছে, পুরনো চিঠিগুলো এখনো সে ফেলে দিতে পারেনি, মাঝে মাঝেই যেগুলো পড়ে তার কান্না পায়, কেঁদে হাল্কা হওয়ার জন্য এখনো সে মাঝে মাঝে চিঠিগুলো পড়ে।

"তুমি সত্যিই লিখবে?"

"হুম, এছাড়া করার কিছু নেই আমার।"

"আমার কথা লিখবে কোথাও, আমাদের কথা?"

"লিখতে পারি," কিছুটা অন্যমনস্ক দেখাল মানুষটাকে, "তবে সত্যিই লিখবো কি না জানি না।"

"আমি পড়বো তোমার সব লেখা, অপেক্ষা করবো কোন একদিন হয়তো আমাকে নিয়ে লিখবে," সুমনা বলল, এগিয়ে যাচ্ছিল হুইল চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে, পেছন থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে সংবিত ফিরল। জুনায়েদ ডাকছে তাকে, সবে বিয়ে হয়েছে, এখনো চোখের আড়াল করতে চায় না তার বর।

"তুমি কি একা?" জিজ্ঞেস করল সুমনা।

"আমাকে নিয়ে ভেবো না, আমি যেতে পারবো," বলে হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল মানুষটা।

স্থানুবত কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল সুমনা, জুনায়েদ দু'হাতে দুটো আইসক্রীম নিয়ে দৌড়ে আসছে তার দিকে।

রমনা পার্কে এটাই আরিফের সাথে শেষ দেখা, প্রায় আট বছর আগে। তারপর থেকে যখনই আরিফুল হকের বই বেরিয়েছে কিনেছে সুমনা, প্রতিটি বই তার পড়া, প্রতিটা চরিত্রকে সে চেনে, এইসব চরিত্রের ভিড়ে নিজেকে খুঁজে ফেরে। আরিফ কথা দিয়েছিল কোন একদিন হয়তো তাকে নিয়ে লিখবে। কথা রাখে নি আরিফ।

ক্রিস্টিনার কাছ থেকে কোনরকমে পালিয়ে নিজের রুমে বসে আছে সুমনা। আজ তার খুব কান্না পাচ্ছে, আরিফ এতোদিন তার জীবনে হারিয়ে যাওয়া একটা তারা হয়ে ছিল, এবার সে তারাটি পুরোপুরি নিভে গেল। যার খোঁজ আর কোনদিন পাবে না সুমনা।

অধ্যায় ৩৯

অফিসে ঢোকার পর একটার পর একটা ফোন আসছে, মনে হচ্ছে, সবাই একসাথে লেগেছে তার পেছনে। আজমল চৌধুরি আর ইফতেখার উদ্দিন রুবেল হত্যা মামলায় কোন অগ্রগতি হয়েছে কি না জানার জন্য, সেই সাথে আছে সাংবাদিকদের উৎপাত। একদন্ড স্থির হতে দিচ্ছে না কেউ। টেবিলের উপর লেখক আরিফুল হকের পোস্ট মর্টেম ফাইলটা রাখা, একপলক দেখে ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। আজ সকালে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়েছে লেখককে, যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে বলে শুনেছেন, লাশ কাউকে দেখতে দেয়া হয়নি।

"কাম ইন? স্যার," দরজার কাছে শাহরিয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

"এসো।"

শাহরিয়ার ঢুকল, দেখে মনে হচ্ছে বেশ ক্লান্ত। ইশারায় বসতে বললেন।

"খবর কী বলো?"

"স্যার, আজ তুষার আহমেদের সাথে দেখা করেছি," শাহরিয়ার বলল, "উনার কাছ থেকে তেমন কোন তথ্য পাইনি।"

"আচ্ছা?" আবু জামশেদ বললেন, শাহরিয়ারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

"তবে আমার ধারনা তিনি কিছু একটা লুকাচ্ছিলেন?"

"সেটা কি রকম?"

"খুব মেপে মেপে কথা বললেন আমার সাথে। উনার সাথে কথা শেষ করে বেরিয়ে বেশিদূরে যাই নি, রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি বেরুনোর কিছুক্ষনের মধ্যেই খুব তড়িঘড়ি করে উনি বেরিয়ে গেলেন," শাহরিয়ার বলল, "পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে উনার সিএনজিটাকে আর ট্র্যাক করতে পারিনি।"

"ভদ্রলোকের মোবাইল নাম্বার আছে তোমার কাছে?"

"না।"

"ওকে, আগামি দুইদিন তোমার কাজ হচ্ছে এই তুষার আহমেদকে ফলো করা, কোথায় যায়, কার সাথে কথা বলে এসব বের করা।"

"জি, ঠিক আছে।"

"মশিউর সম্পর্কে কিছু পেয়েছো?"

"মোবাইল নাম্বারটা বন্ধ, বাসার ঠিকানা জোগাড় করতে পারি নি এখনো," শাহরিয়ার বলল।

একটা চিরকূট বাড়িয়ে দিলেন তিনি শাহরিয়ারের দিকে। মশিউরের বাসার ঠিকানা জোগাড় করেছেন স্কুল থেকে। যদিও দিতে চায় নি প্রথমে আর মশিউর

এখনো এই ঠিকানায় থাকে কি না নিশ্চিত নন। তবু আপাতত এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে দেখা যেতে পারে।

চিরকূটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল শাহরিয়ার। এভিডেন্স কালেকশন টিম এখনো ফিরে আসে নি, ওরা আসলে ওদের সাথে বসতে হবে, ভাবলেন আবু জামশেদ।

দুপুরে খাওয়া হয়নি, খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। টেবিলে অনেকগুলো ফাইল রাখা, একটার পর একটা ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, প্রায় সবগুলোই সাধারন খুনোখুনির ঘটনা, খুব একটা বেগ পেতে হয়নি, কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো একদম হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

তানভীর রুমে ঢুকল এই সময়, বেশ ব্যস্ত ভঙ্গিতে। দরজায় টোকা দিতেও ভুলে গেছে যেন।

"স্যার, ঐ লোক সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি?"

"কার সম্পর্কে?"

"লেখক আরিফুল হকের সহকারি," চেয়ার টেনে বসল তানভীর, "ওর নাম তাহেরুল ইসলাম, বয়স বাইশ-তেইশের কাছাকাছি, উত্তরার দিকে একটা এতিমখানায় মানুষ, পড়াশোনা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, তারপর থেকে আরিফুল হকের সাথে ছিল।"

"এই তথ্য পেলে কী করে?"

"ফুলকলি প্রকাশনীর পিয়নের কাছ থেকে। মোফাজ্জল সাহেবের সাথে খুব বেশি যোগাযোগ না থাকলেও ঐ পিয়নের সাথে নাকি খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাহেরের।"

"এতিমখানায় খবর নিয়েছো? ওখানে নিশ্চয়ই আরো ডিটেইলস পাওয়া যাবে।"

"উত্তরায় বেশ কয়েকটা এতিমখানা আছে, আমি খবর লাগাচ্ছি, স্যার।"

"খবর লাগাও। কারন ঐ বাড়িতে দ্বিতীয় কোন ডেডবডি পাওয়া যায়নি, তাহেরই হয়তো আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে, ওকে খুব শিগগির ধরা দরকার।"

"খুবই সম্ভব।"

"ঠিক আছে, যাও তাহলে, কাজ করো," বললেন তিনি, তানভীর বের হয়ে যাচ্ছিল, "আরেকটা জরুরি কাজ করতে হবে।"

"জি, স্যার, বলুন।"

"লেখক আরিফুল হকের পুরো জীবনবৃত্তান্ত দরকার, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জোগাড় করো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

তানভীর বেরিয়ে গেলে টেবিলের একপাশে রাখা দুটো সংবাদপত্র কাছে টেনে নিলেন তিনি। একটায় পেছনের পাতায় বেশ বড় করে আরিফুল হকের একটা ছবি ছাপা হয়েছে, বেশ তরুন বয়সের ছবি, হাস্যোজ্জল। ইংরেজি পত্রিকার মাঝামাঝি লেখককে নিয়ে সংবাদটা পেলেন, সেখানেই একই ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে

ছোট আকারে। এই লেখকের কী এই একটাই ছবি ছিল? অদ্ভুত!

সংবাদপত্রের পাশে কাগজের একটা প্যাকেট লক্ষ্য করলেন, প্যাকেটটা তানভীরের হাতে ছিল। প্যাকেটটা হাতে নিলেন, সম্ভবত কিছু বই আছে ভেতরে, ভুল করে রেখে গেছে টেবিলে। কাগজের প্যাকেটটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন, পিয়নকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে ওর কাছে।

ফুলকলি প্রকাশনীর মোফাজ্জল হোসেনের ভিজিটিং কার্ড বের করলেন ড্রয়ার থেকে। মোবাইল নাম্বারটায় ডায়াল করলেন। ভেবেছিলেন অচেনা নাম্বার দেখে কল রিসিভ করবে না, তবে একটা রিং হওয়ার পরই কল রিসিভ হলো।

"হ্যালো, কে?" বেশ উদ্বিগ্ন গলায় ওপাশ থেকে প্রশ্ন করেছে মোফাজ্জল হোসেন।

"হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে আবু জামশেদ বলছি, কেমন আছেন? চিনতে পেরেছেন?"

"জি, চিনতে পেরেছি," ওপাশ থেকে বেশ সময় নিয়ে বলল মোফাজ্জল হোসেন।

"আমাকে আরিফুল হক সাহেবের কিছু ছবি পাঠান, আপনার কাছে নিশ্চয়ই আছে?"

"ছবি? কীরকম ছবি?"

"আপনারা বইয়ের ব্যাক-কাভারে লেখকের ছবি দেন না? সেরকম," বেশ অবাক হয়েছেন তিনি মোফাজ্জল হোসেনের প্রশ্নের ধরন দেখে।

"ও, ছবি তো নাই, গত নয় বছরে যতো বই বের হইছে কোনটায় ছবি দিতে পারি নাই, আমি কতোবার রিকোয়েস্ট করছি, কাজ হয় নাই।"

"একটাও না? পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়নি?"

"না।"

"আপনার কখনো ইচ্ছে করে নি আপনার একমাত্র বিখ্যাত লেখকের আরেকটা ছবি তুলে রাখতে?"

"স্যার, উনার সাথে আমার জীবনে দেখাই হইছে একবার, সেই নয়-দশ বছর আগে, তারপর আর দেখা হয় নাই, ফোনেই কথা হইতো, দেখা করতে চাইলে না করতো, কোন সাংবাদিকরে জীবনে ইন্টারভিউ দেয় নাই।"

"কোন সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দেয় নি? অদ্ভুত! কারন কি?"

"কারন জানি না, খুব ঘাউড়া লোক ছিল, কতো সাধাসাধি করলাম, কিন্তু রাজি হয় নাই," ওপাশ থেকে বলল মোফাজ্জল হোসেন, "স্যার, আর কিছু বলবেন?"

"না।"

"তাহলে রাখি?"

আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, ফোন কেটে দিলেন আবু জামশেদ। আরিফুল হককে হঠাৎ করেই এক রহস্যময় চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল। লেখকরা সাধারনত স্তুতি পছন্দ করে, খ্যাতির বিড়ম্বনাকে জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে মনে করে, অথচ

এই লোক এতোটা জনপ্রিয় হওয়ার পরও সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গেছে, কারন কি?

পিয়নকে দিয়ে তানভীরকে ডেকে পাঠালেন। লেখক আরিফুল হকের জীবনবৃত্তান্তের দরকার নেই, শুধু দরকার ছোট একটা তথ্য।

অফিস থেকে বেরুলেন রাত ন'টার দিকে, একা একা বসে টিভি দেখতে, বই পড়তে ইদানিং বড় বেশি বিরক্তি চলে এসেছে। এই সময় একাই ড্রাইভ করে যান, নতুন এই হাউজিং সোসাইটিটা তৈরি হয়েছে খুব কয়েক বছর হলো, লোকজন সবেমাত্র আসা শুরু করেছে, ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন বেশিদিন হয়নি, খুব নিরিবিলি পরিবেশ চারদিকে, আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন কেউ উঁকিঝুঁকি দেয় না, এটাই সবচেয়ে স্বস্তির বিষয়। অন্যান্য দিনের মতো গাড়ি পার্ক করলেন রেস্টুরেন্টের সামনে, তার জন্য খাবার প্যাক করাই ছিল, কাউন্টারে বিল দিয়ে দ্রুত চলে এলেন। খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা।

সাদা-ভাত আর শাক-সব্জি, এই হচ্ছে তার রাতের খাবার, তবে আজ ক্ষুধা নেই কেন জানি। বহুদিন পর বারবার মনে হচ্ছে বড় বেশি ভুল হয়ে গেছে কোথাও, যে ভুল আর কোনদিন শোধরানো যাবে না।

* * *

ডিনারের পর অন্যান্য দিনের মতো ড্রইং রুমে বসেছে সবাই, আজকের পরিবেশটা অন্যরকম, জুনায়েদ এসেছে অনেকদিন পর এবং ঠিক করেছে আগামি কিছুদিন এই বাড়ি থেকেই অফিসের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। ওর সাথে আগে দেখা হয়নি, প্রথম দেখাতেই এতো আপন বানিয়ে ফেলল ছেলেটা যে মনের মধ্যে ছোট একটা অপরাধবোধ ছিল, সুমনার বিয়েটা হয়তো ভালো হয়নি, সেই অপরাধবোধটা মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই। ফুর্তিবাজ ছেলে, আড্ডা দিতে পছন্দ করে, এরমধ্যেই সবাইকে একডজন কৌতুক বলে ফেলেছে। এখন প্ল্যান চলছে ক্রিস্টিনা আর তুষারকে নিয়ে কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়। বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙামাটি, সিলেট এক এক করে লিস্ট করা হলো, এরপর নাকি ভোটাভুটি হবে।

তুষার একটা সিগারেট ধরানোর জন্য বাইরে এলো। সিদ্ধান্ত নেয়াই আছে, চলে যেতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে আজ রাতে সেই সিদ্ধান্তের কথা বলা যাবে না, সবাই ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছে, এরমধ্যে আমেরিকা ফেরত যাওয়ার কথা বলে ওদের আনন্দে পানি ঢেলে দিতে ইচ্ছে করছে না, এছাড়া সুমনা আর ক্রিস্টিনা কিছু একটা সন্দেহ করছে, সকালে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে ঐ ছেলেটার জিজ্ঞাসাবাদের পর থেকে। এখন আমেরিকা যাওয়ার কথা বললে ওরা নিশ্চয়ই আরো বেশি টেনশন করবে।

ড্রইং রুমে সবার সাথে আবার বসল তুষার, জুনায়েদ একটার পর একটা প্ল্যান

করেই যাচ্ছে। শেষে বান্দরবানে যাওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে পাশও হয়ে গেছে। ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল তুষার, ছেলেমানুষের মতো হাসছে, বহুদিন পর ওর মুখে এরকম হাসি দেখতে পেল।

না, এখনই আমেরিকা যাওয়ার কথা বলা যাবে না। এখন ওদের ছেলেমানুষি প্ল্যানের সাথে তাল মেলান দরকার। তারপর দেখা যাক, কী হয়।

আড্ডা শেষে বারোটার দিকে নিজেদের রুমে এলো দুজন। অনেকদিন রাত জেগে গল্প করা হয় না, তুষারের জন্য এক কাপ কফি বানিয়ে এনেছে ক্রিস্টিনা, কফির কাপ হাতে নিয়ে জানালার কাছে বসল তুষার। জানে এখন ক্রিস্টিনা কিছু প্রশ্ন করবে, উত্তর দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিল মনে মনে।

"তোমাদের একজন বিখ্যাত লেখক মারা গেছেন, আরিফুল হক, তুমি জানো?" জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টিনা, খুব মোলায়েম স্বরে।

"হ্যা, জানি।"

"তোমার পরিচিত?"

কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না তুষার, ক্রিস্টিনা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করছে।

"হ্যা, তাকে তো সবাই চেনে।"

"উনার দূর্ঘটনা খবরে সুমনা যেভাবে কাঁদল, খুব অবাক লেগেছে আমার কাছে।"

"আচ্ছা," বলল তুষার, কফির কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেল কিছুক্ষনের জন্য, সুমনা আর আরিফ, হ্যা, বহুদিন আগে না মেলা এক সমিকরনের নাম। এই সমিকরন না মেলার পেছনের মানুষটাও আর কেউ নয়, সে নিজে। অদ্ভুত এক বিষন্নতা আর অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

"শুধু আচ্ছা?"

"কাঁদতেই পারে, বিখ্যাত লেখক ছিলেন, তার বই সবাই পড়ে," তুষার বলল।

"আমি চাই না তুমি আমার কাছে কিছু লুকাও," ক্রিস্টিনা বলল, "আর যদি লুকাও, তাহলে এমন কিছু লুকিও যা কোনদিনই তোমার আমার সম্পর্কে ফাটল ধরাবে না।"

"আমি কি কিছু লুকাই?"

উত্তর দিলো না ক্রিস্টিনা, তুষারের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জানালা দিয়ে সুন্দর বাতাস আসছে, কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে তুষার।

অধ্যায় ৪০

সকাল সকাল কনফারেন্স রুমে এভিডেন্স কালেকশন টিমের সাথে বসেছেন আবু জামশেদ। ওরা যেসমস্ত জিনিসপত্র কালেকশন করেছে তার মধ্যে কয়েকটা আইটেম আলাদা করেছেন তিনি।

এরমধ্যে একটা হলো মোবাইল ফোন, দুটো স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে, দুটোই পুড়ে গেছে, চেষ্টা করা হচ্ছে ভেতর থেকে কোনভাবে যদি সীম উদ্ধার করা যায়। তাহলে হয়তো এই নাম্বারগুলোর মালিক কারা ছিল তা জানা যাবে। প্রচুর মদের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে, অ্যালকোহলের কারনে আগুন আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, ধারনা করলেন তিনি। এরমধ্যে বিশেষ একটা বোতল আলাদা করে রাখলেন, সবগুলো বোতল এক ব্রান্ডের হলেও এই বোতলটা আলাদা ব্রান্ডের, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে। আসবাবপত্র সব পুড়ে ছাই, এমনকি হুইল চেয়ারটাও। ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি, আগুন সব আঙুলের ছাপ মুছে দিয়েছে।

সবচেয়ে অবাক হয়েছেন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, পুরো কম্পিউটারটা প্রায় গলে গেলেও সিপিউ খুলে ভেতরে কোন হার্ড ড্রাইভ খুঁজে পায় নি এভিডেন্স কালেকশন টিম, এমনকি সিকিউরিটি সিস্টেমের ফুটেজ রাখার জন্য আলাদা একটা ডিভাইস সেট করা ছিল, সেখানেও হার্ডডিস্ক নেই। এছাড়া পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেম খুঁটিয়ে দেখেছে তার দল, শট সার্কিট থেকে বাসায় আগুন লাগেনি।

এখান থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায়, লেখকের বাড়িতে কোন দূর্ঘটনা ঘটে নি, পরিকল্পনা করে আগুন লাগানো হয়েছে, কম্পিউটার আর সিকিউরিটি সিস্টেমের সব ডেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগুন লাগানোর আগে এবং সেটা বাসার ভেতরের কেউ করেছে। দুজন বাসিন্দার একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তার মানে সন্দেহভাজন আর কেউ নয়, ঐ তাহেরুল ইসলাম।

তানভীর খোঁজ লাগাচ্ছে আরিফুল হক এবং তাহেরের, আগামিকালের মধ্যে সব খবর পাওয়া যাবে।

"স্যার," সাইফুল বলল, "মোবাইলের একটা সীম উদ্ধার করা গেছে, টেলিকম অপারেটরকে নাম্বারটা দেয়া হয়েছে, এই সীম কার নামে রেজিস্ট্রেশন করা একটু পরেই জানতে পারবো।"

"অন্য সীমটার কি অবস্থা?"

"ওটা একদম গলে গেছে, স্যার।"

"কম্পিউটার?"

"কিছু করার নেই, অন্তত হার্ড ডিস্কটা থাকলে কিছু তথ্য জোগার করা যেতো।"

"মদের বোতলটার ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছো? মানে এই ব্রান্ড কোথায় পাওয়া যায়, এইসব?"

"খুবই দামি জিনিস, ঢাকার কিছু ডিউটি ফ্রি শপে পাওয়া যায়," সাইফুল বলল।

তিনি তথ্যগুলো টুকে রাখছেন একটা নোটপ্যাডে।

"আর কিছু জানানোর আছে তোমাদের?"

"আপাতত না, স্যার।"

"ঠিক আছে, তোমরা কাজ করো, আমি রুমে যাচ্ছি," বলে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন আবু জামশেদ।

একটা সন্দেহ হঠাৎ করেই মাথায় খেলে গেল। সন্দেহটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন আবার। রুমে এসে একটার পর একটা ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু সন্দেহটা বারবার ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, তাহেরকে খুঁজে লাভ নেই। তাহেরের লাশ এরমধ্যেই দাফন হয়ে গেছে আজিমপুর গোরস্তানে। খুঁজতে হবে লেখক আরিফুল হককে। চমৎকারভাবে সবার কাছে নিজেকে মৃত বলে প্রমানিত করতে চাইছে লেখক। কিন্তু এর পেছনের মোটিভ কি? আজমল চৌধুরি আর রুবেলের মৃত্যুর সাথে লেখক আরিফুল হক কি কোনভাবে জড়িত?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য আরো গভীর করে খুঁড়তে হবে লেখক আরিফুল হকের অতীতটাকে।

তানভীরের নাম্বারে ডায়াল করলেন। ফোন বন্ধ। পরপর কয়েকবার চেষ্টা করেও পেলেন না, রাগ হচ্ছিল খুব। দরকারের সময়ে কাউকে ফোনে পাওয়া না গেলে কী লাভ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে।

দরজায় নক হলো।

"কাম ইন," বললেন তিনি।

সাইফুল ঢুকল।

"স্যার, সীমটা কার জানতে পেরেছি," বলল সাইফুল।

"কার?"

"সুমনা আহমেদ নামে রেজিস্ট্রেশন করা।"

"ঠিকানা?"

"উত্তরার একটা ঠিকানা পেয়েছি।"

"ঠিকানাটা লিখে দাও, এক্ষুনি," বললেন আবু জামশেদ, হাতের সামনে থাকা নোটবুকটা বাড়িয়ে দিলেন সাইফুলের দিকে।

দ্রুত ঠিকানা লিখে দিল সাইফুল। একনজরে ঠিকানাটা দেখে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি।

শাহরিয়ার আর তানভীর দু-জনেই বাইরে। ওদের জন্য অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। বাইরে গাড়ি তৈরিই ছিল। তিনি উঠে ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে চোখ বুজলেন। যেতে অনেকক্ষন সময় লাগবে, এই সময়টা গভীর মনোযোগে কেসগুলো নিয়ে আরো ভাবা দরকার। ভাবতে ভাবতেই একসময় সমাধান বেরিয়ে আসবে।

সুমনা আহমেদের ঠিকানা খুঁজে পেতে সময় লাগল না, তবে জানা গেল এই ঠিকানা সুমনা আহমেদের শ্বশুড় বাড়ির, সে এই মুহূর্তে তার বাপের বাড়ি আছে, ধানমন্ডিতে। তিনি ঠিকানা টুকে নিলেন নোটবুকে, শ্বশুড় বাড়ির লোকজন জানতে চাইছিল বারবার কি জন্য সুমনাকে দরকার, তিনি শুধু বলেছেন সরকারি একটা ভেরিফিকেশনের জন্য সুমনার সাথে কথা বলা দরকার। এতে ওরা আশ্বস্ত হয়েছে কি না বোঝা যায়নি।

উত্তরা থেকে ধানমন্ডি, অনেক দূরের পথ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তিনি আবার চোখ বুজলেন, তবে এবার ঘুমিয়ে পড়লেন সাথে সাথে। মোবাইল ফোনটা কয়েকবার বাজল, সাইলেন্ট করা ছিল বলে টের পেলেন না, তানভীর আর শাহরিয়ার, দুজনই একসাথে কল করেছে তাকে।

* * *

শরীর খারাপ লাগছে শাহরিয়ারের, গত কাল সন্ধ্যা থেকেই, অফিস শেষ হওয়ার আগেই বাসায় চলে গিয়েছিল, ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার পরপর বেরিয়ে মশিউরের বাসায় ঠিকানায় যাবে, কিন্তু তা আর যাওয়া হয়নি। আজ সকালে অফিসে ঢুকেই বেরিয়ে পড়েছে, মশিউরের ঠিকানা খুঁজে বের করতে সমস্যা হয়নি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হলো না, একতলা বাড়িটার সামনের গেটে তালা। ঘন্টা তিনেক বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি, চায়ের দোকানে চা খাওয়া, কিছু লোকজনকে মশিউর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কোন কাজ হয়নি।

সন্ধ্যার আগে আগে অফিসের দিকে রওনা দিয়েছে শাহরিয়ার, কাছাকাছি চলে এসেছে, আজ কোন মুখে আবু জামশেদের সামনে দাঁড়াবে ভাবতে গিয়েই অস্বস্তি হচ্ছিল, রিপোর্ট করার মতো কিছু নেই।

উনি অফিসে আছেন কি না নিশ্চিত না, তাই ভদ্রলোকের মোবাইলে কল দিল। উনি রিসিভ করলেন না। তবে তার বদলে অচেনা একটা নাম্বার থেকে কল এলো।

"হ্যালো, শাহরিয়ার বলছি," কল রিসিভ করে বলল শাহরিয়ার।

"তানভীর বলছি," ওপাশ থেকে উত্তর এলো।

বেশ কিছুক্ষন লাগল বুঝতে তানভীর কে, কারন অফিসে তানভীর নামে একজন সহকর্মি আছে তা প্রায়শ মনেই থাকে না। এই লোকটার নাম্বার সেভ করা ছিল না।

"বলেন," শাহরিয়ার বলল, কিছুটা বিরক্তির সুরে। তানভীরের সাথে জরুরি কোন কথা থাকার কথা নয়।

"আপনি এখন কোথায়?"

"কেন?"

"মশিউর সাহেবের বাসায় গিয়েছিলেন?"

"হ্যা," শাহরিয়ার বলল।

"এখন কোথায়?"

"এতো প্রশ্ন কেন করছেন? কী বলতে চান বলে ফেলেন।"

"আপনি উনার বাসার সামনে চলে যান, এক্ষুনি," তানভীর বলল, তার কণ্ঠে অনুরোধের সুর ছিল।

কিন্তু এভাবে তানভীরের কথায় কাজ করলে তো হবে না, ভাবল শাহরিয়ার, ছেলেটা আগে জয়েন করলেও কোনমতেই তার উপর অর্ডার করার অধিকার রাখে না, সে একমাত্র আবু জামশেদের নির্দেশে যে কোন কাজ করতে পারে।

"আমি অফিসের কাছাকাছি চলে এসেছি," শাহরিয়ার বলল, "এখন ফেরত যাওয়া সম্ভব না।"

"আপনি গেলে একটা প্রান হয়তো বেঁচে যাবে," তানভীর বলল ওপাশ থেকে।

"কার বেঁচে যাওয়ার কথা বলছেন?"

"মশিউর রহমান, আর কে?"

"ভদ্রলোক বাসায় নেই, পালিয়েছে কোথাও সম্ভবত।"

"তারপরও আপনি যান, প্লিজ।"

"বসের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে আগে," শাহরিয়ার বলল।

"উনি কল ধরছেন না," তানভীরের কণ্ঠে এবার সত্যিকারের উদ্বেগ টের পেল শাহরিয়ার, "কাছাকাছি থাকলে আমিই চলে যেতাম।"

"আপনি কোথায়?"

"আমি উত্তরায়, অনেক দূরে।"

বাসটা ট্র্যাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে, মহাখালি মোড়ের কাছাকাছি, বাস থেকে নেমে পড়তে হলে এটাই আসল সময়।

"ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি," শাহরিয়ার বলল।

"থ্যাঙ্কস," তানভীর বলল, "আপনি যান। মশিউর সাহেব বাসায় আছেন, কোথাও যাননি। আপনি তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবেন, কেউ আপনাকে আটকাবে না।"

"মশিউর বাড়ির ভেতরে? আপনি জানলেন কি করে?"

"আপনি সারাদুপুর ঐ এলাকায় ঘোরাঘুরি করেছেন, অনেককে জিজ্ঞেস

করেছেন মশিউর সম্পর্কে...”

“হ্যা, তো...”

“আমি যখন পুলিশে ছিলাম, কিছু ইনফর্মার পরিচিত ছিল, ওদের একজন বলল।”

“তাহলে আমাকে বলল না কেন সরাসরি?”

“ওরা আপনাকে চেনে না। ঝুঁকি নিতে চায় নি, তাই আমাকে জানিয়েছে।”

“রিয়েলি...?”

“রিয়েলি, শাহরিয়ার ভাই। প্লিজ যান, আমি স্যারকে বলে ফোর্সের ব্যবস্থা করছি।”

সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও আসল তথ্য পায় নি, আর দূর থেকে সব জেনে বসে আছে তানভীর। ছেলেটার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা ছিল না, দেখে কম বয়েসীই মনে হয়। বোঝা যাচ্ছে বয়স নিয়ে আন্দাজটা একেবারেই মেলেনি।

আবার উল্টো পথে যাওয়া। একটা সিএনজি অটোরিক্সা ডাকল শাহরিয়ার। মশিউরকে সত্যি সত্যিই যদি বাসায় লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে সিদ্ধান্তে আসা খুব সহজ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে খুনগুলো মশিউরই করেছে কিংবা মশিউর জানে এসব কাজকর্মের পেছনে আসল হোতা কে।

অটোরিক্সা চলছে, বদ্ধ খাঁচায় নিজেকে বন্দি প্রানী মনে হচ্ছে শাহরিয়ারের কাছে। মোবাইল ফোনে আরেকবার চেষ্টা করল আবু জামশেদের নাম্বারে, রিং বেজে বেজে কেটে গেল। এরকম হওয়ার কথা না।

ঢাকার বাতাসে ধুলো উড়ছে, একটু বৃষ্টি হলে হয়তো ভালো হতো। বৃষ্টি নিয়ে তার কিছু অদ্ভুত স্মৃতি আছে। তবে কোনভাবেই সেই স্মৃতির কাছে ফিরতে চায় না শাহরিয়ার। তার হিসেব নিকেশ বর্তমান কাল নিয়ে। অতীত সে শুধু ফেলে আসা অধ্যায়।

অধ্যায় ৪১

তানভীর গত দুদিন ধরে টঙ্গী, উত্তরা আর গাজীপুর খুঁজে একজন মাত্র তাহেরুল ইসলামকে সনাক্ত করতে পেরেছে, পুরানো ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে যখন ধৈর্য্যহারা অবস্থা তখনই এই তাহেরুল ইসলামের বিস্তারিত পাওয়া গেল গাজীপুর কিশোর সংশোধনাগারে।

তানভীর সরকারি তদন্তে এসেছে, কাজেই লোকজন সবাই তাকে সহযোগিতা করল, তবে তাহের সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু বলতে পারলো না। কারন এরমধ্যে সংশোধানাগারে অনেক পরিবর্তন এসেছে, প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে গেছে, বেড়েছে এর ভেতরে কিশোরের সংখ্যা। ফাইলে তাহেরের অল্পবয়সের যে ঝাপসা সাদাকালো ছবিটা আছে সেটা দেখে বর্তমানের কাউকে সনাক্ত করা খুব কঠিন।

ছবিটা মোবাইল ফোনে তুলে এনেছে। ফাইল ঘেঁটে তথ্য পাওয়া গেল তাহের মাত্র দশ বছর বয়সে গাজীপুর সংশোধনাগারে আসে, বাবা-মা দুজনেই মৃত, এক এতিমখানায় বড় হচ্ছিল, তবে ফাইলে বিশদ কোন তথ্য নেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অল্পবয়সেই মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার, এছাড়া সে এলাকার এক বয়স্ক লোককে ছুরিকাঘাত করে, ভদ্রলোকের অপরাধ ছিল সে তাহেরকে সদোপুদেশ দিতে গিয়েছিল, যাই হোক, পুলিশে ধরা পড়ার পর তাহেরকে এই সংশোধনাগারে পাঠানো হয় এবং তার পরের সাত-আট বছর তাহের এই সংশোধনাগারেই ছিল।

বেরিয়ে আসার পথে গেটে দারোয়ানকে ডেকে তাহেরের ছবি দেখাল তানভীর, এই লোকটা বয়স্ক, সম্ভবত অনেকদিন ধরে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানে। তাহেরের ছবি দেখেই চিনতে পারল বয়স্ক দারোয়ান।

"আমি ওরে চিনি," দারোয়ান বলল, "শুরুতে খুব ভালা আছিল। কিন্তু পরে দিনে দিনে পুলাটা এমন বদমাইশ হইল যে আর বলার ভাষা নেই।"

তানভীর দাঁড়িয়ে পড়ল।

"বদমাইশ? কেন চাচা, চেহারা ছবিতো ভালোই মনে হয়," বলল তানভীর।

"ওর চেহারা দেইখ্যা কিছু বোঝা যায় না, একটা হাড়ে হারামজাদা," বুড়ো বলল আবার।

"করছিল কী?"

"ও আছিল লিডার, পোলাপাইনগুলির উপর খুব অত্যাচার করতো, মারতো, খাওয়া কাইড়া নিতো, আরেকবার তো..."

"আরেকবার কি?"

"এইখানের সুপারের দিকে ছুরি নিয়া মারতে গেছে, দেখেন সাহস কতো বড়!" বুড়ো দারোয়ান বলল, "আমরা চাইর-পাঁচজনে মিল্যা আটকাইতে পারি না।"

"ছুরি নিয়ে মারতে গেছিল ক্যান?"

"সুপার গালাগালি করছিল তাই," দারোয়ান বলল, "গালাগালি না করার তো কারন নাই। হোস্টেলের জিনিসপত্র চুরি কইরা বাইরে বিক্রির ধান্ধা শুরু করছিল।"

"তাহলে তো খুব বিপজ্জনক ছেলে ছিল।"

"বিপদ মানে মহাবিপদ, ও যেদিন বাইর হইলো সেইদিন মিলাদ পড়ানোর মত অবস্থা," বলল বুড়ো দারোয়ান, বলে হাসল।

"এরপর আর কোনদিন আসে নাই?"

"না, আসলেই কি? ঢুকতে দিতাম নাকি?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই, তাহেরের মতো ডানপিটে, দুরন্ত আর বদমাইশ টাইপের ছেলে দীর্ঘদিন এক লেখকের সাথে কী প্রয়োজনে ছিল সেটা খুঁজে দেখা দরকার। সন্দেহটা করাই যায়, যার অতিতের ইতিহাস এতো ঝামেলার তার পক্ষে একজন অসহায় লেখককে খুন করে পালিয়ে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাইরে বেরিয়ে এলো তানভীর। আবু জামশেদকে আপডেট দেয়া দরকার, মোবাইল ফোন বের করতেই অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলো। রিসিভ করল সাথে সাথে।

"আমি জামাল, স্যার, চিনছেন?" ওপাশ থেকে চিকন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

জামালকে চেনে তানভীর, পুলিশের একজন সোর্স, এর আগে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে।

"চিনছি, তা আমাকে ফোন দিয়েছো কেন? আমি তো আর পুলিশে নেই, অন্য ডিপার্টমেন্টে।"

"স্যার, জানি তো। আপনের একজন লোক সারাদিন মহল্লায় ঘোরাঘুরি করল, যারে খোঁজে তারে এমনে খুইজ্যা তো লাভ নাই।"

"কার কথা বলছো?"

"যারে খুঁজে তার নাম মশিউর, ফেন্সি খায়, ব্যবসাও করে। আপনের লোকের নাম তো জানি না, তয় তারে দেখছি আপনের অফিসে। নতুন লোক।"

"দরকারি কথাটা বলো," তাড়া দিন তানভীর।

"মশিউর বাড়িতেই আছে, বাড়ির গেটে তালা দিয়া রাখছে যাতে কেউ টের না পায়," জামাল বলল।

"তুমি টের পেলে কিভাবে?"

"স্যার, আমগোর কাজই তো টের পাওয়া," ওপাশ থেকে খিকখিক হাসির শব্দ শুনতে পেল তানভীর, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে জামাল।

"ঠিক আছে, অফিসে এসো, এখন রাখছি।"

"আইচ্ছা, স্যার।"

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আবু জামশেদের মোবাইলে কয়েকবার চেষ্টা করেও পেল না, তারপর শাহরিয়ারকে ফোন করে জানাল। কাজ মোটামুটি শেষ, একটা বাসে উঠে পড়ল তানভীর। পেছনের দিকে একটা সীট খালি পেয়ে বসে পড়ল। অনেক দূরের পথ, সিটে মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

মশিউর যদি বাসায় থেকে থাকে, তারমানে কারো কাছ থেকে লুকিয়ে আছে আর সামান্য একজন ইনফর্মার যদি এটা টের পেতে পারে, তাহলে খুনির জন্য সেটা টের পাওয়া জটিল কিছু হবে না। শাহরিয়ার নতুন জয়েন করেছে, নইলে সারাদিন থেকেও ব্যাপারটা একটুও টের পায়নি।

শাহরিয়ার আবার রওনা দিয়েছে মশিউরের বাড়ির উদ্দেশ্যে, ঠিকানাটা জানে তানভীর, নতুন যোগ দেয়া ছেলেটাকে একা একা ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। বাসটা একটা স্টপে থামতেই ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে পড়ল। একটা সিএনজি ডাকল।

প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে চিরুনি মাথায় অল্প যে ক'টা চুল আছে তা আচড়ে নিল, শুকনো, বাদামি গায়ের রঙ, খাড়া নাক আর মাঝারি উচ্চতার তানভীরের বয়স ত্রিশ পার হয়েছে, তবে সেটা তাকে দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সবাই যখন বিসিএস আর বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিতে মরিয়া তখন সে পুলিশে যোগ দিয়েছিল এসআই হিসেবে, টানা পাঁচ বছর কাজ করার পর ভাগ্য ভালো যে আবু জামশেদের নজরে পড়েছিল। উনিই তাকে এই ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসেন, বন্ধুবান্ধব সবাই যখন কর্পোরেট আর সরকারি চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, তখন মানসিক যন্ত্রনায় পুড়তে থাকা তানভীরের জন্য সেটা ছিল যুগান্তকারি একটা কিছু।

আবু জামশেদের ফোনের অপেক্ষায় মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে সিএনজি'তে বসে আছে তানভীর, ট্র্যাফিক জ্যামে রাস্তা প্রায় অচল। আজ রাতে এক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল, সেখানে যাওয়া হবে না নিশ্চিত।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা খাম বের করে সিএনজি'র সিটের উপর রাখল। এই খামে তাহের সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আছে, যে থানায় তাহেরকে ধরা হয়েছিল সেই থানায় গেলে এখনো হয়তো কোন ফাইলপত্র পাওয়া যেতে পারে, তাহের যেহেতু অনাথ ছিল, এখন দরকার তাহেরের এতিম খানার ঠিকানা। গাজীপুর থানায় এখন আর যাওয়া যাবে না, পরিচিত একজন লোক আছে, কাল সকালেই খবরটা লাগাতে হবে।

সবকিছু ছাপিয়ে মনে হচ্ছে এই তাহেরই দায়ি লেখক আরিফুল হকের মৃত্যুর জন্য এবং এর সাথে মশিউর, আজমল আর রুবেল সাহেবের কোন না কোন যোগসূত্র আছে। তাহের সম্পর্কে তথ্য যোগাড়ের পর এখন কাজ হচ্ছে লেখক আরিফুল হকের সব তথ্য জোগাড় করা। লেখক ভদ্রলোকের পড়াশোনা, দেশের বাড়ি, আত্মীয়-

স্বজনদের সব তথ্য জোগাড় করতে হবে।

আবু জামশেদ নিজেও মাঠে নেমেছেন বলে জানে তানভীর। এই তথ্যগুলো দিয়ে অন্তত তাকে কিছুটা সহযোগিতা করা যায়।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এইসময়, আবু জামশেদের ফোন।

"জি, স্যার," তানভীর বলল।

"তুমি কোথায়?"

"গাজীপুর থেকে ফিরছি," তানভীর বলল, "তাহেরের খোঁজ লাগাতে পেরেছি, স্যার।"

"বলো, কোথায় এই তাহের?"

"সেটা জানি না," তানভীর বলল, "তবে ছেলেটার রেকর্ড ভালো না, ভায়োলেন্ট কাজকারবারের রেকর্ড আছে, গাজীপুর কিশোর সংশোধানাগারে ছিল।"

"থানায় কোন মামলা আছে?"

"এখন আছে কি না জানি না, কাল সকালেই খোঁজ লাগাবো।"

"কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কারন?"

"স্যার, গাজীপুর থানায় ওর কোন মামলা থাকতে পারে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম সকালেই খবর নেবো।"

"গাজীপুর থানা? তুমি নিশ্চিত?"

"জি, স্যার।"

"তাহলে আমি খবর নিচ্ছি।"

"ওকে, স্যার।"

ফোন কেটে দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় কথাটা মনে পড়ে গেল তানভীরের।

"আরেকটা ব্যাপার, স্যার," তাড়াহুড়া করে বলল, "শাহরিয়ার গেছে মশিউর নামের এক লোকের বাসায়, আমিও যাচ্ছি।"

"ওকে।"

ওপাশ থেকে ফোন রেখে দিয়েছেন আবু জামশেদ।

ভেবেছিল আরো কিছু কথা বলবেন, উনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত, ভাবল তানভীর। অনেকদিন পর টান টান একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল, এই একটা জিনিসের বড় অভাব জীবনে। বহুদিন পর তাই খুব ভালো লাগছিল।

অধ্যায় ৪২

ড্রইং রুমে বসে আছেন আবু জামশেদ। তাকিয়ে আছেন উল্টোদিকের সোফায় বসে থাকা দুজন মানুষের দিকে। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না এরা ভাইবোন, চেহারায় যথেষ্ট মিল। পুরো ড্রইং রুমটা দেখে নিয়েছেন, আসবারপত্রগুলো পুরানো, দামি, দেয়ালে কিছু ছবি টাঙানো, ছবিগুলোও অনেক পুরানো, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া তরুন এক ছেলে আর এক মেয়ের বিভিন্ন ধরনের ছবি, সাথে কিছু পারিবারিক ছবিও আছে।

"আমি আবু জামশেদ, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে," আবু জামশেদ বললেন, "আপনিই তো সুমনা, রাইট?"

"জি," সুমনা বলল, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

"আর আপনি?"

"আমি তুষার আহমেদ, সুমনার ভাই," তুষার বলল। তাকে দেখে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

"যাস্ট এ সেকেন্ড," বললেন আবু জামশেদ, মোবাইল ফোনটা বের করে সোফা থেকে উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন, ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া দরকার, শাহরিয়ারের নাম্বারে ডায়াল করলেন।

"শাহরিয়ার, তুমি কোথায়?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"রাস্তায়, মশিউর সাহেবের বাসায় যাচ্ছি," ওপাশ থেকে উত্তর এলো, গাড়ির হর্ন, মানুষের হৈচৈ সব শুনতে পাচ্ছিলেন পরিষ্কার।

"তুমি যে তুষার আহমেদের সাথে দেখা করেছো, তার বাসার ঠিকানা কি?"

"স্যার, ধানমন্ডি..."

এটুকু শুনেই লাইন কেটে দিলেন তিনি। সোফায় এসে বসলেন।

"আপনার নামে রেজিস্ট্রি করা একটা সীম আমরা পেয়েছি, একটা দূর্ঘটনার স্পটে, আপনি সেখানে গিয়েছিলেন?" সুমনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"দূর্ঘটনার স্পট? কোথায়? কি রকম দূর্ঘটনা?"

"লেখক আরিফুল হকের বাসা, খবরটা নিশ্চয়ই দেখেছেন?"

"জি, দেখেছি।"

সুমনা আর তুষার আহমেদের মধ্যে কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে এরমধ্যে যা নজর এড়াল না আবু জামশেদের।

"আপনার সীম সেখানে পাওয়া যাওয়ার কারন কি?"

"উনি আমার পরিচিত, আমি গিয়েছিলাম দেখা করতে," সুমনা বলল, "মোবাইল

ফোনটা ভুলে রেখে এসেছি।"

"সেটা কবে?"

"পরশুদিন।"

"সেদিন রাতেই আগুনে পুড়ে মারা যান ভদ্রলোক," বললেন আবু জামশেদ, "যাই হোক, আমি যতোদূর জানি, নিভৃতচারি মানুষ ছিলেন তিনি, কারো সাথে দেখা করতেন না, পত্র-পত্রিকায় কোনদিন সাক্ষাতকার দেন নি, তার একটা ছবি পর্যন্ত আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। সেখানে আপনি তার ঠিকানা জোগাড় করলেন কি করে?"

"আমরা পূর্ব পরিচিত।"

"সেটা কি রকম?"

"আমরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, সেখান থেকেই পরিচয়।"

"একই ডিপার্টমেন্টে?"

"না, আমি সোসিওলজিতে ছিলাম, উনি ছিলেন ফার্মেসিতে।"

"ভদ্রলোক তো আপনার সিনিয়র, পরিচয় হলো কি ভাবে?"

"একটা প্রোগ্রামে, আমরা দুজনেই আবৃতি করতাম। সেখান থেকেই পরিচয়।"

"ও আচ্ছা। আপনার মোবাইল ফোন ফেলে চলে এলেন, ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না।"

"অনেকদূর চলে আসার পর টের পেয়েছি, তখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। ভেবেছিলাম পরে পাঠিয়ে দিতে বলবো।"

"মি. তুষার, আপনি কি আরিফ সাহেবকে চিনতেন?"

সুমনার দিকে তাকিয়েছিল তুষার, আবু জামশেদের প্রশ্নে কিছুটা হকচকিয়ে গেল। সামনে টেবিলে থাকা এক গ্লাস পানি খেল বেশ সময় নিয়ে।

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই," তুষার বলল, "যে কারনে এসেছিলেন, তার উত্তর পেয়ে গেছেন আশা করি।"

"তা পেয়েছি, যতোদূর জানি, আমার সহকর্মি শাহরিয়ার জামিল এসেছিল আপনার কাছে, আপনার দুই বন্ধু আজমল চৌধুরি আর ইফতেখার উদ্দিন রুবেল সম্পর্কে জানতে।"

"রাইট," তুষার বলল, এখন বেশ আত্মবিশ্বাসি মনে হচ্ছে তাকে, "যতোটুকু বলার তাকে বলেছি।"

"হুম, বলেছেন," আবু জামশেদ বললেন, "আপনি তো বিদেশ থেকে এলেন, কেমন লাগছে বাংলাদেশ?"

কথা ঘুরিয়ে কোনদিকে মোড় নিতে চাচ্ছেন ভদ্রলোক বুঝতে পারছে না তুষার।

"ভালো, খুবই ভালো।"

"কিন্তু এক এক করে আপনার তিনজন বন্ধু মারা গেল, ব্যাপারটা তো টেনশনের, তাই না?"

তুষার তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে, উল্টোদিকের সোফায় বসে থাকা লোকটা ঝানু মাল, কথা বের করতে চাচ্ছে।

"তিনজন?"

"আজমল চৌধুরি, ইফতেখার উদ্দিন রুবেল আর আরিফুল হক," আবু জামশেদ বললেন, "নাকি বলতে চান, আরিফুল হককে আপনি চেনেন না।"

"চিনি..."

"আপনারা একই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র," উঠে দাঁড়ালেন আবু জামশেদ, দেয়ালে বাঁধানো একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, পুরানো দিনের ছবি, পাঁচ-ছয়জন তরুন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে, পেছনে দেয়ালে লেখা ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, "এই ছবিতে কি আরিফুল হক আছেন?"

"আছে, ডান থেকে তৃতীয় জন," বলল তুষার।

ছবিটা আরো ভালো করে দেখলেন আবু জামশেদ, অনেক আগের ছবি, রঙিন ছবি হলেও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ডান থেকে তৃতীয় যে তরুন দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনে মোটা সোয়েটার আর জিন্সের প্যান্ট, মাথাভর্তি চুল, সুন্দর মায়াবি চেহারা।

"আমি নাস্তা নিয়ে আসছি," বলল সুমনা, বেরিয়ে গেল ড্রইং রুম থেকে।

"তুষার সাহেব, আপনার বোনের সীম দূর্ঘটনা স্থলে পেয়েছি আমরা, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। উনি তো বিবাহিত, তাই না?"

"জি।"

"আপনার সাথে কি আরিফুল হকের যোগাযোগ হয়েছিল, কিংবা দেখা সাক্ষাৎ?"

"না।"

"আপনার এতো ঘনিষ্ট বন্ধু অথচ আপনার সাথে যোগাযোগ হয়নি, অদ্ভুত!" বললেন আবু জামশেদ।

"জি, হয়নি।"

"অথচ... আচ্ছা, বাদ দিন," বললেন আবু জামশেদ, তিনি কোনদিকে ইশারা করতে চাচ্ছেন বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় তুষারের, বন্ধুর সাথে দেখা হয়নি, অথচ বন্ধুর বোন দেখা করতে গেছে লেখকের সাথে, ব্যাপারটা কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক, "আমি যতোটুকু শুনেছি, ভদ্রলোক চলাফেরা করতে পারতেন না, হুইল চেয়ার ব্যবহার করতেন।"

"জি।"

"ছবি দেখে তো মনে হলো সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ ছিলেন, হঠাৎ করে তার হুইল চেয়ারের প্রয়োজন পড়ল কেন?"

"অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল।"

"কোথায়?"

"তা জানি না।"

"আপনার এতো ঘনিষ্ট বন্ধু, অথচ আপনি তেমন কিছুই জানেন না।"

"জি, আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম।"

"তাই তো," বললেন আবু জামশেদ, সুমনা ট্রে-তে নাস্তা নিয়ে ঢুকেছে, এক কাপ চা ট্রে থেকে তুলে নিলেন তিনি, "যাক, আপনাদের অনেক বিরক্ত করলাম," চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "চা খেয়ে চলে যাব।"

এরপরের পাঁচ মিনিট পুরো অস্বস্তিতে কাটল সবার। তিনি চুপচাপ চায়ে চুমুক দিলেন, দুই ভাইবোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, ড্রইং রুমটা আবার দেখলেন। চা শেষ হলে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে।

সোফায় পাশাপাশি বসে রইল তুষার আর সুমনা। ক্রিস্টিনা অপেক্ষা করছিল কখন এই লোকটা যাবে।

ড্রইং রুমে ঢুকল সে, কিছু প্রশ্নের উত্তর দরকার।

অধ্যায় ২৪

মশিউরের বাড়ির সামনে পৌছাতে পৌছাতে সাড়ে আটটা বাজল। সারাদিন এই এলাকায় ছিল, সন্ধ্যার পর কিছুটা অন্যরকম লাগছিল সবকিছু। রাস্তাঘাটে লোকজন কমে এসেছে, তবে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানগুলো খোলা। বাস থেকে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে আসতে হয়েছে শাহরিয়ারকে। ক্লান্ত লাগছিল, বাসার গেটে এখনো তালা ঝুলছে। তানভীরের সোর্সের মতে, মশিউর বাসার ভেতরেই আছে। সেক্ষেত্রে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। মোবাইল বের করে আবু জামশেদের নাম্বারে ডায়াল করল।

"স্যার," শাহরিয়ার বলল, "আমি মশিউরের বাসার সামনে।"

"ভেতরে যাও," আবু জামশেদ বললেন ওপাশ থেকে।

"তালা ভাঙতে হবে," শাহরিয়ার বলল, "আপনার অনুমতি চাই।"

"তানভীর পৌছে যাবে কিছুক্ষনের মধ্যে," আবু জামশেদ বললেন, "একসাথে ঢুকে পড়ো। মশিউর যদি ভেতরে থাকে তাহলে অ্যারেস্ট করবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

লাইন কেটে এবার তানভীরের নাম্বারে ডায়াল করল শাহরিয়ার।

"আপনি কোথায়?" জিজ্ঞেস করল।

"এখনো আধঘন্টা লাগবে," ওপাশ থেকে উত্তর এলো।

"আপনি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো," শাহরিয়ার বলল।

"ঠিক আছে।"

হেঁটে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসল শাহরিয়ার। চা দিতে বলল এক কাপ। দোকানি চিনতে পেরেছে, সারাদুপুর বেশ কয়েক কাপ চা খাওয়া হয়েছে এখানে।

"আপনে কাউরে খুঁজেন?" জিজ্ঞেস করল দোকানি।

"কথা কম," বিরক্তির সুরে বলল শাহরিয়ার, "একটা বেনসন দেন।"

দোকানে আরো দু'তিনজন বসে আছে, সম্ভবত এলাকার ছেলে, শাহরিয়ারের দিকে তাকাল একজন কড়া চোখে, তবে কিছু বলল না। বাইরের কেউ এসে এলাকায় গরম দেখাবে এটা সহ্য করা কঠিন হলেও শাহরিয়ারের ভাবসাব দেখে বুঝতে পারছে এখানে হাত না দেয়াই ভালো।

আধঘন্টা অনেক সময়। একা বসে এতোটা সময় পার করা কঠিন। সিগারেটে টান দিতে দিতে ছেলেগুলোকে দেখল, অল্পবয়স্ক ছেলে, মাত্র পাখা গজিয়েছে। এদের কাছ থেকে মশিউর সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ভালো হতো।

মোবাইল ফোনে সময় দেখল শাহরিয়ার, অপেক্ষার সময় ঘড়ির কাটা ধীরে চলে। তানভীর আসলেই কাজে নামতে হবে। এই কাজটা একা করতে পারলে ভালো হতো, তবে বস একবার যখন বলে দিয়েছেন তখন একা কাজটা করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

তানভীর এলো সোয়া নয়টার দিকে। দূর থেকে হাল্কা-পাতলা গড়নের তানভীরকে চিনতে সমস্যা হয়নি শাহরিয়ারের। এগিয়ে গেল সে।

"স্যরি, অনেকক্ষন অপেক্ষা করতে হলো," তানভীর বলল।

কিছু না বলে হাসল শাহরিয়ার, ভদ্রতার হাসি। পৃথিবীতে এই একটা কাজই সে চরম অপছন্দ করে, তা হচ্ছে কারো জন্য অপেক্ষা করা।

হেঁটে মশিউরের বাড়ির গেটের কাছে চলে এলো দুজন। তাকিয়ে আছে বড়সড় আকারের তালাটার দিকে।

"এটা ভাঙতে হবে," তানভীর বলল।

আশপাশে তাকাল শাহরিয়ার, বেশ কিছু ইটের টুকরো পড়ে আছে, একটা তুলে নিল। ছোটখাট জিনিসটা চোখে পড়ল তখন। চাবি। তুলে নিল সাথে সাথে।

"যাক, ঝামেলা কমে গেল অনেক," তানভীর বলল।

চাবি ঢোকাতেই খুলে গেল তালাটা।

গেটটা অল্প ফাঁক করে ঢুকে গেল দুজন। শাহরিয়ার দেখল তানভীরের হাতে একটা রিভলবার চলে এসেছে, অন্ধকার পুরো বাসাটা, ভেতরে কোন রুমে বাতি জ্বলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এক পা এক পা করে এগুচ্ছে দুজন।

* * *

"ভাইয়া, কী হচ্ছে এসব? আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না," সুমনা বলল অসহায়ের মতো, "বারবার এই লোকগুলো কেন আসছে আমাদের কাছে? তুমি কেন গিয়েছিল আরিফের ওখানে?"

তুষার চুপচাপ বসে আছে, ক্রিস্টিনার দিকে তাকাচ্ছে আড়চোখে, এই একই প্রশ্নগুলো একটু আগে ক্রিস্টিনাও করেছে, উত্তর দিতে পারে নি সে।

"আমি জানি না লোকগুলো কেন আমাদের কাছে আসছে বারবার," অনেকক্ষন পর বলল তুষার, "আরিফ আমার অনেক পুরানো বন্ধু, ওর কাছে আমি যেতেই পারি।"

"তা পারো," সুমনা বলল, "কিন্তু তুমি আমাদের বলেছিলে মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেছো, সেটা যে আরিফের বাসায় রেখে এসেছো তা কিন্তু বলোনি।"

"আমি নিশ্চিত ছিলাম না," তুষার বলল।

"সেই রাতেই আরিফ মারা যায়," সুমনা বলল, "বাসায় আগুন লেগে। ভাগ্য ভালো যে ভদ্রলোক আমার উপর কোন সন্দেহ করেন নি, তবে যদি বুঝতে পারতেন সেদিন তুমি গিয়েছিলে তাহলে হয়তো অন্য কিছু হতো।"

"কি হতো?"

"তোমাকে সন্দেহ করতো, হয়তো ধরে নিয়ে যেতো," সুমনা বলল, "এই যে একজন একজন করে তোমার তিন জন বন্ধু মারা গেল, তোমার কি একটুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না।"

ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল আবার তুষার, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

"না, আমার দুশ্চিন্তার কি আছে?" এক গ্লাস পানি তুলে নিল তুষার, "আমি চৌদ্দ বছর পর দেশে ফিরেছি। আমার সাথে তো কারো কোন লেনদেন নেই।"

"কিন্তু তুমি আরিফের বাসায় গেলে কেন? ওর সাথে তো তোমার ভালো সম্পর্ক থাকার কথা না," সুমনা বলল।

উঠে দাঁড়িয়েছে তুষার।

"আমি একটু ছাদে যাবো, এসব নিয়ে পরে কথা হবে," বলে ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে এলো তুষার। তার দম বন্ধ লাগছিল, আজ সারাদিন বাসা থেকে বের হওয়া হয়নি, সন্ধ্যার পরপর আচমকা ঐ লোকের আগমন, সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সুমনা বুদ্ধি করে মিথ্যে কথাটা না বললে আরিফের মৃত্যুর সাথে তার একটা যোগসূত্র তৈরি করে ফেলতো লোকটা নিশ্চিত।

তবে যোগসূত্র যে কিছু একটা আছে তা সন্দেহ করেছে লোকটা এবং তাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে মশিউরের নাম্বারে ডায়াল করল, ফোন সুইচড অফ। ওর সাথে কথা বলতে পারলে ভালো লাগতো।

এখন একটা উপায়ই আছে, তা হচ্ছে দেশ থেকে পালানো। ছাদে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল তুষার। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপা ব্যথা, কাউকে মন খুলে কিছু বলা যাচ্ছে না, মন খুলে বলার মতো মানুষগুলো তাকে এখন ভুল বুঝবে আর যাদের বলার ছিল তারা এখন মৃত। খুব শিগগিরি হয়তো ওদের সাথে দেখা হবে, হয়তো অন্য কোন ভুবনে।

* * *

বাসায় যাবেন না অফিসে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, ধানমন্ডি থেকে বের হয়ে গাড়ি

এখন মিরপুর রোডে। বাসায় একা একা বিরক্তিকর সময় পার করার চেয়ে অফিসে যাওয়াই ভালো হবে, বিশেষ করে টিমের দুজন ইনভেস্টিগেটর এখনো বাইরে। একটু আগেই শাহরিয়ারের সাথে কথা হয়েছে, প্রয়োজনে তালা ভেঙে মশিউরের বাসায় ঢুকতে বলেছেন তিনি।

গাড়ির জানালা খোলা রেখেছেন, ব্যস্ত লোকজন দেখছেন, এই রকম ব্যস্ততা তার নেই, পরিবার পরিজন থাকলেই না ব্যস্ততা থাকবে। যে বাসায় তিনি থাকেন, সেটা পৈত্রিক নয়, নিজের জমানো টাকায় কেনা, পৈত্রিক বাড়ির উপর দাবি ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগে, একমাত্র বড় ভাই আর ছোট একবোন এই ঢাকা শহরেরই বাসিন্দা, অথচ যোগাযোগ নেই। তিনি জানেন ওরা সবাই ভালো আছে, সুখে আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যোগাযোগ করতে, কিন্তু একই ঘ্যানঘ্যান ভালো লাগে না। ওরা সবাই চায়, বিয়ে করে ছোটভাইকে থিতু করতে। জীবনকে তাৎপর্যপূর্ন করতে সংসার করা লাগবে এমন কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না, এখনো করেন না, তবে মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল হয়ে গেছে।

সেই ভুল সংশোধন করার মতো ইচ্ছে, সময় কোনটাই এখন আর নেই।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে অনেক পুরানো একটা ছবি বের করে দেখলেন, সাদাকালো একটা পোট্রেট, সেই চেনা হাসি, চেনা মুখ। এই একই শহরে বাস করে কুড়ি বছর আগে দেখা মুখটা দ্বিতীয়বার দেখা হয়নি, অদ্ভুত!

অফিসের টেলিফোন নাম্বার থেকে ফোন এলো। রিসিভ করলেন।

"হ্যালো।"

"কে?"

"আমি সাইফুল, একটা খবর দেয়ার জন্য ফোন করেছি," ওপাশ থেকে সাইফুলের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেলেন।

"কি খবর?"

"একটা লাশ পাওয়া গেছে, গাজীপুরে, স্যার।"

"গাজীপুরে, কোথায়?"

"লেখক সাহেবের বাড়ি থেকে একটু দূরে," সাইফুল বলল, "গাজীপুর থানা থেকে ফোন করেছিল অফিসে, আপনাকে খবরটা জানাতে বলল।"

"লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে?"

"না, স্যার। একদম থেতলে ফেলেছে নাকি, বডিতে আইডিন্টিফিকেশনের জন্য কোন কিছু পাওয়া যায়নি।"

"আচ্ছা," একটু চিন্তা করলেন তিনি, "আমি অফিসে আসছি, তুমি রওনা দাও, তোমার টিম নিয়ে।"

"যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে, রাস্তায় যে জ্যাম," ওপাশ থেকে সাইফুল

বলল।

"যতো রাতই হোক, ক্রাইম সীনে আমি তোমাদের চাই, ব্যস," আবু জামশেদ বললেন, "রাতের মধ্যে রিপোর্ট করবে।"

"ওকে, স্যার।"

মোবাইল ফোনটা পাশের সিটে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। মাথাটা দপদপ করছে। মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছে করে তাকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, একটার পর একটা লাশ পাওয়া যাচ্ছে অথচ খুনির কোন ট্রেস করতে পারেন নি, ট্রেস করার মতো কোন সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে না।

নতুন এই মৃতদেহ কার! এটা কি তাহেরের মৃতদেহ!

আরিফের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, এটা যদি তাহেরের মৃতদেহ হয়, তারমানে এই দুজনের কেউ খুনি নয়। মশিউর নিজের বাসায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, তারমানে সেও এই খুনগুলোর জন্য দায়ি নয়।

তুষারের সাথে এই মাত্র দেখা করে এসেছেন, তারমানে তুষারকেও সন্দেহ করা যাচ্ছে না। তাহলে এই খুনগুলো করছে কে? নাকি পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য নতুন কোন চাল চালা হয়েছে? জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। শ্বাস নিতে ভুলে গেলেন হঠাৎ করেই। পৃথিবীর যাবতীয় দুশ্চিন্তা এক নিমিষে চলে গেল।

দীর্ঘ দুই দশক পর পরিচিত সেই মুখটা দেখলেন। পাশের গাড়ির জানালা খুলে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। নিজের চেহারায় অভিব্যক্তি কি ফুটে উঠল তিনি জানেন না, অপ্রস্তুতের মতো জানালাটা তুলে দিলেন।

সে ভালো আছে, খুব ভালো আছে, এটুকু জানার জন্যই এতোদিনের অপেক্ষা ছিল। অনেকদিন পর বুকটা হাল্কা হয়ে এলো।

ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন, তাড়াতাড়ি অফিসে যাওয়া দরকার।

অধ্যায় ৪৪

তানভীরের ঠিক পেছনেই আছে শাহরিয়ার, অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না, বাড়িটা পুরানো, একতলা, টিনের চাল, সামনে ছোট একটা উঠোন, তারপর বারান্দা আর সারি বাঁধা কিছু রুম, উঠোনের একপাশে বাথরুম আর টয়লেট। তানভীর বারান্দায় উঠে গেছে, ইশারায় এগুতে বলল শাহরিয়ারকে, দেয়ালের একপাশে সুইচে চাপ দিয়ে বারান্দায় বাতি জ্বালাল।

ঘরগুলোর দরজা খোলা, পা দিয়ে টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তানভীর। রিভলবারটা তাক করে আছে সামনের দিকে। ঘরে বাতি জ্বলছে না, তবে টিভি চলছে, ঝিরঝির করছে, কোন শব্দ নেই। টিভির আলোয় রুমটা দেখে নিলো তানভীর, অল্প আলোয় তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না, শুধু মনে হচ্ছে একটু দূরে একটা জাজিমে কেউ একজন বসে আছে, উবু হয়ে।

"হ্যান্ডস আপ, মশিউর," তানভীর বলল, "উল্টাপাল্টা কিছু করতে যাবেন না।"

শাহরিয়ার ঢুকল রুমে, দেয়াল হাতড়ে বাতি জ্বালাল। উবু হয়ে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকাল, জাজিমের সামনে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, বিরিয়ানির প্যাকেট, মোমবাতি, রাংতা এইসব।

"আমি তিন গুনবো," তানভীর বলল।

এবারও কোন উত্তর এলো না।

"এক..."

"দুই..."

"তিন গোনার দরকার নেই," শাহরিয়ার বলল, এগিয়ে গেল জাজিমের উপর উঁবু হয়ে বসে থাকা মশিউরের দিকে। কাঁধে টোকা দিল।

দেহটা পড়ে গেল একপাশে, মশিউরের হা হয়ে থাকা মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শাহরিয়ার। জিভটা বের হয়ে আছে অর্ধেক, চোখ দুটো রক্তলাল। পা দুটো এতোক্ষন শরীরের নীচে চাপা ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, পায়ের পাতা কেটে আলাদা করা হয়েছে, চাপ চাপ থকথকে রক্ত জাজিমে জমে গেছে।

"বসকে খবরটা জানান," শাহরিয়ার বলল।

রিভলবারটা গুঁজে মোবাইল ফোন বের করল তানভীর। আবু জামশেদের নাম্বারে ডায়াল করল। কেন জানি মনে হচ্ছে কাজটা বেশিক্ষন আগের না, সময়মতো বাসায় ঢুকতে পারলে মশিউরকে হয়তো বাঁচান যেত।

আবু জামশেদের সাথে কথা বলছে তানভীর, বারান্দায় এসে দাঁড়াল শাহরিয়ার, বাড়ির চারপাশে দেয়াল, খুব উঁচু নয়, সাধারন উচ্চতার যে কেউ টপকে ভেতরে

ঢুকতে পারবে। তবে দিনের বেলা কেউ এই ঝুঁকি নেবে না, তাতে কারো চোখে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। খুনি সম্ভবত সন্ধ্যার পরপর দেয়াল টপকে ঢুকেছে বাসায় কিংবা গেটের চাবি ছিল তার কাছে। সামনের গেট দিয়ে পালায় নি, তাহলে লোকজনের চোখে পড়ে যাওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে পালানোর জন্য দেয়াল টপকানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শুরু থেকেই মশিউরের উপর সন্দেহ ছিল, বিশেষ করে গিয়াস চৌধুরি আর জানে আলমের ভাষ্য অনুযায়ী, কিন্তু ওদের সেই ধারনা ভুল। খুনি অন্য কেউ কিংবা খুনি একজন নয়, কয়েকজন।

তানভীর এই এলাকার থানায়ও খবর পাঠিয়েছে, যে কোন সময় চলে আসবে পুলিশ, বসও রওনা দিয়েছে। সামনের কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ততায় কাটবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একতলা বাড়িটার সামনে অনেক লোকজনের ভিড় জমে গেল। পুলিশের ভ্যান এসেছে কয়েকটা, গেটের ভেতরে উৎসুক জনতার কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। তানভীর আর শাহরিয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, আবু জামশেদ এখনো আসেন নি, তিনি রাস্তায়। শাহরিয়ার ভেবেছিল এভিডেন্স কালেকশন টিম চলে আসবে, তারাও আসে নি, গাজীপুরে চলে গেছে। সেখানেও নাকি একটা লাশ পাওয়া গেছে।

মশিউরের লাশ যে ঘরে পাওয়া গেছে তার সামনে পুলিশের জটলা, এই থানার ওসি মোঃ কামরুজ্জামান বারবার হম্বিতম্বি করছে, তাকে না জানিয়ে হোমিসাইডের দুজন কেন এই বাসায় ঢুকতে গেল। নিজের এলাকায় সে এসব মাতবরি সহ্য করবে না। চুপচাপ শুনছে শাহরিয়ার, কিছু বলার নেই। একমাত্র আবু জামশেদ একে ঠান্ডা করতে পারবেন।

"আপনে জানেন, এই লোকের নামে কেস ছিল?" মোঃ কামরুজ্জামান তানভীরের উদ্দেশ্যে বলল, "মিনিমাম একটা দাম তো আমাদের দেবেন নাকি? একটা বাড়িতে ঢুইক্যা গেলেন, অথচ আমারে খবর দেয়ার প্রয়োজনও মনে করলেন না, এর মানে কি?"

"যা বলার আমার বসকে বলেন," বলে তানভীর মুখ ঘুরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

"আপনের বস, সে তো এক চীজ!"

"আপনার সমস্যা কি ভাই?" এবার এগুলো শাহরিয়ার।

"আপনে নতুন, না?" ওসি মোঃ কামরুজ্জামান বলল, "বেশি গরম দেখাইয়েন না।"

"গরম তো আপনেই দেখাচ্ছেন!"

তানভীর হাত ধরে টেনে একটু দূরে নিয়ে গেল শাহরিয়ারকে। এখানে কোন ঝগড়া হোক তা সে চাইছে না।

"ওর সাথে লাগতে যেও না," নীচু গলায় বলল তানভীর, "আমার পুরানো কলিগ তো, আমি চিনি।"

কিছু বলল না শাহরিয়ার, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

* * *

ঠিক এগারোটার দিকে আসলেন আবু জামশেদ, এসেই পুরো স্পটের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন, যে ওসি এতোক্ষন হম্বিতম্বি করছিল সে এখন গজগজ করছে রাগে, কিন্তু কিছু বলছে না।

ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে শাহরিয়ার আর তানভীরকে নিয়ে ঢুকেছেন তিনি। ঘরটা দেখে নিলেন একপলকে, এরকম অগোছালো, নোংরা পরিবেশ এর আগেও দেখেছেন তবে এই ঘরের বিশেষত্ব হচ্ছে হত দশবছরে এই ঘরে নতুনত্বের কোন ছোয়া লাগেনি। দেয়ালে যে পুরানো ক্যালেন্ডারটা ঝুলছে তাও দশ বছর আগের। টিভি সেটটাও পুরানো, সাদাকালো আমলের। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাবার দাবার, সিগারেটের ছাই দেখে গা গুলাল, কালো জাজিমটায় রক্ত জমে থকথক করছে, কাছে না গেলে বোঝার উপায় নেই। মশিউরের মৃতদেহ একপাশে হেলে পড়ে আছে, গলা টিপে মারা হয়েছে। ওর মুখের কাছে গিয়ে গন্ধ শুকলেন, মুখ কুঁচকে গেল তার, অ্যালকোহলের বাজে গন্ধে। স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না মশিউরের, তবে নেশাগ্রস্ত থাকার কারনেই সম্ভবত খুনিকে সামলাতে পারেনি। এখানেও আজমল চৌধুরি আর ইফতেখার রুবেলের মতো মৃতদেহের দুই পায়ের পাতা আলাদা করা হয়েছে। খুনি যে একই মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাহরিয়ার আর তানভীরকে ইশারা করলেন, কাছে আসার জন্য। মোবাইল ফোনে যতোগুলো সম্ভব ছবি তুলতে বললেন। এভিডেন্স কালেকশন করার জন্য সাথে করে কিছু প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো ধরিয়ে দিলেন দুজনের হাতে। পড়ে থাকা সিগারেটের টুকরা, বিরিয়ানির প্যাকের, মৃতদেহের আশপাশে যা যা আছে সব তুলে নিতে বললেন। আঙুলের ছাপ কালেক্ট করার কাজটা নিজের হাতে রাখলেন।

একটার পর একটা ফোন আসছে, রাঘব-বোয়াল থেকে শুরু করে কয়েকজন ক্রাইমরিপোর্টার, একের পর এক কল করেই যাচ্ছে, মাতবরি ফলানোর এটাই উপযুক্ত সময়, সবাই এখন জানতে চাইবে কী হচ্ছে এসব, কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে, তার চেয়ে কারো সাথে কথা না বলাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে আপাতত। মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করার আগে বিশেষ একটা কল রিসিভ করলেন।

"জি, স্যার, কাল সকালে চলে আসবো, ওকে, সরাসরি কথা হবে, আমি এখন ক্রাইম স্পটে," বলে ফোনটা রেখে দিলেন। পুলিশের আইজির সাথে কথা হলো,

কাল সকালের মধ্যে পজেটিভ একটা কিছু বলতে হবে, না হলে এই কেসগুলো থেকে সরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ফোনটা সাইলেন্ট করে রাখলেন, এখন কারো সাথে কথা বলা যাবে না। এখনো ঘন্টাখানেক লাগবে সব কাজ গুছিয়ে আনতে।

গাজীপুরে যে লাশ পাওয়া গেছে তার আপডেট নেন নি এখনো। মাথা ব্যথা করছে, আজ রাতে ঘুম হবে না। সকালে মিটিং পুলিশের আইজি'র সাথে। ভদ্রলোক এখনো বিশ্বাস রেখেছেন তার উপর, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা কতোটুকু রাখতে পারবেন বুঝতে পারছেন না।

ঠিক বারোটা পনেরোতে কাজ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ওসি মোঃ কামরুজ্জামান বাইরেই অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

"পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করেন," ওসি মোঃ কামরুজ্জামানকে বললেন তিনি।

"জি, স্যার।"

"এই লোকরে চিনতেন?"

"জি, নেশা করতো, এমনিতে মানুষ খারাপ ছিল না।"

"আপনার কাছে তো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চাইনি।"

"জি, স্যার।"

"মামলা ছিল কয়টা?"

"একটাই, জামিনে ছিল, থানায় হাজিরা দিয়া যাইতো প্রতি মাসে।"

"আচ্ছা। আর কোন সমস্যা নেই তো?"

"জি, না।"

"ঠিক আছে, আমি গেলাম, কোন তথ্য পেলে জানাবেন," বলে বেরিয়ে এলেন আবু জামশেদ।

ওসি মোঃ কামরুজ্জামানের দিকে তাকাল শাহরিয়ার, ভদ্রলোক একদম মিইয়ে গেছে আবু জামশেদের সামনে।

গাড়িতে উঠে বসলেন আবু জামশেদ, শাহরিয়ার আর তানভীরকেও ইশারা করলেন উঠতে।

"আমি তোমাদের জায়গামতো নামিয়ে দিচ্ছি," বললেন তিনি।

"স্যার, আপনার কি ধারনা?" জিজ্ঞেস করলেন তানভীর।

"কোন ধারনা নেই, তানভীর," বিরক্ত মুখে বললেন তিনি, "অযথা প্রশ্ন করবে না। কাল সকালে ফাইনাল মিটিং, আই নিড রেজাল্ট।"

আগামিকাল অনেক কাজ, গাজীপুর থেকে এভিডেন্স কালেকশন টিম কি খবর নিয়ে আসে কে জানে, এছাড়া এখানকার স্পট থেকে যেসমস্ত আইটেমগুলো তুলে নিয়েছেন সেগুলোর উপরও কাজ করতে হবে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ঘুম আসছিল শাহরিয়ারের, ক্লান্তিতে হাই তুলছিল

বারবার, দীর্ঘ একটা দিন গেছে আজ, মনে হচ্ছে আগামি কয়েকদিনও অনেক দীর্ঘ হবে।

* * *

মাথায় মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলো কিলবিল করছে, বাসায় এসেই শুয়ে পড়েছেন, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করলেন, তারপর উঠে পায়চারি করলেন, রাতে খাওয়া হয়নি, তারপরও ক্ষুধা পাচ্ছিল না।

ভোর হওয়া দেখলেন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, অনেকদিন পর দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছিল খুব। একতলা বাড়িটায় তিনি একা বাসিন্দা, এক চিলতে এই জমিটাই সম্বল, জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে বছরখানেক হলো তৈরি করেছেন। ঢাকা শহরের আশপাশে নতুন যে সমস্ত আবাসিক এলাকা তৈরি হয়েছে বাড়িটা সেই এলাকায়। আশপাশে খুব বেশি মানুষজন নেই। কেউ বিরক্ত করতে আসে না, তিনিও কাউকে বিরক্ত করেন না। কাজের বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ নেই, বাসায় যতোক্ষন থাকেন, বই পড়ে অথবা টিভি দেখে সময় কাটে। ঘরবাড়ি পরিস্কার রাখার কাজটা নিজ হাতেই করেন, এমনিতে সবসময় বাইরে থেকে খাবার কিনে আনলেও ছুটির দিনে নিজের হাতে রান্না করেন, বাড়ির পেছনের দিকে ছোট একটা বাগান আছে, নিজের হাতে কিছু শাক-সব্জি লাগিয়েছেন, সেগুলোর দেখাশোনা করতে করতে সময় কেটে যায়।

গতকাল সন্ধ্যায় অনেককাল আগে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটার দেখা পেয়েছিলেন, এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কল্পনা ছিল, সত্যি সত্যি দেখেন নি কিছু। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তৈরি হয়ে নিলেন তিনি, বাসায় থাকতে ইচ্ছে করছে না। ভোর ছয়টা বাজে, ড্রাইভার আসবে সাতটার দিকে, অস্থির লাগছে, গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বের করে রওনা দিলেন অফিসের উদ্দেশ্যে, ড্রাইভারকে ফোন করে দিলেই হবে যেন সরাসরি অফিসে চলে আসে। এতো সকালে সাধারনত অফিস খোলা হয় না, পিয়ন কামরুল অফিসের ভেতরেই ছোট একটা রুমে থাকে, বেচারার থাকার কোন জায়গা নেই বলে। ওকে বললেই রুম খুলে দেবে।

রাস্তাটা এখনো হাফপাকা, দুইপাশে গাছের সারি। আজকের সকালটা কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, হাল্কা বাতাস বইছে। জানালা খুলে দিয়ে এক্সেলেটরে পা বসালেন, গতিময় অস্থির একটা জীবন পছন্দ তার, একটার পর একটা অমিমাংসিত মৃত্যু একটানা নিরানন্দময় জীবনে নতুন গতি দিয়েছে এবং এই গতিটাকে তিনি উপভোগ করতে চান।

* * *

রাত দুটো খুব বেশি রাত নয়, অন্তত তানভীরের কাছে। রাত জাগা একটা নেশার মতো, এমন নয় যে রাত জেগে এমন কিছু উদ্ধার করে ফেলে সে, বলা যায় বিনাকারনেই রাত জাগে সে এবং মজা পায়।

বোনের বাড়ির এক রুমে নিজের মতো থাকে, ছোটবোন যত্ন করে, নিয়ম করে খাবার ঢেকে রেখে যায়, টেবিলে। বাইরে থেকে না খেয়ে এলে খেয়ে নেয় তানভীর। তারপর বই নিয়ে বসে, পুরো রুমটা ছোটখাট একটা বইয়ের ঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছে সে গত পাঁচ কয়েকবছরে, নির্দিষ্ট কোন ধরনের বই পড়ার বাতিক নেই, হাতের কাছে যা পায়, তাই কেনে, তাই পড়ে। এখন যেমন বিগব্যাং থিওরি নিয়ে বিজ্ঞানের কচকচানি পড়ছে, মাথায় কিছু না ঢুকলেও পড়তে খারাপ লাগছে না। বিজ্ঞানীরা যে মানসিকভাবে অসুস্থ এতোদিন সে শুধু ধারনা করতো, এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করে। অসুস্থ না হলে এতো জটিল কুটিল চিন্তাভাবনা আসে কোত্থেকে।

সারাদিন অনেক ঝামেলা গেছে, রাতে খাওয়ার রুচি নেই, কোনমতে কাপড়-চোপড় ছেড়ে অ্যাটাচড বাথে ঢুকে গোসল সেরে নিলো। কাল সম্ভবত অনেক কাজ, তবে তাতে রাত জাগা আটকে থাকবে না, অন্তত একটা বইয়ের গোটা বিশেক না পড়া পর্যন্ত ঘুমানো তার জন্য হারাম।

বিছানায় মাথা দিয়ে বইটা খোলা মাত্র মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। বিরক্তিকে ফোনের দিকে তাকাল তানভীর, এতো রাতে তাকে বিরক্ত করার কেউ নেই, একসময় একটা মেয়ের সাথে খানিক ভাব হয়েছিল, সেই মেয়ের অন্যায় দাবি মানতে পারে নি বলে ভাব'টা টেকেনি। মাঝে মাঝে মনে হয় দাবিটা খুব বেশি অন্যায় দাবি ছিল, নইলে তার মতো মানিয়ে চলার মতো মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই

আছে। রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত মোবাইল ফোনে কথা বলার দাবি যে মেয়ে করতে পারে সে মেয়ে কোনমতেই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নয়, এছাড়া সারাদিন কাজের পর এই সময়টাই বই পড়ার কিছুটা সুযোগ পায় সে। একটা মেয়ের সাথে ভাব রাখার জন্য এতো বড় ছাড় দেয়া তার পক্ষে সম্ভব না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিল তানভীর, না, ফোন কল না। একটা এসএমএস এসেছে। বিড়বিড় করে ম্যাসেজটা কয়েকবার পড়ল তানভীর। অদ্ভুত ব্যাপার! মোবাইল নাম্বারটায় সাথে সাথেই কল দিল। লাভ হলো না। মোবাইল সুইচড অফ!

এই সীমের বর্তমান অবস্থান জানা তার জন্য খুব কঠিন কাজ নয়। পরপর কয়েকটা নাম্বারে কল করল, নাম্বারটা দিল। ওরা বলল, অন্তত কালকের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কল করার সময় সীমের লোকেশনটা কোথায় ছিল সেটা তারা জানাতে পারবে।

সকাল এখনো অনেক দূর, রুমে কিছুক্ষন পায়চারি করল, এখন আর বই পড়ায় মন বসবে না, এরচেয় একটু হাঁটলে মাথাটা পরিস্কার হবে। অল্পকিছুক্ষনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল তানভীর, ঘুমিয়ে পড়ল সাথে সাথে।

অধ্যায় ৪৫

বাসার পরিবেশ থমথমে, একমাত্র জুনায়েদই যা কিছুটা ব্যতিক্রম, সকালে নাস্তার টেবিলে একের পর এক জোক বলেই যাচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় সে ছিল না বাসায়, পুলিশের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ এসেছিল এই খবরটা তাকে কেউ বলেনি। কৌতুকগুলো কোনটাই খুব বেশি আলোড়ন তুলতে পারছে না, নাস্তার টেবিলে বাকিরা সবাই চুপচাপ বসে আছে, অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। তবে জুনায়েদের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

তুষার কিছুক্ষন আগেই ফিরেছে জগিং থেকে, চেহারা দেখে কেউ বুঝতে পারবে না তার মনের মধ্যে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ফেরার পথে সকালের পত্রিকায় ছাপা খবরটা নজর এড়ায় নি, তবে এই বাড়ির কেউ এখনো পত্রিকা পড়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

"একটা খবর বলা হয়নি আপনাদের," জুনায়েদ বলল, অনেকটা ঘোষনা দেয়ার মতো করে, "আমি ভাবিকে একটা ট্রিট দেবো, ভাবি, এখন বলেন কী ট্রিট চান?"

সবাই ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল, গতকাল সন্ধ্যা থেকেই ওর চুপচাপভাব নজর এড়ায় নি তুষারের। টেনশন করছে যদিও মুখে বলছে না কিছু।

"তুমি কিরকম ট্রিট দিতে চাও?" কোনমতে বলল ক্রিস্টিনা।

"আমি এয়ার টিকিট কেটে ফেলেছি, হোটেলও বুকিং দেয়া শেষ, আমরা সবাই যাবো, কক্সবাজারে, ঘুরবো, খাবো।"

"বাবারা, তোমরা যাও, আমরা যাবো না," তুষারের বাবা বললেন।

"আপনারা না গেলে হবে?" জুনায়েদ বলল।

"হবে, তোমরা গেলেই আমাদের যাওয়া হবে," তুষারের বাবা বললেন আবার, "আমাদের কোন সমস্যা হবে না।"

"ঠিক আছে," বেশ মন খারাপ করেই বলল জুনায়েদ, "আজ বিকেলেই আমাদের ফ্লাইট।"

এরকম আচমকা প্ল্যানে কী বলবে বুঝতে পারছিল না তুষার। যে রকম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কথা বলছে জুনায়েদ তাতে ওকে মানা করতে গেলে রীতিমতো মন খারাপ করবে, আবার এই অবস্থায় কোনভাবেই যাওয়া সম্ভব না।

সুমনা, ক্রিস্টিনা দুজনেই তাকিয়ে আছে তুষারের মুখের দিকে।

"তোমরা যাও, ঢাকায় আমার একটা দাওয়াত আছে, অন্তত আমি না গেলে খুব মাইন্ড করবে," তুষার বলল।

"কোথায় দাওয়াত? কক্সবাজার থেকে ফিরে দাওয়াত নিলেই হবে," জুনায়েদ

বলল।

"আসলে অনেকদিন ধরে পিছাচ্ছি, তুমি এরকম প্ল্যান করবে জানলে দাওয়াত নিতাম না, এখন কী করে না বলি, বলো?" উল্টো প্রশ্ন করল তুষার, যেন এই প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

"আমার দাওয়াত কাল দুপুরে, আমি সম্ভব হলে কাল বিকেলে কিংবা পরশু সকালেই তোমাদের সাথে যোগ দেবো, ঠিকাছে?"

"ভাবি কি বলেন?" এবার ক্রিস্টিনাকে জিজ্ঞেস করল জুনায়েদ।

ক্রিস্টিনা তাকাল তুষারের দিকে একনজর, স্বামিকে বোঝার চেষ্টা করছে, সে জানে কোথাও কোন দাওয়াত নেই তুষারের, তবু এই মিথ্যে কথা বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে।

"আমার আপত্তি নেই, আমি সবসময় তৈরি, কক্সবাজারের নাম এতো শুনেছি, না দেখে গেলে আফসোস থেকে যাবে," হাসিখুশি গলায় বলল ক্রিস্টিনা।

"ওকে ডান তাহলে, ভাইয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো," জুনায়েদ উঠে পড়ল, তার নাস্তা করা শেষ। সুমনা এতোক্ষন চুপচাপ শুনছিল সব, জুনায়েদের আচমকা সব কর্মকান্ডে মাঝে মাঝেই বিরক্ত লাগে, কিন্তু কিছু বলার নেই, এটাই ওর স্বভাব।

নাস্তা করতে করতে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বাবার সাথে হাল্কা কথাবার্তা বলল তুষার, না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ক্রিস্টিনা একমনে তাকিয়ে দেখছে তাকে, হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে এতোদিনের পরিচিত মানুষটাকে এতো অচেনা লাগছে কেন। জুনায়েদের এই আকস্মিক প্ল্যানে একটা লাভ হয়েছে, ঢাকা ছাড়ার বন্দোবস্ত এরমধ্যেই করে ফেলতে হবে, রিটার্ন টিকেট কাটা ছিল, এয়ারলাইনের সাথে কথা বলতে হবে, টিকিটের তারিখ বদলাতে গিয়ে যদি কিছু ক্ষতিপূরন দিতেও হয় তাতেও আপত্তি নেই। এরমধ্যে খারাপ কিছু যদি ঘটেই যায় তাহলে অন্তত ক্রিস্টিনার কোন ক্ষতি হবে না।

নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে পড়ল তুষার। পরনের কাপড়চোপড় পাল্টে নিল খুব তাড়াতাড়ি, ক্রিস্টিনা এখনো নাস্তার টেবিলে, ওর প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ঢাকায় আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তার, খুব ঘনিষ্ট যে চারজন বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় আসা তাদের কেউ বেঁচে নেই।

মাসখানেকও হয়নি, এরমধ্যেই হুমকিদাতা একেরপর এক কাজগুলো করে গেছে। যেকোন সময় আসবে তার পালা। এরমধ্যে একটা কাজই করনীয় আছে। নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়া। হ্যা, অপরাধ তার ছিল। স্মৃতি থেকে মুছে দিলেই যে সে অপরাধ বাতিল হয়ে যায় তা নয়। বরং তা আরো বহুগুনে ফেরত

আসে। চৌদ্দ বছর আগের একটা দূর্ঘটনা... দূর্ঘটনা না বলে অপরাধ বলাই ভালো, তার শাস্তি পেয়েছে চারজন মানুষ। এই শাস্তি এড়ানোর জন্য অপরাধ স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু তাহলে ক্রিস্টিনার কাছে, পরিবারের সবার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না কোনদিন। তৈরি হয়ে ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল তুষার।

"আমি লাঞ্চের আগেই ফিরে আসবো," ক্রিস্টিনার উদ্দেশ্যে বলল তুষার।

"আচ্ছা," ক্রিস্টিনা বলল, তাকে খুব হতাশ মনে হচ্ছিল। দীর্ঘ দশবছর একসাথে থাকার পর এই প্রথম মনে হচ্ছে তুষারকে সে একদমই চেনে না, এই মানুষটা অন্য কেউ।

ক্রিস্টিনার হতাশ চেহারাটা দৃষ্টি এড়ালো না তুষারের, এই মুহূর্তে বাসার মধ্যে কেমন দমবদ্ধ হয়ে আসছিল। অন্তত কিছুক্ষনের জন্য হলেও বাইরে যাওয়া দরকার। গেটের বাইরে আসতেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

অচেনা নাম্বার, রিসিভ করবে কী করবে না ভেবে কল রিসিভ করল তুষার।

তুষার বেরিয়ে যেতে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ক্রিস্টিনার বুক চিরে। জুনায়েদকে যে করেই হোক ম্যানেজ করতে হবে, এখন ঢাকার বাইরে যাওয়া যাবে না কোনমতেই।

ক্রিস্টিনা সুমনাকে ইশারা করল, সেই ইশারার অর্থ অন্য কেউ না বুঝলেও সুমনা বুঝল, এই মুহূর্তে ঢাকা ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছে নেই ক্রিস্টিনার, নাস্তার টেবিলে ভদ্রতা করে মানা করতে পারেনি। দুজনেই নিশ্চিত তুষার কিছু একটা লুকাচ্ছে, নইলে এই সাত সকালে এরকম ফ্যাকাশে আর অন্যমনস্ক তুষারকে কখনো লাগেনি।

অধ্যায় ৪৬

এই শহরটা খুব অচেনা লাগছিল, মনে হচ্ছিল হঠাৎ করেই পরিচিত এই শহরটা অপরিচিত হয়ে উঠেছে। ভোরের পৃথিবী অন্যরকম, স্বচ্ছ, পরিস্কার, সজীব। দিনে-দুপুরে কিংবা সন্ধ্যার ঢাকাকে এতো প্রানবন্ত কখনোই লাগেনি। আধঘন্টার মধ্যে পৌছে গিয়েছিলেন অফিসে, রুম খুলে দিয়েছে পিয়ন। এক কাপ চা বানাতে বলেছেন, সেটাও দিয়ে গেছে কিছুক্ষন আগে।

চায়ে চুমুক দিয়ে আজকের দিনের কার্যকলাপ ঠিক করে নিয়েছেন। দশটার আগে আইজি সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে, তারপর ফিরে এসে এভিডেন্স কালেকশন টিম, তানভীর আর শাহরিয়ারকে নিয়ে বসতে হবে। ফুলপ্রুফ একটা প্ল্যান দরকার, এটা নিশ্চিত আইজি সাহেব আজকে আলটিমেটাম দেবেন, এই কেসগুলোর উপর নির্ভর করছে এই ডিপার্টমেন্টের ভবিষ্যত।

চায়ের কাপ রেখে কম্পিউটার চালু করলেন। টেবিলের একপাশে কাগজে মোড়ান খামটা এইসময় চোখে পড়ল। মনে পড়ল, এই খামটা তানভীর রেখে গিয়েছিল ভুল করে। ওকে মনে করিয়ে দেয়া হয়নি। খামটা কাছে টেনে নিলেন, বই আছে সম্ভবত। অন্যের খাম খুলে দেখাটা ভদ্রতার মধ্যে পড়ে না, তবে আপাতত কেউ নেই আশপাশে, খাম খুলে দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

হ্যা, বই-ই, বেশ স্বাস্থ্যবান একটা বই, সুন্দর বাঁধাই, প্রচ্ছদ ঝকঝকে, লাল রঙের প্রাধান্য বেশি, বইয়ের নামটাও ইন্টারেস্টিং "রক্তনীল সুখ"। এই নামের মানে কী! বইটা টেবিলের উপর রাখলেন। আপাতত মাথাটা পরিস্কার রাখা দরকার, সকালের এই সময়টা অফিসের কাজের বাইরে অন্য কোনদিনে চিন্তাভাবনা করলে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে বই পড়ার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

প্রথম পুরুষে বর্ণনা, তিনি পড়া শুরু করলেন :

"প্রথম অধ্যায়। পেছনের সিটে প্রায় জড়সড় হয়ে বসে আছি আমি, হৈ-হল্লা চলছে, খিস্তি-গালাগালি চলছে, পেটে বেশি চলে গেলে যা হয় আর কি। তাল সামলাতে না পারলে বেশি খাওয়ার দরকার কি। সিগারেট, গাঁজা, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাই জানালাটা খুলে দিয়ে ভেতরের বদ্ধ হাওয়াটাকে বের করে দিলাম, বাইরে তুমুল বৃষ্টি, বৃষ্টির ছিটে লাগছিল চোখে মুখে, তাতে ভালো লাগছিল। কিন্তু পাশে বসে থাকা আজমতের জন্য জানালাটা আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম, বৃষ্টির এক ফোঁটা গায়ে লাগলে ওর নাকি জ্বর চলে আসবে। এ কথা বলতে বলতে গলা ফাটিয়ে হাসছিল ছোঁড়া, ইচ্ছে করছিল ওর পেছনে লাথি দিয়ে গাড়ি থেকে বের করে দিতে, কিন্তু সেটা সম্ভব না। এই গাড়িটার মালিক আজমত, আমি সামান্য যাত্রী মাত্র, ভুলক্রমে চলে এসেছি। অবশ্য রওনা দেয়ার সময়

ঘুনাক্ষরেও টের পাই নি ঘটনা এতোটা গড়াবে।

গাড়ি চালাচ্ছে রাফি, ঝাকড়া চুলের পাগলা টাইপের একটা ছেলে। ওর পাশে বসে পায়ের উপর ড্রাম পেটাচ্ছে হামিদ, হেভি মেটাল গানের তালে তালে, পেছনের সিটে আমরা তিনজন, আমি, আজমত আর তুর্য্য।

এতোগুলো ছেলের মধ্যে তুর্য্য হচ্ছে আমার বন্ধু, বাকিরা হচ্ছে বন্ধুর বন্ধু। তুর্য্যের টানাটানিতে এদের সাথে এতোদূর আসা, নইলে এখন ইউনিভার্সিটির হলে নিজের রুমে একা একা বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না আমার। তুর্য্যের বন্ধু হচ্ছে এই বদমাসগুলো, একই স্কুলে পড়তো ওরা।

আজমতের বাবা বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ কামরুদ্দিন, কতো টাকার মালিক ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না, তার ছেলেও জানে না। রাফি, আর তুর্য্যও বড়লোক, উচ্চবিত্ত বলে এদের, এই ধরনের লোকদের গাড়ি বাড়ি আছে, সমাজে সম্মান প্রতিপত্তিও আছে, এবার বাবা-মা কর্পোরেট কোম্পানীতে চাকরি করে কিংবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। হামিদ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হলেও একসাথে বড় হয়েছে বলে একদম মিশে গেছে ওদের সাথে। এই গ্রুপটার সাথে একদম বেমানান আমি। বাবা সাধারন চাকুরে, অবসর নেয়ার পর সংসার কিভাবে চলবে তা নিয়ে এখন থেকেই বিশাল জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে দায়িত্বের পুরোটা আমার কাঁধেই এসে পড়বে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, পড়াশোনা প্রায় শেষ পযায়ে, এখনই দুটো টিউশনি করি, নিজের খরচ ভালোই চলে যায়, এছাড়া কিছু কিছু টাকা জমাচ্ছি। ছোট একটা বোন আছে, ওর দায়িত্বও আমার ঘাড়ে।

তুর্য্য আমার ক্লাসমেট, যদিও হলে থাকে না, বড়লোকের ছেলে, তারপরও অদ্ভুত হলেও সত্যি কিভাবে কিভাবে জানি এই তুর্য্যের সাথে চমৎকার একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গেছে। এরজন্য অবশ্য তুর্য্যই দায়ি, ক্লাসরুমে চুপচাপ বসে থাকা শ্যামলা, ঢ্যাঙা মেধাবী ছেলেটাকে সবাই যখন এড়িয়ে চলে, তখন তুর্য্যই এগিয়ে এসেছিল। এই একজন বন্ধুই আছে পৃথিবীতে, আর কেউ নেই কাছের, এই বিশাল ঢাকা শহরে আত্মীয়-স্বজন আমার হাতে গোনা। সেইসব আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বছরে একবারের জন্যও যেতে ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। হয়তো পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হলে চিনতে পারবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে যথেষ্ট।

তুর্য্যের সবকিছু ভালো হলেও এই একটা ব্যাপারই ভালো লাগে নি আমার কোনদিন, তা হলো ওর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ওর বন্ধু নেই, যেন পৃথিবীর সবাইকে বন্ধু বানানোর মিশনে নেমেছে ছেলেটা। তবে এরমধ্যে থেকেই আজমত, রাফি আর হামিদ তুর্য্যের খুব কাছের বন্ধু, এতো কাছের যে এরা সব কাজ একসাথে করে, সেটা বদমায়েশিই হোক বা অন্যকিছু।

এদের সঙ্গ আগে থেকেই এড়িয়ে চলি আমি, এরা অন্যধরনের মানুষ, কথাবার্তার ধরন থেকে শুরু করে হাসিটা পর্যন্ত অন্যরকম। এইসব মানুষের জীবনযাত্রার সাথে

একেবারেই খাপ খায় না আমার কোনকিছু।

আজই যেমন একরাতে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, মাসে তিনহাজার করে টিউশনির টাকা জমিয়েও পঞ্চাশ হাজার জমাতে পারিনি। অর্থের এমন নিদারুন অপচয় দেখলে কষ্ট লাগে, কিন্তু বলার কিছু নেই। এই টাকা ওদের কাছে কিছুই না। হাত-খরচ। আজমতের পকেট ঝাড়া দিলে এই মুহূর্তে আরো পঞ্চাশ হাজার বেরিয়ে আসবে বলে ধারনা করছি। খরচের বেলায় অন্যরা ভাগাভাগি করলেও আমাকে এইসব ভাগাভাগিতে রাখে না ওরা। জানে আমি গরীব, এতো টাকা খরচ করতে পারবে না, আমাকে ওরা দুধভাত হিসেবে দেখে। মাঝে মাঝে খুব প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়, বলতে চাই, আমার কাছে টাকা থাকলেও এভাবে উড়াতাম না।

যাই হোক, অন্যান্য দিন সবকিছু লাগামের মধ্যে থাকলেও আজ একদম বেসামাল হয়ে পড়েছে সবাই। বিশেষ করে রাফি, গাড়ি চালাচ্ছে না মনে হয় কোন রেসিং গেম খেলছে। এই মুহূর্তে যে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে তা যথেষ্টই খারাপ, দু'পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর বেশিরভাগের বাতি জ্বলছে না, জায়গায় জায়গায় গর্ত, বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো ঢেকে থাকায় কতোটা গভীর তা বোঝাও যাচ্ছে না, ল্যান্ডক্রুজার গাড়িটা অবলীলায় চালাচ্ছে রাফি, কোন কিছুর পরোয়া করছে না। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে দূরপাল্লার বাস চলে যাচ্ছে, উঁচু সিটে বসে বাসের ড্রাইভাররা খিস্তি-খেউর করছে ল্যান্ডক্রজারের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে। ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছে না রাফি, দাঁত বের করে হাসি দিয়ে মধ্যমা দেখিয়ে দিচ্ছে। বাসড্রাইভাররা এই মধ্যমা প্রদর্শনের মানে বুঝতে পারছে না, তা দেখে ল্যান্ডক্রজারের ভেতর হাসির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে।

স্পিডোমিটারের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি, গাড়ির গতি কমপক্ষে একশ'র কাছাকাছি। এই ধরনের গতিতে চলতে থাকলে দূর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাতে অন্য কোন যাত্রীর কোন ভ্রুক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। তুর্য্যের মুখের দিকে এক ফাঁকে তাকালাম। বোঝাই যাচ্ছে নেশায় চুর হয়ে সাধারন বোধশক্তি হারিয়েছে ছেলেটা, হেভি মেটাল গানের তালে তালে হামিদ বাতাসে ড্রাম বাজাচ্ছে আর তুর্য্য গিটার, যদিও সেই গিটার খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না। আজমত মাঝখানে বসে হো হো করে হাসছে মাঝে মাঝে। ওর গা থেকে কেমন বোটকা গন্ধ পাচ্ছি, গন্ধটা সম্ভবত বমির। আর ভাবতে চাইলাম না, বমির কথা মনে হতেই গা গুলাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে হেভি মেটাল গানটার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছি। কাজ হচ্ছে না, ষাঁড়ের মতো গলায় চেঁচিয়ে কী বলছে তা বোঝার মতো ক্ষমতা এখনো আমার হয়নি।

বৃষ্টি আরো জোরে পড়া শুরু করেছে, গাড়ির ছাদে বৃষ্টির শব্দে অনেক আগে টিনের ছাদওয়ালা বাড়িতে থাকার দিনগুলো মনে পড়ে গেল। ছোটখাট যে মফস্বল শহর থেকে এসেছি সেখানে আমার বাড়ির চাল টিনের, বৃষ্টির দিনে ঝমঝম শব্দে

দিনে-দুপুরে কাঁথা গায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ভালোই লাগত।

ইনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে খুব কমই যাওয়া হয়েছে মফস্বল শহরটাতে, নিজের পড়াশোনার চাপ, সাথে টিউশনির তাড়ায় প্রায় সারাবছরই ঢাকায় কাটাতে হয়।

বাইরের প্রবল বর্ষনে মনটা একটু বিষন্ন, গত কয়েকদিন অনন্যার সাথে দেখা হয়নি, ইউনিভার্সিটির ক্লাস নেই, ক্লাস না থাকলে বাসা থেকে বেরুতেও পারে না মেয়েটা। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম মোবাইল ফোন, কথা বলতে ইচ্ছে করলে দোকান থেকে কল করি, খুব বেশিক্ষন কথা বলা যায় না, দশ মিনিট কথা বললেই অনেক টাকা বিল চলে আসে। টাকা জমিয়ে একটা মোবাইল ফোন কেনার প্ল্যান অনেকদিনের। তবে খুব সহসাই সেই প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হয় না। আজ রাতে বাইরে থাকায় ফোন করা হবে না, মেয়েটা সারা সন্ধ্যা মোবাইল ফোন পাশে নিয়ে বসে থাকবে, তারপর একসময় বালিশের কাছে রেখে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। চাইলে তুর্য্য কিংবা গাড়ির অন্য কোন যাত্রীর মোবাইল ফোন নিয়ে কথা বলতে পারি, কিন্তু এইসব ছেলেদের মোবাইলে অনন্যার নাম্বার চলে যাক তা চাই না। তুর্য্যের মোবাইল থেকে কথা বলাটা নিরাপদ, তবে বন্ধুর বোনের সাথে তার মোবাইল থেকেই প্রেমালাপ করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। অবশ্য এই মুহূর্তে তুর্য্যের উপর খুব রাগ হচ্ছে। কেন যে ওর কথা শুনে এখানে আসতে গেলাম!

মাথা ঘুরছে, উঁচুতালের বিটে, হৃদপিন্ডের উপর চাপ বাড়ছে। অথচ গাড়ির বাকি যাত্রীদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। চিৎকার করে গাড়িটা থামিয়ে নেমে যেতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু বৃষ্টিময় এই অন্ধকার রাতে হাইওয়েতে নেমে যাওয়ার মতো ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। এরচেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করাই ঠিক করলাম।

সীটে মাথা হেলান দিয়ে চুপচাপ ভালো কোন স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছি, ভালো কিছু মনে পড়ছে না। বরং চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। এতো হইচইয়ের মাঝেও কিভাবে ঘুম পায়!

দ্রুত গতিতে চলমান ল্যান্ডক্রুজার আচমকা ব্রেক কষল। এতো জোরে ব্রেক চেপেছে যে নিজের সীট থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, পাশে বসে থাকা আজমত আর তুর্য্য জেগে ছিল, নিজেদের কোনমতে সামলেছে। রাফিরও কোন সমস্যা হয়নি, ড্রাইভিং সিটে বসে সীটবেল্ট আটকে নিয়েছিল, শুধু ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে বসে থাকা হামিদ নিজেকে সামলাতে পারেনি। সামনের কাঁচে গিয়ে লেগেছে মাথা, কাঁচ ফেটে গেছে, মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।

গাড়ির স্টার্ট অফ করেছে রাফি, সামনের হেডলাইট জ্বলছে শুধু। বৃষ্টির মধ্যে খুব বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।

"কি হইছে, এতো জোরে ব্রেক চাপলি ক্যান?" আজমত জিজ্ঞেস করল রাফিকে।

উত্তর দিলো না রাফি, পেছনে রাখা টিস্যু বক্স এগিয়ে দেয়ার জন্য ইশারা করল।

তুর্য্য এগিয়ে দিল টিস্যুর বাক্সটা। হামিদের মাথার উপর টিস্যু চেপে ধরেছে রাফি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না তাতে, রক্তে দ্রুতই লাল হয়ে গেছে টিস্যু।

"কি রে, উত্তর দেস না ক্যান? হইছে কি?" আজমত বলল আবার।

তুর্য্য দরজা খুলে বের হলো, বাইরের প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে। পেছনের সিটে বসে দেখছি, কি করবো বুঝতে পারছে না। এরমধ্যেই আজমত আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

তুর্য্য গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হেডলাইটের আলোয় ওর চেহারায় প্রচন্ড বিস্ময় লক্ষ্য করছি।

বিস্ময় না বলে আতংক বলা ভালো হবে। আজমতেরও নজর এড়ায় নি ব্যাপারটা। সেও বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

রাফি চুপচাপ হামিদের মাথায় একের পর এক টিস্যু ধরে যাচ্ছে, রক্ত পড়া থামেনি। হামিদ কিছুক্ষন আগেও প্রায় নেতিয়ে পড়েছিল, এখন চোখ খুলে তাকিয়েছে, তার দৃষ্টিও সামনের দিকে। যেখানে তুষার দাঁড়িয়ে আছে, আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে।

রাফিকে ঠেলে দিয়ে হামিদ বের হলো গাড়ি থেকে। এবার আর অপেক্ষা করলাম না। কি হয়েছে দেখার জন্য বের হলাম গাড়ি থেকে। বৃষ্টির পানি বেশ শীতল, যেন চামড়া ভেদ করে ভেতরে চলে যাচ্ছে।

দৌড়ে গাড়ির সামনে চলে এলাম, রাফি ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে আছে একসাথে। রাফি গাড়ি থেকে বের হয়নি।

একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ, পড়ে আছে, কাদায় আর রক্তে মাখামাখি হয়ে। গাড়ির ভেতরের দিকে চলে গেছে অর্ধেকটা, শুধু তার মুখটা দেখা যাচ্ছে, চোখ খোলা, এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে বড় বড় করে। একপাশে কাগজের একটা ঠোঙা পড়ে আছে, সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিছু ঔষধের বোতল আর কিছু ক্যাপসুল, ট্যাবলেটের ফয়েল। তার সামনে চারজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে, তবে তারা সকলেই এখন চলৎশক্তিহীন, ভাষাহীন, নির্বোধ প্রানী যেন। কিংকর্তব্যবিমুঢ়।

হামিদ তার মাথা চেপে রেখেছে হাত দিয়ে, তাতে রক্ত পড়া থামে নি, বৃষ্টির পানিতে রক্ত এসে মিশে যাচ্ছে তার সাদা টি-শার্টে। আজমতের মুখটা এখন পাথরের মতো, ভাবলেশহীন। তুর্য্য তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে, বুঝতে পারছে না কী করবে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এরকম কিছু একটার আশংকা করছিলাম সে মনে মনে। আজ রাতে ভালো কিছু হতেই পারে না, মনে এমন কুডাক দিচ্ছিল সেই সন্ধ্যায় যখন ওদের সাথে বের হতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

এগিয়ে গেলাম, লোকটাকে গাড়ির নীচ থেকে টেনে বের করা সম্ভব, ল্যান্ডক্রুজার অন্যান্য গাড়ির তুলনায় একটু উঁচু। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার আগে আমার হাত টেনে ধরল আজমত। কড়া চোখে তাকাল।

"কি করতে চাও?" চেঁচিয়ে বলল আজমত, বৃষ্টির শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে।

"ওকে বের করে আনি, হাসপাতালে নিতে হবে," বললাম আমি।

রাফি বের হয়ে এসেছে এবার ড্রাইভিং সীট থেকে। ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল বাকিদের সাথে।

মধ্যবয়স্ক লোকটাকে দেখল তাকিয়ে, তাকে খুব বিস্মিত মনে হলো না।

"চুপ থাকো, মিয়া," আজমত বলল, বুঝতে পারছি মেজাজ ঠিক নেই আজমতের, এই সুরে আমার সাথে আগে কখনো কথা বলে নি, "এই লোকরে হাসপাতালে নিলে বাঁচবে?"

"চেষ্টা তো করতে হবে," চড়া গলায় বললাম। আজমতের হাতের বাঁধন খুলে আবার এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু এবার আজমত হ্যাচকা টানে আমাকে পেছনে নিয়ে এলো।

"তুর্য্য, তোর এই দোস্তরে সাবধান কর, বেশি মাতবরি যেন না করে," এবার হুমকির সুরে বলল আজমত।

"তাহলে কি করতে চাস তুই?" এবার পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল হামিদ।

"যা হওয়ার হইছে। এইটা একটা দূর্ঘটনা। নাকি?" সবার কাছ থেকে সায় নিতে চাইল যেন আজমত, "এখন এই লোকটা মরলে রাফি জেলে যাবে। সাথে আমরাও। আমরা সবাই মদ খাইছি, মাথার ঠিক নাই। আমাদের জেলে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"কিন্তু লোকটা এখনো বেঁচে আছে," তুর্য্য বলল।

"হাসপাতালে নেয়ার পর লোকটা মরলে কথা তো একই দাঁড়ায়, নাকি?" আজমত বলল।

"তুই কি করতে চাস?" হামিদ জিজ্ঞেস করল আবার।

"ঘটনা এখানেই ধামাচাপা দিতে হবে, সিম্পল," আজমত বলল, রাফির দিকে তাকাল, "মেইন আগামি কিন্তু তুই, বুঝলি?"

রাফি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি মৃতপ্রায় লোকটার দিকে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে লোকটা, পারছে না।

আজমত এগিয়ে হাটুগেড়ে বসল লোকটার সামনে। বেশ কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল।

"এই লোক বাঁচবে না, আমাদের নিয়া মরবে," আজমত বলল।

বৃষ্টির তেজ আরো বেড়েছে, হাতে ঘড়ি নেই আমার, তবে ধারনা করছি রাত একটার কম বাজে না।

হাইওয়েতে এই সময় দ্রুতগতিতে বড় বড় ট্রাক চলে, তবে আজকের রাতে ট্রাক বা বাস কিছুটা কম, রাস্তার দুপাশের ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বলছে না বলে পুরো রাস্তাটাই বেশ অন্ধকার। অন্তত গাড়ি থেকে নামার পর বেশ কিছুক্ষন হয়ে গেলেও পাশ

দিয়ে কোন ট্রাক বা বাস যায়নি। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না, রাস্তার অবস্থা এমনিতেই খারাপ, বৃষ্টিতে এখন কাদা হয়ে গেছে সবজায়গায়।

বৃষ্টিতে ভিজে সবার জুবুথুবু অবস্থা, যে আজমতের এক ফোটা বৃষ্টির পানি লাগলে জ্বর চলে আসে সেও এখন বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, রাফির ঝাকড়া চুল মাথার সাথে লেপ্টে আছে। হামিদ দাঁতে দাঁত চেপে তার ব্যথা সহ্য করছে। তুয্য দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, এই বৃষ্টিতেও তার নেশা কাটেনি এখনো।

ল্যান্ডক্রুজারের নীচে আটকে যাওয়া মানুষটার চোখ বন্ধ এখন। মারা গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। পাঁচজন মানুষ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কেউ।

আজমত শুরু করল।

"কি করতে চাও তোমরা? তাড়াতাড়ি বলো, সারারাত কি বৃষ্টিতে ভিজবো নাকি?"

"আমরা ভোটাভুটি করতে পারি," হামিদ বলল।

"একটা মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে খেলা করার অধিকার নেই আমাদের," আমি বললাম জোর গলায়, "ওকে হাসপাতালে নিতে হবে এটাই ফাইনাল কথা।"

"ঐ বানচোদ, তোরে না কইছি মাতবরি কমায়া করতে," খেঁকিয়ে উঠে আজমত, "তোমরা ভোট দাও, হাসপাতালে নিবা না এখানেই..."

"এই লোক ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই বাসায় কোন রোগি আছে," আমি বললাম, "আমরা জানি না, ওষুধ নিয়ে না গেলে ঐ রোগির কোন ক্ষতি হবে কি না।"

"ওরে শালা, এতো চিন্তা করার সময় নাই," আজমত বলল, মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর কথাগুলো বলতে গিয়ে, "মানবতা দেখাইতে গিয়া জেল খাটবো না আমরা, বুঝলি? ঐ তোরা কি বলিস?" বাকিদের উদ্দেশ্যে বলল শেষ কথাটা।

"হাসপাতালে নেয়া যাবে না," তুর্য্য বলল, অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকালাম, ওর কাছ থেকে এরকম সিদ্ধান্ত আশা করিনি।

অদ্ভুত ব্যাপার! হামিদ, রাফিও একই সিদ্ধান্ত দিল। হাসপাতালে নেয়ার কোন সুযোগই নেই। পুলিশের ঝামেলায় পড়তে চায় না কেউ। তারচেয়ে লোকটাকে কোনমতে ল্যান্ডক্রুজারের নীচ থেকে বের করে এনে রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়াই উত্তম।

কী করবে বুঝতে পারছি না। এ কাজে অংশ নেয়া মানে সরাসরি মানুষ খুনের ভাগিদার হওয়া। একটা দূর্ঘটনা ঘটতেই পারে, তাই বলে এভাবে দায়িত্ব এড়ানোটা সভ্য মানুষ হিসেবে একদম অনুচিত। চেঁচিয়ে উঠতে যাবো, আটকাল তুর্য্য। পাশ দিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছে। ট্রাকের ড্রাইভার এই বৃষ্টির মধ্যেও জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। মুহূর্তেই ল্যান্ডক্রুজারের নীচে আটকে থাকা লোকটাকে আড়াল করে ফেলল চারজন মিলে।

"হইছে কি? গাড়ি খারাপ নাকি?" জিজ্ঞেস করল ট্রাক ড্রাইভার, গতি কমিয়ে এনেছে।

"জি, খারাপ, তবে চিন্তার কিছু নাই। ঠিক হয়ে যাবে," চেঁচিয়ে উত্তর দিল আজমত।

ট্রাক ড্রাইভার আর কথা বাড়াল না। চলে গেল।

মুমূর্ষু লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হামিদ আর তুর্য্য, কী করবো বুঝতে পারছি না। আমার কথা শোনার মতো কেউ নেই এখানে। লোকটার চোখ এখনো খোলা, সেখানে প্রানের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। লোকটা কী মরে গেছে?

হামিদ আর তুর্য্য দুজনে দুই হাত ধরে টান দিল, খুব জোরে নয়, ল্যান্ডক্রুজারের নীচে ঠিক কিভাবে আটকে গেছে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না। জোরে টান দিলে কী না কি হয়, সে ঝুঁকি নিতে চাইল না।

তবে টান দেয়ার সাথে সাথেই একটু নড়ে উঠল লোকটা, দৌড়ে লোকটার কাছে যেতে চাইলাম, বাঁধা দিল রাফি। ওর চেহারা পাথরের মতো থমথম করছে, চোখে খুনে দৃষ্টি। এই ছেলে চাইলে আমাকে এখানেই মেরে ফেলে যেতে পারে, কোন আপত্তি করবে না কেউ, এমনকি আমার ঘনিষ্ট বন্ধু তুয্যও না।

মধ্যবয়স্ক লোকটাকে টেনে বের করে এনেছে হামিদ আর তুর্য্য, দুজনেই হাঁপিয়ে উঠেছে। লোকটার সারা শরীর রক্তাক্ত, বৃষ্টির ফোঁটায় সে রক্ত মিশে যাচ্ছে ঘোলাটে কাদা পানির সাথে, চোখ দুটো এখন বন্ধ, তবে ডান হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প করে, যেন কিছু চাইছে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, এই মধ্যবয়স্ক লোক কারো স্নেহময় বাবা, কারো মাথার উপর ছাদ, কারো ভাই। এই রাত-বিরেতে বিশেষ কোন প্রয়োজনে বেরিয়েছিল নিশ্চয়ই, সে প্রয়োজনের উর্ধে চলে যাচ্ছে লোকটা এখন, তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু রাফি শক্ত করে আটকে ধরেছে। শুকনো পাতলা এই ছেলেটা এতো শক্তি ধরে জানা ছিল না। আজমতের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, ওর নির্দেশের অপেক্ষা করছে যেন।

এই প্রথমবারের মতো দ্বিধান্বিত দেখা গেল আজমতকে। একজন মানুষের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক এখন সে।

তাকিয়ে আছি আজমতের দিকে, মাথামোটা, ইন্দ্রিয়পরায়ন, বদমাশ, হিংসুটে আর অহংকারি আজমত ভালো কোন সিদ্ধান্ত দেবে আশা করি না। তবে পরিস্থিতি মানুষকে বদলে দিতে পারে, হয়তো আজমতও নিতে পারে প্রান বাঁচানোর সিদ্ধান্তটা।

কিন্তু হতাশ করে দিয়ে হাত ইশারা করল আজমত, যার অর্থ ফেলে দাও। হ্যা, আশপাশে ফেলে দেয়ার জায়গা আছে। রাস্তাটার ধারেই বেশ বড় একটা ঢাল, এমনিতে পাহাড়ি এলাকা না হলেও ঢালটা বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে, সেখানে ঘন ঝোপ-ঝাড়।

হামিদ আর তুর্য্য দুজন কোনমতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেহটা, লোকটার হাত এখনো নড়ছে, হয়তো বুঝতে পারছে শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। রাফির শক্ত হাতের বাঁধনে ঢিল পড়তে দেখলাম। এখন আর কিছু করার নেই। বৃষ্টিভেজা এই রাতে একজন মানুষ মরে যাচ্ছে, তাকে অন্ধকার এক খাদে ফেলা দেয়া হচ্ছে, আর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আমি, নিজের প্রতি ঘৃনা হচ্ছিল খুব।

"সমস্যা হচ্ছে," তুর্য্য বলল, রাস্তার একপাশে ফেলে রেখেছে দেহটা, বেশ ভারি দেহটা টানতে গিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, "এই লোকটাকে এখানে ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না?"

"ক্লিয়ার করে বল," আজমত বলল।

"ধরি, লোকটা মরল না, বেঁচে গেল, যেভাবেই হোক, তারপর আমাদের পরিচয় ফাঁস করে দিলো, তাহলে?"

"কিভাবে পরিচয় ফাঁস করবে?"

"তোর গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছে লোকটা, সেটা পুলিশকে বললে আমাদের খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ হবে না।"

নীরবতা নেমে এসেছে সবার মাঝে, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তুর্য্যের দিকে, ওকে আমি অন্যরকম ভাবতাম, ভাবতাম মানবীয় গুনাবলী আর প্রানশক্তিতে ভরপুর একটা ছেলে, যে একই সাথে বন্ধুবৎসল, সাহসি এবং কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু তুর্য্যের কথাগুলোয় ওর সম্পর্কে আমার ধারনা আজীবনের মতো পাল্টে গেল।

"তাহলে?" প্রশ্নটা করল হামিদ, মদের নেশা এখনো কাটেনি, ওকে এখন যা করতে বলা হবে তাই করবে, এমনকি কেউ বললে এই ঢাল থেকে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

"একটা উপায়ই আছে," আজমত বলল, ল্যান্ডক্রুজারের দিকে এগিয়ে গেল, পেছনের সীট তুলে কিছু একটা বের করে নিয়ে এলো। জিনিসটা দেখলাম, আতংকে জমে গেলাম সাথে সাথে, একটা রিভলবার, এর আগে এই ধরনের জিনিস চাক্ষুষ করিনি।

"কিন্তু কাজটা আমি করবো না," আজমত বলল।

"তাহলে কে করবে?" জিজ্ঞেস করলো তুর্য্য।

"সুমন," ঘোষনা দিল আজমত, ওর বাজখাই কণ্ঠে নিজের নাম শুনে চমকে গেলাম। আমি কেন এই অন্যায় করতে যাবো?

"প্লিজ, এই লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই, তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে," আবার বললাম।

"তোর বুদ্ধি দিয়ে তো আমি চলি না," আজমত বলল, "তুই ফকিন্নির ছেলে, জেলে গেলে তোর সমস্যা নাই, আমার সমস্যা আছে।"

"জেলে গেলে যাবো, কিন্তু একজন নিরপরাধ মানুষকে এভাবে ফেলে যেতে পারি

না।"

"ফেলে যাওয়ার জন্য এই রিভলবার বের করি নি," আজমত বলল, "কোন প্রমান রাখা যাবে না। আজকে রাতের ঘটনা আমরা সবাই ভুলে যাবো, ঠিক আছে?"

মাথা নাড়াল সবাই, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। নেশা করে সত্যিই কি ওদের সাধারন বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, নইলে এই ছেলেগুলোকে এতোটা অমানবিক মনে হয়নি কোনদিন।

"মারতেই হবে?" তুর্য্য বলল আজমতের উদ্দেশ্যে, "তাহলে কাজটা তুই কর।"

"এই ঘটনার আমরা সবাই সমান অপরাধি," আজমত বলল, "সুমন কাজটা না করলে তুই করবি। এটাই শেষ কথা।"

আমি তাকালাম তুর্য্যের দিকে, অন্ধকারের মধ্যে ওর চেহারাটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে বাঁকা একটা হাসি দিল ছেলেটা।

"ঠিক আছে, আমিই করছি," বলল তুর্য্য।

আজমত এগিয়ে গিয়ে রিভলবারটা দিল তুর্য্যের হাতে।

শেষ দৃশ্যটা দেখবো না বলে ঠিক করলেও চোখ সরাতে পারলাম না। ঢালের ঠিক শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে হামিদ আর তুয্য। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল তুয্য, তার হাতে রিভলবারটা ধরা, তাক করে আছে লোকটার বুক বরাবর।

মধ্যবয়স্ক লোকটার চেহারা এখন পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রনাকাতর একটা মুখ, বুকের একপাশটা এরমধ্যেই রক্তে লাল হয়ে আছে, সম্ভবত পাঁজর ভেঙে গেছে। পা দুটো হাঁটুর নীচ থেকে ঝুলছে, বোঝাই যাচ্ছে এই পা'জোড়া দিয়ে বেঁচে থাকলে কোনদিন হাঁটতে পারবে না লোকটা। লোকটা সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে, হয়তো শুনেছে আমার কথা, বুঝতে পারছে এখানে উপস্থিত বাকি সবার সাথে আমি একমত নই। তবে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের আশা-ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে থাকাটা খুব কষ্টের। আমি কিছুই করতে পারছি না, রাগে আমার হাত-পা কাঁপছে, ঘটনার আকস্মিকতায়, ঘটনার হিংস্রতায়। নিজের অক্ষমতায় নিজেকেই খুন করে ফেলতে ইচ্ছে হলো আমার।

ট্রিগার চাপল তুর্য্য, রাতের নিস্তব্দতা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল মুহূর্তেই। লোকটা এখনো তাকিয়ে আছে অবাক দৃষ্টিতে, বিশ্বাস করতে পারছে না সম্ভবত, বুলেটটা তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যন্ত্রনার ছাপ নেই চেহারায়, ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে, একটু কেঁপে স্থির হয়ে গেল, দৃষ্টিহীন খোলা চোখদুটো এখনো তাকিয়ে আমার দিকে।

হামিদ আর তুর্য্য দুজনে মিলে দেহটাকে ছুঁড়ে দিল শুন্যতায়। কোন আর্তনাদ শোনা গেল না, তবে বেশ কিছুক্ষন পর পতনের শব্দ কানে এলো সবার।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে। আজ রাতে বের হওয়াটাই ভুল ছিল। একজন নিরপরাধ মানুষের রক্ত এখন আমার হাতে। এই বৃষ্টির পানিতে হাজার

বার ধুলেও যা কখনো উঠবে না। বাকি সবার সাথে ল্যান্ডক্রুজার গাড়িটায় উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। রাফি চালাচ্ছে, তবে এবার অনেক ধীর গতিতে। মিউজিক সিস্টেম বন্ধ। জানালা খোলা রাখা হয়েছে, বৃষ্টির পানির ছাট ঢুকে ভিজিয়ে দিচ্ছে গাড়ির ভেতরটা, তবে তাতে খুব একটা আপত্তি দেখা যাচ্ছে না কারো। বৃষ্টির পানিতে সবাই ভিজে গেছে, গাড়িতে কোন তোয়ালে নেই। তুর্য্য জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে, আমি ওর দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। ঘৃনা হচ্ছিল, এতো কাছের বন্ধু হয়েও তুর্য্যকে চিনতে পারি নি বলে। আজ তুর্য্য যদি আমাকে সমর্থন করতো তাহলে একটা প্রান হয়তো বেঁচে যেত।

মাথাটা দপদপ করছিল, বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা বারবার লাফ দিয়ে বের হয়ে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে, এমন অন্যায় সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমার পক্ষে। বৃষ্টি আর বজ্রপাত ছাপিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম, কেঁপে উঠল গাড়ির বাকি যাত্রীরা।

"ঐ, কি হইছে তোর?" আজমত পাশ থেকে বলে উঠে।

"তোরা খুন করলি কেন?" চেঁচিয়ে বললাম, "আমি পুলিশে বলে দেবো।"

"তুর্য্য, তোর এই ফাউল বন্ধুরে বুঝা, আরেকবার এইরকম কথা কইবো তো লাশ নামাইয়া দিমু কইলাম," আজমত গরগর করে উঠে রাগে।

"একজনরে খুন করছিস, আমারে মারতে কতোক্ষন! অ্যা!" বলে হাসলাম, মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে, বিনা কারনে একজন মানুষকে মেরে ফেলা কোনভাবেই নিতে পারছি না। লোকটার দৃষ্টিহীন খোলা চোখদুটি এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে।

"ঐ, তুই মুখ সামলাইয়া কথা ক কইলাম!" আমার কলার চেপে ধরল আজমত।

"না হলি কী করবি, মারবি?" ক্ষেপার মতো চেঁচালাম আমি।

"সুমন, তুই শান্ত হ," এবার তুর্য্য বলল পাশ থেকে, "যা করার দরকার ছিল তাই করেছি। এখানে মানবতা করতে গেলে সবক'টা জেলের ভাত খেতাম।"

"তুই কথা বলিস না," বললাম আমি, "তোকে আমার চেনা হয়ে গেছে।"

"তুই আমাকে চিনে ফেলেছিস?" বেশ অবাক গলায় বলল তুর্য্য, "সেটা কিরকম বলতো শুনি?"

"তুই ভেবেছিস, আমাকে বাদ দিয়ে হায়দায় স্যার তোকে স্কলারশীপের জন্য রেকমেন্ড করবে," বললাম আমি, "ব্যাপারটা এতো সহজ না। ঐ স্কলারশীপ আমার জন্য, স্যার আমাকেই রেকমেন্ড করেছেন।"

"আচ্ছা, আর কি?"

"তুই চাইলেও অনন্যাকে আমার কাছ থেকে সরাতে পারবি না," চেঁচালাম আমি, জানি আমার মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছেলের সাথে বিয়ে দিতে ওর পরিবার কখনোই রাজি হবে না এবং এই অমতের পেছনে সবার আগে আসবে তুর্য্যের নাম, তবে এই পরিস্থিতিতে কথাগুলো বেমানান, বিশেষ করে ওর স্কুলফ্রেন্ডগুলোর সামনে, ওরা

নিশ্চয়ই পরে তুর্য্যকে কথা শোনাতে ছাড়বে না।

"তোর চাল-চুলো কিচ্ছু নেই, শুধু ভালো ছাত্র এই দিয়ে কতোটুকু?" হাসল তুর্য্য, "আর আমি অনন্যাকে সরাতে চাই নি, তবে তোর কথায় মনে হলো, তোর কাছ থেকে ওকে সরানো দরকার। তুই একটা ছোটলোক।"

"আমি ছোটলোক! কি অদ্ভুত!" আমি হাসছি, বলে কি? এই মাত্র ঠান্ডা মাথায় একজনকে খুন করে বলে কি না আমি ছোটলোক!

"হু, তোর মতো পাগল-ছাগলের সাথে কেন মিশতে গিয়েছিলাম কে জানে।"

"আমাকে পাগল বলছিস সমস্যা নেই, তবে তোদের চারজনকে আমি ছেড়ে দেবো না, তোরা সব ফাঁসির আগামি।"

তুর্য্য এগিয়ে এলো আমার দিকে, হাত উঁচু করে। মনে হলো মারতে আসছে, আমিও এগিয়ে গেলাম, শারীরিক শক্তি কোন অংশে কম নেই আমার। মাঝখানে এসে দাঁড়াল আজমত, তুর্য্যকে হাতের ইশারায় থামাল।

"তুই থামালি কেন?" বললাম আমি, "আজ ওকে আমি দেখে নেবো।"

"তোর মতো বানচোদ আমি জীবনে দেখি নাই," আজমত বলল, "ঐ রাফি, গাড়ি থামা।"

অনেকদূর চলে এসেছি আমরা, রাস্তা এখানে আরো অন্ধকার, দুইপাশে গাজীপুরের ঘন শালবন, বৃষ্টি পড়ছে এখনো মুষলধারে। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে আজমতের বলার সাথে সাথে।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল আজমত, হামিদকে ইশারা করল।

কাদাময় মাটিতে পড়ে গিয়ে কোনমতে উঠে বসেছি, দেখলাম একটা হকিস্টিক আমার কাঁধ বরাবর নেমে এলো, আরেকটু হলেই মাথায় পড়তে যাচ্ছিল, হকিস্টিকটা ধরে আছে হামিদ। আজমত, তুর্য্য আর রাফির হাতেও আছে একটা করে। চারপাশ থেকে ওরা চারজন আমাকে ঘিরে ধরেছে। একের পর এক হকিস্টিকের আঘাত পড়তে লাগল আমার শরীরে।

"বন্ধুর বোনের সাথে প্রেম করো, সেইটা আবার বড় গলায় কও, বানচোদ," আজমতের কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"তুই আমারে পুলিশি দিবি, তোর হাড্ডি-গুড্ডি একটাও আস্তা রাখুম না," হামিদ বলছিল একপাশ থেকে।

তুর্য্য আমার ঘনিষ্ট বন্ধু, হাতে হকিস্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো আঘাত করে নি, সময় নিচ্ছে, সামান্য একটু বিবেক এখনো হয়তো অবশিষ্ট আছে ওর মধ্যে। তবে ওর চোখে আমার জন্য ঘৃনা দেখতে পেলাম, এই ঘৃনার উৎস জানা নেই, ও কি তাহলে আমাকে এতোদিন ওর প্রতিদ্বন্দ্বি ভেবেছিল, আজকেই ওর আসল সুযোগ আমাকে সরিয়ে দেয়ার? জানি না।

একের পর এক আঘাতে চোখে অন্ধকার দেখছি, শরীরে এখন আর কোন কিছু

অনুভব করছি না, চোখ বন্ধ করার আগে শেষবারের মতো ওদের চারজনের চেহারাটা দেখে নিলাম, মারা যাচ্ছি হয়তো, তবে কোনভাবে যদি বেঁচে যাই, তাহলে কোন না কোনদিন এই ঋন শোধ করবো। বন্ধুত্বের ঋন বাকি রাখতে নেই।

আরো মিনিট পনেরো পর জঙ্গলের ভেতরে ওরা আমাকে রেখে এলো, ডালপালা আর লতাপাতা দিয়ে ঢেকে, একজন মৃত মানুষ হিসেবে।

নয় বছর আগের এক রাতের এই একটা ঘটনাই আমার জীবনটাকে পাল্টে দিল।"

একটানা প্রথম অধ্যায়টা পড়ে বইটা টেবিলের উপর রাখলেন। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পড়াতে এতোটাই মগ্ন ছিলেন সামনে চায়ের কাপ রাখা মনেই ছিল না, চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। অফিস শুরুর সময় হয়ে গেছে। বইয়ের বাকি অংশগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেলেন। পুরো বই পড়তে অনেক সময় লাগবে, এতো সময় হাতে নেই। পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে বিশেষ অংশগুলো পড়ে গেলেন। শেষ অধ্যায়টা মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। পুরো বইটা প্রথম পুরুষেই লেখা, রীতিমতো একটা প্রতিশোধমূলক কাহিনী, একজন যুবক যে কিনা বন্ধুদের কারনেই হারিয়েছে সবকিছু সে কিভাবে প্রতিশোধ নেয় তার বিস্তারিত বিবরন। বিবরনগুলো পড়তে পড়তে বেশ কিছু তথ্য তিনি নোট করে নিলেন। হাতের কাছে এই বইটা গত কয়েকদিন ধরেই পড়েছিল, যে সমাধানের জন্য তিনি হন্যে হয়ে আছেন, সে সমাধান ছিল তার হাতের কাছেই। এই বইটা পড়েই বুঝতে পেরেছেন ঠিক কোন জায়গায় কাজ করতে হবে।

বইটা আবার হাতে নিলেন। ফুলকলি প্রকাশনী থেকে বের হয়েছিল, বছর দুই আগে। লেখকের নামের জায়গায় ছোট্ট করে শুরু 'অরি' শব্দটা লেখা, এতো সংক্ষিপ্ত কারো নাম হয় নাকি? আর এই নামের অর্থটাই কি? সাতসকালে কাউকে বিরক্ত করতে ভালো না লাগলে মোবাইল ফোনটা হাতে তুলে নিলেন।

ডায়াল করলেন।

"গুড মর্নিং, মোফাজ্জল সাহেব," বললেন তিনি, কণ্ঠে যতোটা সম্ভব উৎফুল্লভাব ফুটিয়ে তুললেন, "কেমন আছেন?"

"ভাই, এতো সকালে ফোন!" ওপাশ থেকে ঘুমজড়িত কণ্ঠ শুনতে পেলেন।

"আপনি একটা বই বের করেছিলেন "রক্তনীল সুখ" নামে, লেখকের নাম "অরি", এই লেখকের ডিটেইলস দরকার।"

"এই লেখকের ডিটেইলস নাই।"

"ডিটেইলস নাই মানে? বই বের করে ফেললেন আর কোন ইনফরমেশন নাই। এর মানে কি?"

"এর মানে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন," ওপাশ থেকে মোফাজ্জল হোসেন বলল, বোঝা যাচ্ছে সে এখন পরিপূর্ন সজাগ, এই মুহূর্তে কোন বেফাঁস কথা বলে

বিপদে পড়তে চায় না।

"সাতসকালে ফাজলামি করবেন না, মেজাজ খারাপ আছে।"

"ফাইজলামি তো আপনেই করছেন, এতো সকালে কেউ ফোন দেয়?" ওপাশ থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলল মোফাজ্জল হোসেন, "লেখক যদি পাগল-ছাগল হয়, নাম-পরিচয় ঠিকানা না দেয়, কিন্তু ভালো লেখে, তাইলে আমি কি করবো। আমার কাজ প্রকাশ করা, আমি তাই করছি।"

"বই বিক্রি হয়েছে কেমন?"

"খুবই ভালো।"

"লেখক স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে কিভাবে? আর টাকা-পয়সার হিসাব?"

"লেখা পাঠাইছে কুরিয়ারে, আর শর্ত ছিল লেখকের অংশের টাকা অনাথ আশ্রমে দেয়ার জন্য। আমি তাই করছি।"

"আপনে দেখি কোন লেখককেই চেনেন না, অদ্ভুত না?"

"অদ্ভুত হইলেও করার কিছু নাই।"

ফোনের লাইন কেটে দিলেন তিনি।

একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে। খুনিকে পেয়ে গেছেন তিনি। এখন চমৎকার একটা প্ল্যান দরকার। হিসেব মতে একজন বাকি রয়ে গেছে, তাকেই চারা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তারপর সময়মতো জাল গুটিয়ে আনতে পারলেই হলো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। একজন একজন করে লোক আসা শুরু হয়েছে। আইজি সাহেবের সাথে মিটিং অল্পকিছুক্ষন পরেই, গত কয়েকদিন ধরেই মনের মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল তা কেটে গেছে হঠাৎ করেই। এখন তিনি জানেন কী করতে হবে, কিভাবে করতে হবে।

অধ্যায় ৪৭

শাহরিয়ার অফিসে পৌছাল সময়মতো, গতকয়েকদিন একটানা কাজ করে কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে তার অফিস সাধারন অফিসের মতো নয়, এখানে কাজে-কর্মের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, প্রয়োজনে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে হতে পারে।

চা খেতে খেতে কনফারেন্স রুমে ডাক পড়ল, বাকি সবাই এরমধ্যেই চলে গেছে, চা শেষ না করেই নোটবুকটা নিয়ে কনফারেন্স রুমের দিকে এগুল শাহরিয়ার। আজকে সকালে মিটিং আছে আবু জামশেদের, তার আগে এটাই হয়তো নিজেদের মধ্যে ফাইনাল মিটিং।

আবু জামশেদ আজ অন্যান্য দিনের মতো গম্ভির নন। এভিডেন্স কালেকশন টিমের লোকজন একপাশে বসেছে, অন্য পাশে তানভীরের পাশে বসল শাহরিয়ার। সামনে বেশ কয়েকটা সাদা বোর্ড, একটা বোর্ডে প্রজেকটর মেশিন থেকে একটা স্টিল ছবি বোর্ডে ভেসে আছে। শাহরিয়ারকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন আবু জামশেদ।

"তাহলে শুরু করা যাক," বললেন তিনি। প্রজেশকনে একের পর এক খুনের ছবিগুলো ভেসে উঠল। রক্তাক্ত একেকটা ছবি। আজমল চৌধুরি, ইফতেখার আহমেদ রুবেল, মশিউর রহমান আর লেখক আরিফুল হকের পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া কংকালসার দেহ।

"এই ছবিগুলো থেকে কোন সমাধানে আসা সম্ভব নয়," বললেন আবু জামশেদ, "তবে একটা জায়গায় এদের মিল প্রচন্ড, প্রথম তিনজনের খুনের ধরনে সাদৃশ্য, এদের সবারই দুই পায়ের পাতা ধারাল কিছু দিয়ে আলাদা করেছে খুনি। আর লেখক আরিফুল হকের এই ছবিটায় পায়ে তেমন কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ছে না। তার মানে কি এই তিনজনের খুনি একজনই? আর লেখকের মৃত্যু শুধুই একটা দূর্ঘটনা? আমার তা মনে হয় না।"

"আজমল চৌধুরি, রুবেল সাহেব আর মশিউর, এই তিনজনই একই স্কুলের ছাত্র, একই এলাকায় এক সময় বেড়ে উঠেছে, সব ধরনের বদমায়েশিতে এদের জুড়ি মেলা ভার ছিল একসময়, এদের আরেকজন সঙ্গি ছিল," একটু থামলেন তিনি, বোর্ডে তুষার আহমেদের স্টিল ছবি ভেসে উঠল, "এই গ্রুপটার নাম ছিল ফোরস্টার গ্রুপ। ফোরস্টারের চতুর্থ সদস্য জনাব তুষার আহমেদ। সব বন্ধুত্বের মাঝেই এমন একটা সময় আসে যখন প্রয়োজনের তাগিদে প্রিয় বন্ধুরাও দূরে সরে যায়। এই চারজনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। যাই হোক, সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে এই চারজনের মধ্যে তিনজন এরমধ্যেই মারা গেছে, বেঁচে আছে কেবল তুষার

আহমেদ। ওর সাথে আমি দেখা করেছি, কথা বলেছি, চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি বেচারা কেমন যেন মনমরা কিংবা খুব বেশি টেনশনে আছে," থামলেন তিনি, শাহরিয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালেন, "তুমি বলো তো এই চারজনের সাথে লেখক আরিফুল হকের মিল কোথায়?"

এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই শাহরিয়ারের।

"আমিই বলছি, তুষার আহমেদ আর লেখক আরিফুল হক একই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছিলেন এবং যতোটুকু বুঝেছি তুষার আহমেদের বোনের সাথে কোন এক সময় লেখকের বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল এবং বাকি তিনজনের সাথে লেখক আরিফুল হকের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না।"

তানভীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত ইশারায় থামিয়ে দিলেন আবু জামশেদ।

"সাইফুল, এবার গতরাতে যে লাশ পেয়েছো, বলো, তোমার ফাইন্ডিংসগুলো এক এক করে।"

সাইফুল প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ করে তাকে প্রশ্ন করবে বুঝতে পারেনি।

"স্যার, আনআইডেন্টিফাইড বডি, চেহারা সনাক্ত করা যায়নি," বেশ কিছু ছবি এগিয়ে দিল আবু জামশেদের দিকে, "ঘটনাস্থলে কিছু পাই নি আমরা, লাশটা ছাড়া, জিন্সের প্যান্ট পরা ছিল, আর টি-শার্ট, বয়স ত্রিশের উপর, মাথার চুল ঘন, মুখের আকৃতি গোলগাল, লোকটাকে গলা টিপে মারা হয়েছে, একটা ইট দিয়ে মুখটা থেতলে দেয়া হয়েছে, বৃষ্টি ছিল, আমরা পায়ের ছাপ কিংবা আঙুলের ছাপও পাইনি। লাশ পোস্টমর্টেমে আছে। থানায় একটা হত্যা মামলা করা হয়েছে।"

"আর কিছু?"

"ঘটনাস্থল থেকে আরিফুল হকের বাড়ি খুব কাছে, আর যতোটুকু মনে হয়, দুটো ঘটনা একই সময়ের।"

"একই সময়ের মানে?"

"লাশ দেখে বোঝা যায়, অন্তত চারদিন আগে মারা গেছে লোকটা, মানে যেদিন রাতে আরিফুল হকের বাসা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল সেদিন। লাশটা এমন জায়গায় পড়েছিল, ঝোপের আড়ালে, কারো চোখে পড়ে নি, গতকাল সন্ধ্যায় ঐ ঝোপের পাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন যাচ্ছিল, একজন টয়লেট করতে দাঁড়ালে তার চোখে পড়ে লাশটা।"

"আচ্ছা, আর কিছু?"

"না, স্যার।"

"আমি একটা উত্তর খুঁজে বের করেছি এই সব ঘটনার, কিভাবে উত্তরটা পেয়েছি সেটা আমি পরে বলবো," আবু জামশেদ বললেন, "এই খুনগুলো একজন মানুষই করেছে, তার নাম লেখক আরিফুল হক!"

"কিন্তু উনার লাশ তো আমরা এরমধ্যেই দাফন করে ফেলেছি," তানভীর বলল, "আজিমপুর গোরস্তানে!"

"আরিফুল হকের সাথে গত নয়-দশ বছরে কারো সাথে দেখা হয়েছে বলে শুনি নি, আমি উনার চাচাতো ভাই-বোনের সাথে কথা বলেছি। ওর আপন ছোট বোনের বিয়ে গেছে, বিদেশে থাকে, আমি খবর নিয়েছি, ভাইয়ের সাথে তারও কোন যোগাযোগ ছিল না।"

"কিন্তু..."

"যে প্রকাশনিতে তার বই ছাপা হতো সে ভদ্রলোকও তাকে একবার হয়তো দেখেছিল, সেটাও অনেকদিন আগে।"

"তাহলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া লাশটা কার?" প্রশ্ন করলো তানভীর।

"সম্ভবত তার সহকারির, তাহের নাম ছিল যার।"

"গতকাল রাতে যে লাশটা পাওয়া গেল, সেটা?"

শাহরিয়ার তাকাল তানভীরের দিকে, একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে মানুষটা, তবে আবু জামশেদকে মোটেই বিব্রত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তিনি বেশ উপভোগ করছেন এই প্রশ্নোত্তর পব।

"আমাদের তদন্তকে অন্যদিকে চালানোর একটা চেষ্টা হতে পারে," আবু জামশেদ বললেন, "এমনও হতে পারে, সাধারন একজন পথচারিকে মেরে ফেলেছে, যাতে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই।"

"এতো পুরো সাইকোপ্যাথের মতো কাজকারবার," তানভীর বলল, বোঝাই যাচ্ছে, আবু জামশেদের কথাবার্তায় সে মোটেও সন্তুষ্ট না।

"কিন্তু এতোসব করার পেছনের মোটিভ কি?" শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করল এবার।

আবু জামশেদ শাহরিয়ারের কাঁধে হাত রাখলেন।

"ধরো, তুমি কাউকে খুন করো নি, অথচ ঘটনাক্রমে তুমি সেই খুনের ভাগিদার হয়ে গেলে, কেমন লাগবে?"

উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছেন দেখে মাথা নাড়াল শাহরিয়ার, "ভালো না।"

"ধরো, তানভীর তোমার খুবই প্রিয় বন্ধু, হঠাৎ করে জানলে সে তোমাকে রীতিমতো ঘৃনা করে, তোমার সাফল্যে সে বিরক্ত এবং তুমি সরে গেলে তার খুব দ্রুত প্রমোশন হবে, তাহলে তানভীরের প্রতি তোমার মনোভাব কেমন হবে?"

"খুবই খারাপ।"

"ধরো তুমি খুব বিপদে পড়েছো, কিছু লোক তোমাকে মারছে, সেই সময় তোমার প্রিয় বন্ধু, তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে উল্টো তাদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে কেমন লাগবে?"

"খারাপ লাগবে।"

"কতোটা খারাপ?" আবু জামশেদ বললেন, "আচ্ছা ধরো, তোমার বন্ধুর কারনেই তোমার জীবনটাই পুরো এলোমেলো হয়ে গেল, একমাত্র পছন্দের মানুষকেও হারাতে হলো, সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলে, তাতে তোমার কেমন লাগবে?"

"খুবই খারাপ।"

"প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করবে না?"

"সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবো," শাহরিয়ার বলল, "কিন্তু একজন পঙ্গু মানুষের জন্য সে সুযোগ আসা কঠিন।"

"ধরো, সে যদি সত্যি সত্যি পঙ্গু না হয় কিংবা একটা সময় পরে তার হাঁটাচলার ক্ষমতা ফিরে আসে?"

"তাহলে তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না," শাহরিয়ার বলল।

"ঠিক সেটাই হয়েছে," আবু জামশেদ বললেন, "আরিফুল হক কোন না কোনভাবে তার হাঁটাচলার সামর্থ্য ফিরে পেয়েছিল, তারপর এক এক করে তার শত্রুদের সরিয়ে দিয়েছে। এখন বাকি আছে একজন।"

"তাহলে তো তুষার আহমেদের উপর যে কোন সময় হামলা হতে পারে?" তানভীর বলল।

"হতে পারে," আবু জামশেদ বললেন, "আর সেটাই খুনিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলার একমাত্র উপায়।"

"মানে, তুষার আহমেদকে ব্যবহার করে খুনিকে ধরতে হবে?"

"রাইট," আবু জামশেদ বললেন, "যতোটুকু বুঝতে পারছি, তুষার আহমেদ প্রানের ভয়ে যে কোন সময় দেশ ছাড়বে। এই সময়টা আমরা ওকে চোখে চোখে রাখবো।"

"স্যার, ভদ্রলোক যদি চলে যেতে পারেন দেশ ছেড়ে, তাহলে কী এই খুনিকে ধরা যাবে না?" প্রশ্ন করলো তানভীর।

"যেহেতু আমরা জানি, খুনি কে," আবু জামশেদ বললেন, "তাকে খুঁজে বের করা যাবে। তবে আপাতত এটাই সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি।"

"কিংবা আমরা নিজেরাই তুষার আহমেদকে প্রস্তাব দিতে পারি," শাহরিয়ার বলল, "উনি যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা তার বন্ধুদের খুনিকে ধরতে পারবো। উনি নিশ্চয়ই মানা করবেন না।"

"উনি মানা করবেন না আমি জানি," আবু জামশেদ বললেন, "তবে তাতে খুনিও কিছু না কিছু টের পেয়ে যেতে পারে। উনার অজান্তেই আমরা তাকে ঘিরে রাখবো, তার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের নজরদারি থাকবে।"

"স্যার, এই কেসগুলোর সমাধানের দিকে এগুচ্ছি তাহলে আমরা," তানভীর বলল।

"হু," বললেন আবু জামশেদ, তাকে হঠাৎ করেই চিন্তিত দেখাল, "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। তানভীর আর শাহরিয়ার, তোমরা দুজনেই বেরিয়ে যাও, তুষার আহমেদকে চোখে চোখে রাখার দায়িত্ব তোমাদের, কোন উল্টাপাল্টা কিছু দেখলেই আমাকে জানাবে। আমি এখন মিটিংয়ে যাচ্ছি।"

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন আবু জামশেদ, বাকিরাও বেরিয়ে এলো এক এক করে।

সকাল মাত্র দশটা বাজে।

"আমার সাথে চলেন," শাহরিয়ারকে বলল তানভীর, "মোটরসাইকেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।"

আপত্তি নেই শাহরিয়ারের, কিছুক্ষনের মধ্যেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল দুজন।

একটু পরে নিজের গাড়ি নিয়ে বের হলেন আবু জামশেদ। একটু আগের ফুরফুরে ভাবটা নেই চেহারায়, জানেন আইজি সাহেবের কাছে একগাদা ব্যাখ্যা দিতে হবে। মনে মনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন তিনি। নিজেকে আরেকবার প্রমানের সময় এসেছে।

অধ্যায় ৪৮

বাসা থেকে বের হয়ে প্রথমে অচেনা নাম্বার থেকে আসা কলটা রিসিভ করলো তুষার। সন্দেহ হচ্ছিল, এবার তাকে শেষবারের মতো হুমকি দেয়ার জন্য ফোন করেছে লোকটা। এক এক করে চারজন বন্ধুকে হারিয়েছে সে, এবার তার পালা। বারবার মনে হচ্ছিল, কেউ একজন অনুসরন করছে তাকে, আশপাশে দ্রুত কয়েকবার তাকিয়ে নিল। সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না।

অচেনা নাম্বার থেকে কল করেছিল ট্রাভেল এজেন্সির লোক, রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছে সে বাংলাদেশে, সেই তারিখ এখনো দশ দিন পর, এতোদিন ঢাকায় থাকার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব না। ট্রাভেল এজেন্সিকে অনুরোধ করেছিল আগামি দু'একদিনের মধ্যে কোন ফ্লাইট পাওয়া সম্ভব কি না। ভদ্রলোক জানালো সম্ভব, আগামি পরশু সকালে একটা ফ্লাইট আছে, তবে সেক্ষেত্রে বাড়তি কিছু টাকা দিতে হবে, তুষার রাজি কি না। সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ড দেরি করে নি, সাথে সাথে হ্যা বলে দিয়েছে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঢাকায় একেকটা মুহূর্ত থাকা মানে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যাওয়া।

গতকালই দেখা হয়েছিল মশিউরের সাথে, সেই মশিউর এখন নেই, পত্রিকার পাতায় খুব দায়সারাভাবে খবরটা ছাপা হয়েছে, একদম শেষ পাতায়, ছোট করে, শুধু বলা হয়েছে, পুলিশের বিশেষ টিম কাজ করছে, তদন্তের স্বার্থে এখনো কিছু জানান যাচ্ছে না। প্রান বাঁচানোর জন্য সাবধান হয়েছিল মশিউর, তবে তাতেও কাজ হয়নি। খুনি ঠিকই জেনে গেছে মশিউর বাসায় লুকিয়ে আছে, তারপর খুন করে পালিয়ে গেছে।

পুলিশে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তা নয়, এসব ব্যাপারে কাউকে ফোন দেয়াটা অস্বস্তিকর। কী না কি ভেবে বসে কে জানে। তবে এখন পানি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, অস্বস্তি লাগলেও এই কেসগুলো নিয়ে কী হচ্ছে জানতে পারলে খুব ভালো হতো। ছোট মামাই আছেন পুলিশে, বেশ বড় পোস্টে। তার নাম্বারটা সেভ করা আছে মোবাইলে, তবে সমস্যা হচ্ছে প্রথম দিন বাকি সবার সাথে সাথে ছোট মামার সাথেও দেখা হয়েছে, তবে খুব বেশি কথা হয়নি। উনি বারবার দাওয়াত দিয়েছেন বাসায় যাওয়ার জন্য, অথচ ঝামেলার কারনে যাওয়া হয়নি। উনি নিশ্চয়ই মাইন্ড করে আছেন।

নাম্বারটায় ডায়াল করল তুষার।

"হ্যালো, মামা আমি তুষার বলছি," তুষার বলল, ওপাশ থেকে ঝাড়ি খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল মনে মনে।

"বল, খবর কি?" ওপাশ থেকে বাজখাই গলায় বললেন ছোট মামা। উনার পুরো নাম মোখলেছুর রহমান। উনার পদবি সম্পর্কে ধারনা নেই, তবে যতোটুকু শুনেছে অনেক উঁচু পোস্টেই আছেন।

"ভালো, আপনার কাছ থেকে একটা বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম," তুষার বলল।

"তার আগে বল, তুই বাসায় এলি না কেন?"

"আসবো, একটু ফ্রি হলেই আসবো।"

"ঢাকায় তোর কী কাজ? হু?"

"দেখা হলে বলবো, মামা।"

"বল, কি জন্য ফোন করেছিস?"

"গতকাল মশিউর রহমান নামে একজন মারা গেছে, বাসায়, সকালে খবরের কাগজে দেখলাম। ও আমার বন্ধু ছিল।"

"তাই! ও তো নেশাখোর, ড্রাগ ব্যবসা করতো," ওপাশ থেকে বললেন মোখলেছুর রহমান, "দু'একবার তো জেলও খেটেছে। তোর সাথে ওর পরিচয় কিভাবে?"

"মামা, ওকে আপনি পার্সোনালি চেনেন, আমার স্কুল ফ্রেন্ড ছিল। আমাদের বাসায় খুব যাতায়াত ছিল, লম্বা করে।"

"না, তো, মনে পড়ছে না।"

"আরে, আমাদের একটা গ্রুপ ছিল না? আজমল, রুবেল, আমি আর মশিউর। ও ভালো ক্রিকেট খেলতো।"

"বলিস কি? এখন পরিস্কার মনে পড়ছে, এই ছেলেই নেশাখোর হয়ে গেল? অদ্ভুত!"

"জি। ওর খুন কিভাবে হলো কিংবা খুনি কে কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?"

"ড্রাগস ব্যবসা যারা করে তারা নিজেরা নিজেরাই মারামারি করে মরে," মোখলেছুর রহমান বললেন, "তবে এই কেসটা আমি দেখেছি, আমার থানার আন্ডারেই পড়ে তো। একটা ব্যাপারে শুধু অবাক হয়েছি।"

"কী ব্যাপার মামা?"

"এরকম নৃশংসতা আগে চোখে পড়েনি।"

"আচ্ছা," বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল তুষারের, মৃত্যুর সময় মশিউরের মায়াকাড়া মুখটা কেমন হয়েছিল ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল।

"দুটো পায়ের গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা চাপাতি দিয়ে কেটে আলাদা করে সেগুলো আবার লাশের সাথে রেখে গেছে খুনি। চিন্তা করতে পারিস? কী নৃশংস!"

"ওহ!"

"কেন জানি মনে হচ্ছিল, এটা ড্রাগস ব্যবসা রিলেটেড খুন না। এর পেছনে অন্য

কোন কারন আছে। কারন ড্রাগস সিন্ডিকেটের ওরা খুন-খারাপি করলে একটা-দুটো বুলেটেই কাজ সারে। ঘটা করে পায়ের পাতা কেটে সেগুলো আবার পাশে রেখে যাওয়ার মানে নিশ্চয়ই অন্য কিছু।"

"অন্য কিছু কেমন?"

"জানি না। এই কেসগুলো এখন হোমিসাইডের আন্ডারে, ওরাই দেখছে," মোখলেছুর রহমান বললেন, "আমি আরো নানান ঝামেলায় আছি।"

"আচ্ছা, মামা রাখি," তুষার বলল, "অনেক বিরক্ত করলাম।"

"বিরক্তের কিছু নেই, বৌকে নিয়ে বাসায় আসিস কিন্তু।"

"আচ্ছা," বলে ফোন রেখে দিল তুষার।

ছোট মামার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যটা চমকে দিয়েছে তুষারকে। এই তথ্যটা পত্রিকায় আসে নি, হয়তো খবরটাকে গোপন করে রাখা হয়েছে বিশেষ কোন কারনে। ছোটমামা বলে ফেলেছেন, তেমন আগপিছু চিন্তা না করেই।

এই তথ্যটার আলাদা একটা গুরুত্ব আছে, যেটা ছোটমামা ধরতে পেরেছেন, সাধারন ড্রাগ ব্যবসা নিয়ে ঝামেলায় এরকম পায়ের পাতা আলাদা করার ব্যাপার থাকার কথা না। এটা একটা ম্যাসেজ। বিশেষ একটা সংকেত। হয়তো বাকি তিনজনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। যেটা খবরের কাগজে আসেনি।

তার মানে একটাই। কেউ একজন বিশেষ একটা সংকেত দিচ্ছে, শরীরের অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু গোড়ালির নীচ থেকে পায়ের পাতা আলাদা করার নিশ্চয়ই কোন কারন আছে।

একটা সিগারেট ধরাল তুষার। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল সাথে সাথে। ছোট মামা কল করেছেন, রিসিভ করলো।

"তুই কোন ঝামেলায় পড়িস নি তো, তুষার?" ওপাশ থেকে বললেন মোখলেছুর রহমান।

"না, মামা, ঝামেলা কিসের?"

"ফোন রাখার সাথে সাথেই মনে পড়ল। তোর দুই স্কুলের বন্ধু, আজমল আর রুবেল, ওরাও তো খুন হয়েছে এবং খুনি এখনো ধরা পড়েনি।"

"জানি," তুষার বলল, "আমার ঝামেলার কী আছে? আমি চৌদ্দ বছর পর দেশে ফিরেছি। কারো সাথে কোন লেনদেন নেই আমার।"

"কোন ঝামেলায় পড়লে আমাকে জানাবি, ওকে?"

"জি, মামা।"

"আচ্ছা, রাখছি।"

মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে সামনে রাস্তার দিকে তাকাল তুষার। সকাল সাড়ে দশটা বাজে। দীর্ঘদিন ঢাকার রাস্তায় হাঁটা হয় না, আজ এলোমেলোভাবে একটু

হাঁটা যায়। যদি মরতেই হয়, তবে মরে যাওয়ার আগে শেষ সময়টা উপভোগ করে নেয়াই ভালো।

শিষ দিতে দিতে হাঁটছিল তুষার, দীর্ঘদিন পর সেই স্কুল ড্রেস পরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আশপাশের লোকজন অন্য দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে, মোটামুটি মাঝবয়েসি একজন মানুষ শিষ দিতে দিতে হাঁটলে ঢাকার লোকজন তাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে করে, এই মুহূর্তেই কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না তুষারের। মরার আগে একটু পাগলামি করার অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে!

অধ্যায় ৪৯

রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন, এরমধ্যে কাউকে অনুসরন করা খুব কঠিন কাজ না হলেও কাজটা সাবধানে করতে হচ্ছে। এর আগে তুষারের সাথে দেখা হয়েছে শাহরিয়ারের, কাজেই ভদ্রলোক তাকে চিনে ফেলতে পারে। যতোটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে শাহরিয়ার, সানগ্লাস পড়ে নিয়েছে, মাথায় পরেছে একটা মাঙ্কি ক্যাপ, এছাড়া এর আগে দেখা হয়েছিল বাসায়, দিনে-দুপুরে এই অবস্থায় তাকে সহজে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না, তারপরও ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে নেই।

তানভীর ভালো চালায় মোটরবাইক, খুব অল্প সময়েই চলে এসেছে দুজন ধানমন্ডির বাড়িটার সামনে। আরেকটু দেরি হলেই তুষারকে হয়তো পাওয়া যেতো না। সেদিক দিয়ে ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, একটু আগেই গেট দিয়ে বের হয়েছে তুষার, ফোনে কথা বলেছে, এখন হাঁটছে উদ্দেশ্যহীনের মতো। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব রেখে অনুসরন করছে তানভীর আর শাহরিয়ার। তানভীরকে যতোটা বোকা-সোকা মনে হয়েছিল, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তার উল্টো। আবু জামশেদ এমনি এমনি এই মানুষটাকে ডিপার্টমেন্টে নেননি।

সকালের মিটিং থেকে একটা ব্যাপার জানা গেছে শুধু, যদিও এখন পর্যন্ত তা একটা ধারনা মাত্র, তা হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে ঘটে যাওয়া খুনগুলোর পেছনে দায়ি একমাত্র লেখক আরিফুল হক, যদিও এরমধ্যে লোকটার লাশ দাফন হয়ে গেছে, তারপরও এই লোকটাই কিভাবে প্রধান সন্দেহভাজন হয় মাথায় ঢুকছে না শাহরিয়ারের, আবু জামশেদ এমন কিছু জানেন, যা বাকি কাউকে বলেন নি, সেটা নিশ্চয়ই তদন্তের স্বার্থেই করেছেন। এমনিতে গুরুগম্ভির, রগচটা ধরনের মানুষ হলেও আবু জামশেদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত খারাপ আচরন পায় নি সে, লোকটার ধরনও সম্ভবত এরকম।

মোটরবাইক দ্রুত চালানো যতোটা সহজ, ধীরে চালানো ঠিক ততোটাই কঠিন, নিজে মাঝে মাঝে মোটরবাইক চালিয়েছে বলে ধারনা আছে শাহরিয়ারের, রাস্তায় একের পর এক ট্রাফিক জ্যাম, উদ্দেশ্যহীন একজন মানুষকে পেছন থেকে অনুসরন করা এই পরিস্থিতিতে সত্যিই দুষ্কর।

"শাহরিয়ার ভাই, আমার মনে হয় লোকটারে ধইরা নিয়া যাওয়া দরকার, কয়েকটা লাঠির বাড়ি খাইলেই ঠিক হইয়া যাইবো।"

"কোন ধরনের আইনি নির্দেশ ছাড়া একজন লোককে কিভাবে আপনি ধরে নিয়ে যাবেন?"

চলন্ত মোটরবাইকে বসে কথাবার্তা বলা কঠিন, যতোটা সম্ভবত গলা চড়াল

শাহরিয়ার, "এতে উল্টো আমরা ঝামেলায় পড়ে যাবো।"

"কাজ করতে গেলে একটু রিস্ক তো নিতেই হইবো, নাকি?" তানভীর বলল, "নো রিস্ক, নো গেইন।"

"বাদ দেন এসব আলাপ, সামনে দেখেন," বলল শাহরিয়ার।

তুষার শিস দিতে দিতে হাঁটছে, খুব পরিচিত একটা গানের সুর তুলছে, কিশোর কুমারের একটা গান, এতো জোরে শিস দিচ্ছে যে বেশ অনেকদূর থেকেও পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। বেশ অবাক হয়েছে শাহরিয়ার, তানভীরও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে। এরকম হওয়ার কথা না, হোমিসাইডে এমন আইডিয়াও এসেছে যে এই খুনগুলোর নেপথ্য কারিগর এই তুষার আহমেদও হতে পারে, দীর্ঘদিন পর সে দেশে ফিরে আসার পরপরই তার খুব ঘনিষ্ট বন্ধুরা মারা যাচ্ছে। একজন খুনি কিংবা যে কি না যে কোন সময় মারা যেতে পারে, তার এরকম উদ্দেশ্যহীন আচরন যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।

তুষারকে দৃষ্টি সীমায় রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই লোকজনের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তেই উদয় হচ্ছে অন্য কোন খানে।

মোবাইল ফোন বেজে উঠেছে শাহরিয়ারের। আবু জামশেদের নাম্বারটা স্ক্রিনে ভাসছে।

"হ্যালো, শাহরিয়ার, তুমি কোথায়?"

"ধানমন্ডিতে, তুষার আহমেদকে ফলো করছি।"

"গুড, আমি মিটিং থেকে বের হলাম মাত্র..."

"কী বললেন উনি, মানে আইজি স্যার?"

"আমাকে চব্বিশ ঘন্টার সময় দিয়েছে," ওপাশ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে আবু জামশেদ বললেন, "তারপর সবগুলো কেস পুলিশের হাতে চলে যাবে।"

"আচ্ছা।"

"তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছো?" ওপাশ থেকে প্রশ্ন করলেন আবু জামশেদ, "এই কেসের উপর নির্ভর করছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থাকবে কি থাকবে না।"

"আমরা তো প্রানপন চেষ্টা করছি।"

"সেটা আমি জানি, ওরাও জানে," আবু জামশেদ বললেন, "কিন্তু রেজাল্ট ছাড়া সব অর্থহীন।"

"জি।"

"আইজি সাহেবের কাছ থেকে চব্বিশ ঘন্টার সময় চেয়ে নিয়েছি, এরমধ্যে যা করার করতে হবে।"

"স্যার, আপনি শিউর, তুষার আহমেদের উপর হামলা আসবে?" শাহরিয়ার

বলল, যথেষ্ট সাহস জোগাড় করতে হলো এই কথাগুলো বলতে গিয়ে।

"আসার কথা," আবু জামশেদ বললেন, "আমার ধারনা ঠিক হলে যে কোন সময় তুষার আহমেদের উপর হামলা হবে।"

"আমরা কি তুষার আহমেদকে সেফ কাস্টডিতে নিতে পারি না," শাহরিয়ার বলল, "তারপর উনাকে নিরাপদে দেশ ছাড়তে সাহায্য করলাম।"

"তুষার সেফ কাস্টডির জন্য আবেদন করে নি," আবু জামশেদ বললেন, তাকে কিছুটা বিরক্ত মনে হলো, "এই লোকটাকে আমাদের দরকার, খুনিকে ধরার জন্য। ক্লিয়ার?"

"তার মানে আমরা উনাকে ব্যবহার করছি," শাহরিয়ার বলল।

"হ্যা, ব্যবহার করছি, তোমার কোন সমস্যা?"

"না," একটু থেমে বলল শাহরিয়ার, "আমার কোন সমস্যা নেই।"

"গুড, এখন ওকে ফলো করো, আমাকে জানাবে উল্টাপাল্টা কিছু দেখলে, ওকে?"

"ওকে, স্যার।"

মোবাইল ফোনটা কোনমতে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল শাহরিয়ার, মোটরবাইকের গতি এখনো ধীর, চারপাশে তাকাল, তুষারকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না, ফোনে কথা বলার কারনে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়েছিল সে কিছুক্ষনের জন্য।

"ভাই, বিপদ," মোটরবাইক থামাল তানভীর হঠাৎ করে।

"কি হলো? কিসের বিপদ?"

"সামনে দেখেন।"

সামনে তাকাল শাহরিয়ার, লোকজন আর গাড়িঘোড়ার ভিড় ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না।

"সামনে কি? কিছুই তো নেই।"

"সেটাই তো, কিছুই নাই।"

"মানে?"

"ঐ লোক টের পাইছে সম্ভবত, গা ঢাকা দিছে," তানভীর বলল।

"তাহলে?"

"এতো লোকের মাঝখানে কোথায় খুঁজবো?"

রাস্তার একপাশে মোটরবাইকটা পার্ক করল তানভীর। বিরক্তিতে থু থু ফেলল শাহরিয়ার। আবু জামশেদ বলেছেন চোখের আড়াল না করতে, অথচ ঘন্টাখানেক অনুসরন করতে না করতেই তুষার আহমেদ নেই। তারমানে লোকটা টের পেয়ে গেছে।

"এখন কী করা উচিত?" শাহরিয়ার বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

লোকটা টের পেল কি করে?"

"জানি না, ঐ লোকের পেছনেও মনে হয় দুইটা চোখ আছে," তানভীর বলল।

কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে শাহরিয়ার, এখন একটা কাজই করা যায়, সেটা হচ্ছে ধানমন্ডির বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এতো বড় একটা শহরে খুঁজে লাভ হবে না, তুষার বাসায় ফিরবেই। অবশ্য ততোক্ষনে যদি খারাপ কিছু না হয়ে যায় তো।

"তাহলে, চলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানে," শাহরিয়ার বলল।

"তাড়াহুরার কিছু নাই," তানভীর বলল, চায়ের দোকানে দুই কাপের চায়ের অর্ডার দিয়েছে সে ইতিমধ্যে, "চা খেয়ে যাই।"

তানভীরের দিকে তাকাল শাহরিয়ার, এর আগে যতোটা করিতকর্মা মনে হয়েছিল লোকটাকে, এখন তা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তানভীর ফাঁকি দিতে চাচ্ছে কাজে, যদিও ব্যাপারটা ওর স্বভাবের সাথে মেলে না। ঘড়ির দিকে তাকাল, আর পাঁচ মিনিট এখানে দাড়ালে খুব বেশি কিছু যাবে আসবে না। তবে আবু জামশেদ ফোন করলে কী উত্তর দেবে সেটা ভাবতে গিয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল, খুব সহজ একটা কাজও ঠিকমতো করতে পারে নি দুজন মানুষ মিলে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মোবাইল ফোনটা তুলল শাহরিয়ার, যাই ঘটুক না কেন, যতো অস্বস্তিকর হোক না কেন, তুষারকে অনুসরন করতে না পারার ব্যাপারটা আবু জামশেদকে জানাতে হবে।

* * *

আইজি সাহেবের সাথে মিটিং-টা খুব দীর্ঘ হয়নি, উনার অন্যান্য অনেক কাজের ভিড়ে কেসগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপডেট নিলেন এবং তারপর চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলেন, খুব ছোট করে একদম শেষে যে কথাটা বললেন, তাতে বোঝা গেল আবু জামশেদের উপর আত্মবিশ্বাস কমে গেছে উপর মহলের এবং এই কেসগুলোর সমাধানের উপর নির্ভর করছে ডিপার্টমেন্টের ভবিষ্যত। হয়তো এই ডিপার্টমেন্ট থাকবে, কিন্তু সেখানে আবু জামশেদ থাকবেন না, নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়া হতে পারে।

দায়িত্ব ছেড়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আবু জামশেদের, কিন্তু তিনি হার মানতে রাজি নন। একটু আগেই শাহরিয়ারের সাথে কথা হয়েছে, তুষার আহমেদকে চোখে চোখে রাখতে বলেছেন। তবে ওদের উপর পুরো ভরসা পাচ্ছেন না, এই কাজে তাকে নিজেই নামতে হবে মাঠে। গাড়ি অফিসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, এভিডেন্স কালেকশন টিমের সাথে আরো ঘন্টাখানেক বসতে হবে, গতকাল রাতে গাজীপুর থেকে যে লাশ

পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে আরো তথ্য দরকার, এছাড়া লেখক আরিফুল হকের লাশের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আবার দেখা দরকার, ফাইলটা টেবিলেই আছে।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এই সময়। শাহরিয়ারের ফোন।

"হ্যালো, শাহরিয়ার বলো," বললেন তিনি।

"স্যার, আমরা তুষার আহমেদকে হারিয়ে ফেলেছি," শাহরিয়ার বলল।

"ভেরি গুড, প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই দারুন দেখাচ্ছো!" বললেন তিনি, রাগে হাত-পা কাঁপছিল তার, "এক কাজ করো, বাসায় চলে যাও, রেস্ট নাও।"

"স্যার..."

"আমি একটা কথাও শুনতে চাই না," শান্ত গলায় বললেন তিনি, "যেখান থেকে পারো ওকে খুঁজে বের করো, এক্ষুনি।"

"জি, স্যার।"

ফোন কেটে দিলেন, মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার, একদম ঠান্ডা, সিটে হেলান দিয়ে বসলেন, চোখ বন্ধ করলেন, লক্ষ্য এখন একটাই, চব্বিশ ঘন্টার আগেই খুনিকে ধরতে হবে।

অধ্যায় ৫০

দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে কাউকে খুন করা সোজা কথা নয়, তার জন্য বুকের পাটা লাগে অথবা মানসিকভাবে অসুস্থ হতে হয়। এখন পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে খুনি মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ, নইলে মৃত মানুষের গোড়ালির নীচ থেকে পা আলাদা করার কোন মানে হয় না, একের পর এক হুমকি দেয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

শেষ হুমকিটার কথা মনে আছে তুষারের, পাপ স্বীকার করে নিতে বলা হয়েছে তাকে। দিনক্ষনের হিসেব জানে না তুষার, তবে এই কয়েকদিনেই একের পর এক মারা গেছে রুবেল, মশিউর আর আরিফ। এবার তার পালা, এমন কোন পাপ সে করে নি যার জন্য মরতে হবে, এরকম ছোটখাট পাপ সবারই থাকে, কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে সে কোন পাপ করেনি।

বাসা থেকে বের হয়ে অনেকক্ষন হেঁটেছে, উদ্দেশ্যহীনভাবে, তারপর হঠাৎ মনে হলো এই জীবনটা শুধু তার একার নয়, এখানে আরো অনেকের ভাগ আছে, অন্তত ক্রিস্টিনার সাথে কোন রকম অন্যায় করা ঠিক হবে না, মেয়েটা চিরজীবনের মতো একা হয়ে যাবে। অন্যান্য মেয়েদের মতো নয় ক্রিস্টিনা, যে সে মরে গেলে ছয়মাসের মধ্যে সঙ্গি বেছে নেবে, এ ব্যাপারে কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না, তবে ক্রিস্টিনার ব্যাপারে নিশ্চিত তুষার, তাই, অন্তত এই একজনের জন্যই তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

চোখ-কান খোলা না রেখে এই মুহূর্তে চলাফেরা করা আর মৃত্যুর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া একই কথা। রাস্তার পাশে একটা দোকানে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়াল তুষার, একটা সিগারেট কিনলো। তারপরই চোখে পড়ল ছেলেটাকে, চিনতে ভুল হয়নি। এই ছেলেটাই তার বাসায় গিয়েছিল একদিন, বলেছিল হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে, সেদিন বেশ ছিমছাম দেখালেও আজ কেমন রুক্ষ দেখাচ্ছিল, মাথার চুল এলোমেলো, শেভ না করায় মুখে কয়েকদিনের দাঁড়িগোঁফ, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এভাবে রাস্তায় এই ছেলেটার দেখা পাওয়া একটা ব্যাপারই বোঝায়, তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। সিগারেটটা কোনমতে ধরিয়ে হনহন করে হাঁটা শুরু করল তুষার। লোকজনের ভিড়, রিক্সা-সিএনজি, প্রাইভেট গাড়ির পাল্লাপাল্টি লড়াইয়ের মাঝে নিজেকে গায়েব করে দেয়া খুব কঠিন কাজ না হলেও, পেছন ফিরে না তাকিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

দিনে-দুপুরেও গলিটা অন্ধকার, দু-পাশের উঁচু বিল্ডিংগুলোর ছায়া পড়ে। তুষার হাঁটছে, পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। পুলিশ কি তাকে কোনরকম সন্দেহ করছে? সন্দেহ না করলে দূর থেকে ফলো করার মানে কি? নাকি তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার

করছে?

আপাতত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার উপায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দৌড়াতে শুরু করল তুষার। ঢাকার অলিগলি সব অচেনা এখন, এই গলি থেকে ধানমন্ডির বাড়িটা কতোদূর আন্দাজ করার চেষ্টা করল, পারল না, পাগলের মতো ছুটতে থাকল। পাশ দিয়ে যাওয়া কয়েকজন পথচারি অবাক চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে, বুঝতে চেষ্টা করছে সুবেশি একজন মানুষ এভাবে দৌড়াচ্ছে কেন।

তবে তাদের কল্পনার দৌড় খুব বেশি দূর পৌছানোর আগেই তারা আবার নিজ নিজ টেনশনে হারিয়ে গেল। একজন মানুষের পাগলের মতো দৌড়ানো নিয়ে খুব বেশিদূর চিন্তা করার সময় তাদের নেই।

* * *

অনেক দূর থেকে তুষার আহমেদকে অনুসরন করছে সে, দেখছে ভয় পেলে একজন মানুষ কিভাবে লেজ গুটিয়ে পালায়। খুব বেশি তাড়া নেই তার। ধীরে-সুস্থে কাজ করার মধ্যে কোন মজা নেই, ধুপধাপ কিছু করে ফেলার মধ্যেই আসল মজা। প্ল্যানিং আবার কী জিনিস!

বিশেষ করে কয়েকদিন আগে ঐ লোকটাকে না মারলেও পারতো। কিন্তু হাতের কাছে পেয়ে হাতটা এমন নিশপিশ করছিল যে পুরানো একটা শোধ তুলতে দেরি করেনি। সবকিছু প্ল্যানিং করে হয় না, সবকিছু প্ল্যানিং করে হলে ঠিক এরকম একটা জীবন তার প্রাপ্য ছিল না।

হাঁটতে থাকল সে, ধীর পায়ে, শিকারের দৌড় কতোদূর তার জানা।

অধ্যায় ৫১

অফিসে পৌছাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। গাড়িতে বেশ কিছুটা সময় চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল, অন্যান্য দিনের মতো একটু দেরিতে অফিসে পৌছালেও চলবে, আরেকটু ঘুমিয়ে নেয়া যাবে তাহলে, রাতে ভালো ঘুম না হওয়ার ফল। তবে নিজের রুমে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আবু জামশেদ, পিয়নকে বললেন সাইফুলকে যেন রুমে পাঠায়।

টেবিলের একপাশে লেখক আরিফুল হকের ফাইলটা ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সহ, ফাইলটা নেই। এই রুম থেকে ফাইল কোথাও যাওয়ার কথা নয়। থানায় কপি আছে, চাইলে কপি আনানো যায়। সাইফুল ঢুকল এইসময় রুমে।

"স্যার, ডেকেছিলেন?"

"হ্যা, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেয়েছো?"

"জি, স্যার। পেয়েছি। মাথায় আঘাতজনিত কারনে মৃত্যু। পেছন থেকে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।"

"আর কিছু?"

"স্যার, আসল কথাই তো বলতে ভুলে গেছি, এই লোকের পরিচয় পাওয়া গেছে।"

"তাই? এই লোক কে?"

"এর নাম আব্দুর রহমান, একসময় গাজীপুর কিশোর সংশোধানাগারে চাকরি করতো। পরে চাকরি চলে যায়। বেকার ছিল গত কয়েকবছর, নেশা করতো, ছিনতাইও করতো।"

"তথ্যগুলো পেলে কি করে?"

"গাজীপুর থানায় ওর নামে কিছু মামলা ছিল। এছাড়া দুদিন আগে ওর এক আত্মীয় থানায় রিপোর্ট করে, আব্দুর রহমান নিখোঁজ।"

"এই লোকই যে আব্দুর রহমান তা নিশ্চিত হচ্ছে কি করে পুলিশ?"

"আত্মীয়-স্বজনরা লাশ সনাক্ত করেছে, ওর হাঁটুর উপর একটা বড় জন্মদাগ আছে, ওটা দেখে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবু জামশেদ, যাক, অন্তত পরিচয় পাওয়া গেছে, নইলে হয়তো বেনামেই দাফন হয়ে যেতো। যদিও খুনি কিংবা খুনের মোটিভ জানা নেই। এই কেসটা নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করতে হতে পারে, যদিও ধারনা করছেন, কোন না কোনভাবে এই মৃত্যুর সাথে বাকি কেসগুলোর কোন না কোন যোগসূত্র আছে।

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

সাইফুল বেরিয়ে গেলে কম্পিউটারের মনিটরে মনোযোগ দিলেন। একের পর এক পুরানো ফাইল ঘাঁটছেন, ঠিক কী খুঁজছেন তিনি নিজেও জানেন না। অসহ্য একটা চাপা রাগ বুকের মধ্যে ফুঁসে উঠছে।

একজন মানুষ যে কিনা হুইল চেয়ারে চলাচল করতো সে কিভাবে এতোগুলো খুন করলো, তার মানে হুইল চেয়ারে বসে থাকাটা ছিল নিছক অভিনয়? এটা কিভাবে প্রমান করা যাবে? লেখক আরিফুল হকই যদি খুনি হয় তাহলে যে লাশটা আরিফুল হকের লাশ বলে কবর দেয়া হয়েছে সেটা কার লাশ?

সেই লাশ তুলে আরেকবার দেখা যেতে পারে, তাতে কোর্টের অর্ডার লাগবে, এখন সেই ঝামেলা করার সময় নেই। খুনিকে ধরতে পারলে এমনিই জানা যাবে লাশটা কার। সমস্যা হচ্ছে আরিফুল হকের শারীরিক অক্ষমতার ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। ঢাকায় কতো শতো হাসপাতাল, ক্লিনিক, এরমধ্যে কোথায় আরিফুল হক চিকিৎসা হয়েছিল সেটা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দশ বছরেরও বেশি আগের ফাইল হাসপাতালগুলোতে আছে কি না সেটাও চিন্তার বিষয়।

তবে সবকিছু ছাড়িয়ে একটা জিনিস মাথায় ঘুরছে, তুষার আহমেদ, এই খুনি যে-ই হোক, শেষ আঘাত করবে তুষার আহমেদের উপর। বইটা টেবিলের একপাশে পড়েছিল, তুলে নিলেন। সন্দেহ নেই বইয়ের 'তুর্য্য' চরিত্রটাই তুষারের চরিত্র, রাফি হচ্ছে রুবেল, হামিদ হচ্ছে মশিউর আর আজমত হচ্ছে আজমল চৌধুরি। সুমন হচ্ছে লেখক আরিফুল হক। চমৎকারভাবে বইটায় একের পর এক খুনের বিবরন দেয়া হয়েছে, যদিও সত্যিকার ঘটনাগুলোর সাথে সেগুলোর মিল নেই, কিন্তু বইয়ে "তুর্য্য" চরিত্রটার মৃত্যু হয়েছে একদম শেষ অধ্যায়ে। বাস্তবেও হয়তো সেরকম কিছুই হতে চলেছে যদি না তিনি সেটা থামাতে পারেন।

বইয়ের শেষ অধ্যায়টা পড়লেন আবার, প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হয় তুর্য্যকে। কপালের ঠিক মাঝবরাবর বুলেট ঢুকিয়ে দেয় খুনি, তারপর জনারন্যে মিশে যায়। বাস্তবেও কি এরকম কিছু করার প্ল্যান আছে খুনির?

অস্থির লাগছে, চেয়ারে স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না, একজন মানুষকে দিনে-দুপুরে অনুসরন করতে ব্যর্থ হয়েছে তার দুজন অফিসার, এদের উপর ভরসা করে লাভ নেই।

ফোন করে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন, ধানমন্ডি যেতে হবে, এখনি।

অধ্যায় ৫২

বাসার সামনে এসে থামল তুষার। একটানা দৌড়ে হাঁপিয়ে গেছে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে ধাতস্থ হওয়ার জন্য দাঁড়াল কিছুক্ষন, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিলো। পুরো শরীর ঘেমে একাকার, এই অবস্থায় বাসায় ঢুকলে একগাদা প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

তবে গেট দিয়ে ঢোকার আগেই জুনায়েদ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। মুখটা থমথমে, তুষারকে দেখে এগিয়ে এলো।

"ভাইয়া, টিকিট ক্যানসেল করে দিলাম," জুনায়েদ বলল, "সুমনার শরীর খারাপ, আর ভাবি'ও মনে হয় আপাতত যেতে চাচ্ছেন না।"

"আচ্ছা," বলল তুষার, "আমরা এখন প্রতিবছর একবার করে আসবো। কক্সবাজার পরেও যাওয়া যাবে।"

"আপনি হাঁপাচ্ছেন কেন?" জিজ্ঞেস করল জুনায়েদ, তুষারের ঘর্মাক্ত মুখ তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

"দৌড়ালাম কিছুক্ষন।"

"এইসময়ে!"

"দৌড়ানোর কোন সময় নেই," তুষার বলল, "তুমিও দৌড়াদৌড়ি শুরু করো। একবার তেল জমতে শুরু করলে কিন্তু কিছু করার থাকবে না।"

"সময়ই তো পাই না," জুনায়েদ বলল, "ঠিক আছে, আপনি থাকুন। আমি একটু ঘুরে আসি।"

জুনায়েদ হেঁটে চলে যাচ্ছে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তুষার। একটা ঝামেলা শেষ হয়েছে, কক্সবাজারে যাওয়া এই মুহূর্তে মোটেও সম্ভব না। এছাড়া আগামি পরশুদিনের রিটার্ট টিকিট কনফার্ম করা হয়েছে, এই খবরটা বাসায় দিতে হবে। কে কিভাবে নেবে জানে না, ওদের বলতে হবে ইউনিভার্সিটি থেকে তলব করে মেইল পাঠিয়েছে। না গেলে সমস্যা হতে পারে।

গেট এখনো খোলা, দারোয়ান চাচা তুষারকে দেখে এগিয়ে আসছে, কিছু একটা বলছে তুষারকে, তবে কথাগুলো শুনতে পেল না সে। পরপর দুটো বুলেটের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুষার। এভাবেই হয়তো মৃত্যু লেখা ছিল।

***

জুনায়েদকে কোনভাবে বোঝানো গেছে এতেই খুশি সুমনা, খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, শরীর খারাপ, লং জার্নি করলে আরো খারাপ হবে এটুকু বলতেই কক্সবাজারে যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করে দিল জুনায়েদ। ক্রিস্টিনার মুখেও হাসি ফিরে এসেছে, এই মুহূর্তে ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা সে চিন্তাই করতে পারছিল না। তবে সে হাসি বেশিক্ষন রইল না, পরপর দুটো বুলেটের শব্দ তাদের কানেও গেছে, এই মাত্র বাসা থেকে বের হয়েছে জুনায়েদ। খারাপ কিছুর আশংকায় দুজনেই ড্রইং রুম থেকে দৌড়ে বের হলো। এমনিতে বাসার গেটটা খুব কাছেই মনে হয়, তবে আজ এতোটুকু পথই অনেক দীর্ঘ লাগছিল সুমনার কাছে।

* * *

শাহরিয়ার মাঙ্কি ক্যাপ খুলে ফেলেছে, তুষার আহমেদের বাসার গেট থেকে অনেকদূরে দাঁড়ানো দুজন, এতোদূর থেকে দেখলেও চিনতে পারবে না নিশ্চিত। তানভীর কার সাথে যেন মোবাইল ফোনে কথা বলেই যাচ্ছে, এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।

তুষার আহমেদকে দেখা যাচ্ছে, গেটের সামনে দাঁড়ানো, বোঝাই যাচ্ছে দৌড়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। গেট দিয়ে বের হলো একজন, দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মনে হচ্ছে তুষারের খুব কাছের মানুষ, খুব ঘনিষ্টভাবে কথা বলছে। লোকটা চলে গেল।

বুলেটের শব্দ কানে এলো তখনই। পরপর দু-রাউন্ড গুলি ছুড়েছে কেউ। তুষারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল শাহরিয়ার, গুলিবিদ্ধ হয়েছে কি না এতো দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

"আমি দেখছি," শাহরিয়ার বলল, চাবি ছিল, মোটরবাইক স্টার্ট দিল দ্রুত।

"যাচ্ছেন কোথায়?" মোবাইল ফোনটা কোনমতে পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বলল তানভীর।

"আপনি উনার কাছে যান, তাড়াতাড়ি, আমি দেখছি গুলি করেছে কে," এক্সেলেটর চাপল শাহরিয়ার, সময় নেই, যা করার এক্ষুনি করতে হবে, নইলে পালিয়ে যেতে পারে খুনি।

কিছু বলার আগেই মোটরবাইক নিয়ে চলে এলো শাহরিয়ার, পাশ কাটাল তুষারকে, এখনো দাঁড়িয়ে আছে, বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে মনে হয়। কোথাও কোন রক্তের চিহ্ন দেখল না। আরো প্রায় পনেরো ফুট দূরে মাটিতে পড়ে আছে একজন। এই লোকটাকেই একটু আগে তুষারের সাথে কথা বলতে দেখেছে। গতি কমাল শাহরিয়ার, ডান হাতে গুলি লেগেছে, রক্ত বেরুচ্ছে অনবরত।

"কোনদিকে?" জিজ্ঞেস করল লোকটাকে।

"ঐ গাছের আড়ালে ছিল," রাস্তার পাশের একটা আমগাছ দেখিয়ে বলল আহত লোকটা, যন্ত্রনায় মুখ কুঁচকে গেছে।

এক্সেলেটর চাপল শাহরিয়ার, এখন নিশ্চয়ই আর গাছের আড়ালে নেই, দুপুরের এই সময়টা এখানে লোকজন খুব কম, গুলির শব্দে বেশ কিছু লোকজন ভিড় করেছে রাস্তায়, তবে তারা কেউ হামলাকারিকে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে না। দিনে-দুপুরে খোলা রাস্তায় এরকম হামলা করাকে সাহস না বলে দুঃসাহসই বলা যায়। আর দুঃসাহস মৃত্যু ডেকে আনে।

রাস্তাটা প্রধান সড়কের সাথে গিয়ে মিশেছে, কিছুক্ষনের মধ্যেই মোটরবাইক নিয়ে মোড়ে পৌছে গেল শাহরিয়ার। সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেল না, হয়তো এই মুহূর্তে তার আশপাশেই আছে।

মোটরবাইক ঘুরিয়ে তুষারের বাসার দিকে এগুলো শাহরিয়ার। ভিড় হয়ে গেছে, বাইকটা রাস্তার একপাশে পার্ক করল। তানভীরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত তুষারকে নিয়ে বাসার ভেতরে গেছে। আহত লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, তাকে সাহায্য করছে দুজন মহিলা, এদের একজন বিদেশি, এদের চেনে শাহরিয়ার, তুষার আহমেদের বোন আর স্ত্রি।

হামলার খবরটা দ্রুত দেয়া দরকার, মোবাইল ফোন বের করে আবু জামশেদের নাম্বারে ডায়াল করল শাহরিয়ার। রিং বাজছে।

অধ্যায় ৫৩

শাহরিয়ারের ফোন পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে কাজে নেমে পড়েছেন আবু জামশেদ, বুলেটের খোসা পাওয়া গেছে, দু'একজন প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া গেছে, তবে তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কথার কোন মিল নেই। কেউ দেখেছে অল্পবয়স্ক একটা ছেলে গুলি ছুঁড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে, কেউ দেখেছে দাঁড়িওয়ালা এক লোক মোটরবাইক থেকে গুলি ছুঁড়েছে, এরকম আরো হাবিজাবি। বিশ্বাস করার মতো কোন স্বাক্ষ্য পাওয়া গেল না। তবে এটুকু নিশ্চিত হয়েছেন, হামলাটা তুষারের উপরই করা হয়েছে। তুষারের ভগ্নিপতি জুনায়েদ আহত, হাতের উপরের অংশে গুলি লেগেছে, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স করে, সাথে গেছে স্ত্রি, দুই ছেলে আর তুষারের বাবা।

গেট দিয়ে তুষারদের বাসায় ঢুকলেন আবু জামশেদ, ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু করার কিছু নেই। এখন অনেক কাজ। দিনে-দুপুরে হামলা করে বসেছে, তার মানে খুনি এখন বেপরোয়া। যে কোন সময় আবার হামলা চালাতে পারে।

শাহরিয়ারকে পাঠানো হয়েছে অফিসে, তানভীরকে নিয়ে হাঁটছেন তিনি।

"তোমরা দুই দুজন মানুষ, অথচ কেউ কিছু করতে পারলে না?" আবু জামশেদ বললেন।

"কি করবো, হঠাৎ ঘটলো," তানভীর বলল, "আমরা তো অনেক দূরে ছিলাম, বুঝতে বুঝতে হাওয়া।"

ড্রইং রুমে বসানো হলো দুজনকে। চায়ের কাপ নিয়ে ভেতর থেকে ছোট একটা কাজের মেয়ে এলো। পুরো বাড়িটা নীরব, মনে হচ্ছে মৃত্যুপুরীতে চলে এসেছেন যেন। খুব বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না, জামা-কাপড় পাল্টে তুষার এসে বসল উল্টোদিকের সোফায়।

"যা বলার সংক্ষেপে বলবেন," তুষার বলল, "আমার বোন জামাই হাসপাতালে, আমাকেও যেতে হবে।"

"তুষারসাহেব, আমরাও অনেক ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার কারনও কিন্তু আপনি।"

"আমি?" অবাক হলো তুষার, "আমি কিভাবে?"

"আপনার ক্লোজ বন্ধু-বান্ধব মারা যায়, আপনার উপর হামলা হয়," আবু জামশেদ বললেন, চায়ে চুমুক দিতে দিতে, "আর আপনি আমাদের বেহুদা খাটিয়ে মারছেন।"

"কথাবার্তা ক্লিয়ার করে বলুন।"

"আপনি ঘটনা বলে দিলেই হয়," আবু জামশেদ বললেন, একটু ঝুঁকে এলেন তুষারের দিকে, "সবকিছুর পেছনেই কোন না কোন ঘটনা থাকে, কারন থাকে। আপনি হামলার শিকার হলেন, কেন?"

"হামলা তো আমার উপর হয়নি, আমার বোন জামাইয়ের উপর হয়েছে," তুষার বলল।

"হু, উনি আহত হয়েছেন জানি, কিন্তু আমাকে কী আপনার এতোই বোকা মনে হয়, মি. তুষার?"

"বোকা মনে হবে কেন?" তুষার বলল, "আপনি আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছেন, আমাকে সব জায়গায় ফলো করা হচ্ছে, আপনি আমার পারমিশন নিয়েছেন?"

এক দৃষ্টিতে তুষারের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন আবু জামশেদ, বিদেশ ফেরত এই মানুষটাকে বোঝা যাচ্ছে না, বইটার কথা মনে করলেন, তুর্য্য চরিত্রটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

"পারমিশন?" তানভীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তানভীর, তোমরা যে উনাকে ফলো করেছো, তার পারমিশন নিয়েছো?"

"আমরা উনাকে ফলো করবো কেন? ফলো করি আমরা দুই ধরনের মানুষকে, যে ক্রাইম করতে যাচ্ছে কিংবা যে ক্রাইমের শিকার। আপনি কোনটা?"

"আমার এতো কথা ভালো লাগছে না," সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুষার, "আপনারা ঠিক কী জানতে চান, বলেন। আমি হাসপাতালে যাবো।"

"আপনি আসল ঘটনা বলেন, তাহলেই হবে," আবু জামশেদ বললেন।

"আসল-নকল কোন ঘটনাই নেই, আপনারা এখন আসতে পারেন," তুষার বলল, ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, "আমি এখন বের হবো।"

"গুড, বলতে না চাইলে কিছু করার নেই," উঠে দাঁড়ালেন আবু জামশেদ, তানভীরও উঠে দাঁড়াল, "তবে আপনি এখন কোথাও যেতে পারবেন না। এই বাড়ির বাইরে যাওয়া আপনার জন্য নিষেধ।"

"আপনি নিষেধ করলেই আমি শুনবো?"

"শুনতে বাধ্য," বললেন তিনি, "বাইরে পুলিশ থাকবে গেটে, আর তানভীর থাকবে। যে কয়দিন দেশে আছেন, বাইরে যাওয়া নিষেধ আপনার জন্য।"

তুষার কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ক্রিস্টিনা এসে ঢুকল রুমে, সাথে বয়স্ক একজন মহিলা।

"তুমি বাসায় থাকো," ক্রিস্টিনা বলল, "আমরা তোমাকে জানাবো।"

তুষার কিছু বলল না, আবু জামশেদ বের হয়ে এলেন ড্রইং রুম থেকে। পেছন পেছন তানভীর।

তুষারের স্ত্রি'র গলায় কিছু একটা ছিল, বুঝতে পারছেন তার কথা মানতে না চাইলেও, স্ত্রি'র কথার বাইরে যাবে না এখন তুষার।

"গেটে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করছি আমি," আবু জামশেদ বললেন, "তুমি থাকবে দায়িত্বে।"

"জি, স্যার।"

বাইরে গাড়িতে এসে বসলেন, কয়েক জায়গায় ফোন করলেন, ধানমন্ডি থানা থেকে অন্তত দুজন পুলিশকে পাহারায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলেন। শরীর খারাপ লাগছিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে তুষারের বাসাটার দিকে তাকালেন, একতলা বাড়িটা চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, দেয়ালের উপরে কাঁটাতারের ব্যবস্থা। খুনি চাইলে এই দেয়াল পার হতে পারে, তবে কাজটা সহজ হবে না।

বাসায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু হাতে আছে অল্প কিছু সময়, এখন বিশ্রামের চিন্তা মাথায় আনা যাবে না, মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই আরো একটা ঘটনা ঘটবে।

ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বললেন, অফিসের উদ্দেশ্যে। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। এইটুক বিশ্রাম হলেই হবে আপাতত।

* * *

অফিসে পৌছে একটানা কিছু কাজ করলো শাহরিয়ার। এভিডেন্স কালেকশন রুমে গিয়ে দরকারি একটা কাজ সারর। এমনিতে অফিসে লোকজন বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকলেও আজ সবার মধ্যে আলাদা একটা ব্যস্ততা দেখতে পেল। কোথায় কোথায় ফোন করছে, কী নিয়ে কথা বলছে, জানার কিছুটা কৌতুহল হলেও এই মুহূর্তে কোথাও মন বসাতে পারছে না। ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়ার পরপরই একের পর এক ঝামেলা, শরীরের উপর খুব চাপ যাচ্ছে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে কিছু পায় নি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, বন্ধু-বান্ধব নেই, কোন প্রেম-ভালোবাসার ঝামেলা নেই, ছুটির দিনে সময় কাটানোই বরং ঝামেলা হয়ে যেত।

তারপরও এই কেসগুলোর কাজ শেষ হলে টানা কয়েকদিন ছুটি নেবে বলে ঠিক করলো শাহরিয়ার।

জানালা দিয়ে বাইরে আবু জামশেদের গাড়ি অফিস কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেখল। এখনই হয়তো ডাক পড়বে, সকাল থেকে ঝামেলার কারনে এখনো দুপুরে খাওয়া হয়নি। বাইরেই একট হোটেল আছে, ঝটপট কিছু ফাইল গুছিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো শাহরিয়ার, পিয়নকে হাত ইশারায় ডাকল।

"বস খুঁজলে বলো, লাঞ্চে আছি, চলে আসবো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

অফিসের সবাই কী নিয়ে ব্যস্ত জানতে ইচ্ছে করছিল, পিয়নকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যেতো, এরা ভেতরের সব খবর রাখে, তারপরও নিজেকে কোন রকমে নিয়ন্ত্রন করল শাহরিয়ার, ক্ষুধা পেয়েছে খুব, খুব জরুরি কিছু হলে আবু জামশেদ নিজেই বলবেন।

অধ্যায় ৫৪

কিছু কিছু কাজের জন্য মাঝে মাঝে নিজের গালেই চড় দিতে ইচ্ছে করে তার, দিনে-দুপুরে হুট করে এরকম পাগলামি করা ঠিক হয়নি। ভাগ্য ভালো কেউ খেয়ালই করে নি তাকে, অবশ্য খেয়াল করার কথাও না। অভিনয়টা সে খুব ভালো পারে, এমনভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে, অন্য সবাই ভেবেছে খুব ভয় পেয়েছে গোলাগুলির শব্দে। তারপর কোনরকমে মোড় থেকে সোজা হেঁটে ধানমন্ডি লেকের কাছে চলে এসেছে। আসলে লোকটাকে হাতের কাছে পেয়ে সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করেনি। অভিনয়ের পাশাপাশি আরো কিছু ছুটকা-ফাটকা গুন আছে তার, যেগুলো সাধারনত কাজে লাগে না, তবে যখন কাজে লাগে তখন... হাসল সে।

একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে, এতো সহজ সুযোগ হয়তো আর আসবে না, এরপর সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করতে পারলে আর দু'একটা দিন অপেক্ষা করা তেমন কোন সমস্যা না।

রিভলবারটা কোমরে গোঁজা, একটু বাঁকা হয়ে হাঁটছিল সে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে, তার ছায়াও ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে উঠছে।

অধ্যায় ৫৫

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনজন পুলিশ সদস্যকে পাঠাতে পারলেন তুষারের বাড়ির সামনে, তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, বাড়ির সদস্য ছাড়া আর কেউ যেন ঢুকতে বা বেরুতে না পারে। এই শর্ত কেবল হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অফিসের কয়েকজনকে কিছু কাজ দিয়েছিলেন অফিস থেকে বেরুনোর আগে, সেগুলোর অগ্রগতির খবর নিলেন, কোন অগ্রগতি নেই।

অফিসের এই লোকগুলোকে আরো একটু স্মার্ট বানানো দরকার, ফাইন্যানসিয়াল অ্যানালিস্ট, ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম এক্সপার্ট, সাইবার এক্সপার্ট এই ধরনের পোস্টে কিছু লোকজন নিয়োগ করতে হবে। আইজি সাহেবের সাথে মিটিং হলে এই এজেন্ডাগুলো রাখতে হবে, তবে সে সুযোগ তিনি পাবেন কি না তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় দেখা দিয়েছে, একটার পর একটা খুন হয়েছে, অথচ কোন সমাধান করতে পারেন নি, এই ডিপার্টমেন্টটা গোছানোর সময় বুঝি ফুরিয়ে এলো।

শাহরিয়ার ঢুকল রুমে, ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

"শাহরিয়ার, আজ রাতে তোমার কাজ আছে?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

"না, স্যার।"

"অবশ্য কাজ থাকলেও উপায় ছিল না," একটা ফাইল দেখতে দেখতে বললেন তিনি, "তুষার আহমেদের বাসায় রাতের সেসশনটা তোমাকে থাকতে হবে। এখন তানভীরকে রেখে এসেছি দায়িত্বে।"

"আচ্ছা।"

"তুমি ঠিক এগারোটার দিকে চলে যাবে, সকাল সাতটা পর্যন্ত থাকবে, ততোক্ষনে তানভীর আবার চলে আসবে।"

"জি, আচ্ছা।"

"এখন বাসায় চলে যাও, যতোটুকু পারো ঘুমিয়ে নাও, আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।"

"জি, স্যার।"

শাহরিয়ার উঠে দাঁড়াল, এই মুহূর্তে ঘুম খুব জরুরি দরকার, রাতে বাইরে থাকতে কোন অসুবিধা নেই, বরং রাত জাগতে তার ভালোই লাগে।

"কিছু বলবে?"

"আমরা যে পাহারায় থাকছি এটা কি তুষার আহমেদ জানেন?"

"জানে। এটা নিয়ে ভেবো না। তোমার কাজ হচ্ছে আরেকটা দূর্ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা।"

"জি, স্যার।"

"মোবাইলটা ফুল চার্জে রাখবে, ঝামেলা মনে করলেই ফোন দেবে, আমি বাকিটা দেখবো।"

"তাহলে আসি, স্যার।"

"যাও।"

ড্রাইভারকে আগেই বলে দেয়া ছিল, শাহরিয়ারকে ড্রপ করে দিয়ে আবার চলে আসবে। আজকে রাতটা এভাবে কাটানো যাবে, কাল রাতে অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না ভেবে দেখতে হবে। তার নিজের শরীরও ভালো লাগছিল না। মাথার ভেতর একের পর এক প্রশ্ন ঘুরছে শুধু, দিনে দুপুরে তুষারের উপর গুলি ছুঁড়ল কে? একজন মানুষের কতোটা জেদ থাকলে সে এতোটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে?

বইটা পড়ে লেখক আরিফুল হক'কে নিয়ে যা সামান্য সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে তা। আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে, মৃত মানুষের অঙ্গচ্ছেদ না করেও ভদ্রলোক হয়তো তার প্রতিশোধ নিতে পারতো। কিন্তু এমন এক পথ বেছে নিয়েছে যেখান থেকে আর ফেরার পথ নেই।

এই খুনগুলো তার বুকের উপর ভারি পাথরের মতো চেপে বসেছে যেন, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সামনে থেকে ফাইলগুলো সরিয়ে একপাশে রাখলেন, কিছুক্ষনের জন্য হলেও এইসব চিন্তা একটু দূরে সরিয়ে রাখা দরকার, স্মৃতি হাতড়ে আনন্দের কোন মুহূর্ত খুঁজে পেতে চাইলেন, না, আনন্দের কোন স্মৃতি নেই তার।

অধ্যায় ৫৬

দুপুরের এই সময়টা বাসা ফাঁকা থাকে, সবাই চাকরি করে, রান্না-বান্নার কোন ঝামেলা নেই। নিজের রুমে ঢুকে কোনমতে কাপড়-চোপড় পাল্টে শুয়ে পড়ল শাহরিয়ার, সোয়া তিনটার মতো বাজে, মোবাইল ফোনে রাত ন'টায় অ্যালার্ম সেট করল। শোয়া মাত্রই সাধারনত ঘুম আসে না তার, ঘুম আসার জন্য বেশ কসরত করতে হয়। বেশিরভাগ সময় নিজের ছোটবেলার দিনগুলোর কথা ভাবে, একেকটা দিন, কী কষ্টের, কী একাকীত্বের, কী যন্ত্রনার এটা পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। জানাতে চায়ও না। দাঁতে দাঁত চেপে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে সে, এখনো সে লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। তবে লক্ষ্যে পৌছাতে হবেই, যে করেই হোক।

আজ খুব বেশি সময় ঝামেলা করতে হলো না, ঘুম চলে এলো, যেন ঠিক মাথার কাছের ঘাপটি মেরে বসেছিল ঘুম, মাথাটা বালিশে ছোয়ামাত্র ঘুম ছুঁয়ে দিল তাকে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ঠিক ন'টায় অ্যালার্মের শব্দে জেগে উঠল শাহরিয়ার।

এই ঘুমটার খুব প্রয়োজন ছিল, একদম তাজা আর ফুরফুরে অনুভব করছে, বাজি ধরে পুরো ঢাকা শহরটা দৌড়ে আসতে পারবে সে।

রুমমেটরা সন্ধ্যায় এসে ঘুমন্ত শাহরিয়ারকে পেয়েছে, এরকম সময়ে কাউকে ঘুমাতে দেখলে সাধারনত অবাক হওয়ার কথা, তারা অবাক হয়েছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করার ঝামেলায় গেল না, এই অদ্ভুত রুমমেট নিয়ে তাদের কৌতুহল থাকলেও বেশ কিছুদিন একসাথে থাকার ফলে তারা বুঝে গেছে, খুব প্রয়োজন না হলে শাহরিয়ারের সাথে কথা না বলাই ভালো।

সোয়া ন'টার দিকে বেরিয়ে পড়ল শাহরিয়ার, বাসায় বুয়া রান্না করে গেছে, কিন্তু আজ বাইরে কোথাও খাবে বলে ঠিক করল, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা রিক্সা নিয়ে ধানমন্ডি যেতে ঘন্টাখানেকের মতো লাগার কথা। খুব ফূর্তি লাগছিল আজ হঠাৎ করেই।

আজ রাতে কোন চাঁদ নেই, কালো একটা ছায়া ঢেকে রেখেছে যেন পৃথিবীটাকে, রিক্সায় যেতে যেতে সারারাত কাটানোর প্ল্যান করেছে, সাথে একটা বই নিয়ে এসেছে, সময় পেলে বইটা পড়া যেতে পারে, এমন নয় যে এই বইটা আগে পড়েনি, কিন্তু এই বইটা বারবার পড়তে ভালো লাগে।

তুষার আহমেদের বাড়ির সামনেই পাওয়া গেল তানভীরকে। শাহরিয়ারকে দেখে এগিয়ে এলো।

"কি মিয়া? তুমি তো দেখি টাইমের আগেই আইসা হাজির," তানভীর বলল, এই

প্রথম 'তুমি' সম্বোধন করল এবং তাতে কিছু মনে করল শাহরিয়ার। বয়সে সে তানভীরের অনেক ছোটই হবে।

"আমি এমনই," শাহরিয়ার বলল।

"এই ডায়লগটা চেনা চেনা লাগে," বলে হাসল তানভীর, "আমি এগারোটা পর্যন্ত আছি। চলো, এই দোকানে যাই। চা খাই।"

চায়ের দোকানটা মোড়ের দিকে, এখনো খোলা আছে, রাত জাগতে হবে যেহেতু চায়ে তাই আপত্তি করার কোন মানে নেই।

"বাসার লোকজনের কি অবস্থা?" হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

"তুষারের মা আর বোন, হাসপাতালে, বোন জামাইয়ের কাছে," তানভীর বলল, "রাতে ফিরবে না।"

"তাহলে বাসায় আছে তুষার সাহেবের বাবা, তুষার নিজে, তার স্ত্রি আর দারোয়ান?"

"হু। আর তুষারের বোনের দুই বাচ্চা আর একটা ছোট কাজের মেয়ে।"

"আচ্ছা, তা আপনি সকাল কয়টার দিকে আসবেন?"

"বস তো বলে রাখছে সাতটার দিকে আসতে," তানভীর বলল, হাত ধরল শাহরিয়ারের, "কিন্তু এতো সকালে আমি আসতে পারবো না, আমার আসতে আসতে আটটার বেশি বাজতে পারে, বুঝোই তো, দেরি করে ঘুমাই।"

"আমার সমস্যা নেই, আপনি না আসা পর্যন্ত আমি থাকবো।"

তানভীর হাসল, "নাইট ডিউটি আমার পছন্দ না, এইসব এলাকায় রাতে অনেক উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটে।"

"কি রকম?" কৌতুহলি হলো শাহরিয়ার।

"ভূতের ব্যাপার স্যাপার আর কি..."

হেসে ফেলল শাহরিয়ার, বয়স্ক একজন মানুষ এখনো ভূত নিয়ে চিন্তিত!

"তুমি তো আমার কথা পাত্তা দিলা না," তানভীর বলল, "আচ্ছা, বাদ দাও। এই মামা, চা দেন।"

মিনিট দশেক দুজন গল্প করল, একসাথে অনেকদিন অফিস করার পরও যে আন্তরিকতাটা গড়ে উঠে নি, এই দশ মিনিটেই দুজনের মধ্যে একটা সখ্যতা গড়ে উঠল, তানভীর হোসেনের রুক্ষ, কর্কশ চেহারায় পেছনের মানুষটা মজার, আর শাহরিয়ারের শান্ত, অসামাজিক স্বভাবের পেছনের মানুষটা নরম, আপাতত এভাবেই দু'জন দু'জনকে চিহ্নিত করল।

তানভীর চলে যাওয়ার পর তুষার আহমেদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল শাহরিয়ার, পুলিশের তিনজন কনস্টেবল নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। তাকে দেখে কিছুক্ষন চুপ থাকলেও নিজেদের মধ্যে খুনসুটি শুরু হতে দেরি

হলো না।

ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে এখন। দীর্ঘ একটা রাতের সূচনা হচ্ছে, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় নিজের দীর্ঘ ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ার। একদৃষ্টিতে।

ঠিক দুটোর দিকে ঘুম ভাঙল শাহরিয়ারের। আজ রাতে তার ঘুমানোর কথা ছিল না। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠেছে। একটা কল এসেছে, নাম্বার সেভ করা নেই। কলটা কেটে দিল।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরাল শাহরিয়ার, পুলিশের কন্সটেবল তিনজন গেটের সামনেই চেয়ার নিয়ে বসে আছে, কিছুক্ষন আগেও নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত থাকলেও এখন দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার প্রানান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

"কি অবস্থা আপনাদের? সব ঠিকঠাক তো?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

"জি, স্যার," উত্তর দিল একজন, "আপনে ঘুমান, আমরা তো আছিই।

"ঘুমালে চলবে? যদি কিছু হয়ে যায়?"

"কিচ্ছু হইবো না, স্যার, আমরা আছি না!" হেসে বলল কন্সটেবল, ওর ব্যাজটা পড়ল শাহরিয়ার, আব্দুল কালাম নাম। বাকি দুজনের চেয়ে সপ্রতিভ, চটপটে। বয়সও কম।

"আচ্ছা, কালাম, এখানে চায়ের দোকান খোলা থাকে?"

"স্যার, ঐ মোড়ের দিকে পাইতে পারেন," আব্দুল কালাম বলল, "আমি দেইখ্যা আসি গিয়া?"

"না, আপনি থাকেন, আমিই দেখে আসি," বলল শাহরিয়ার, "এখান থেকে একপা'ও নড়বেন না, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

হাঁটতে থাকল শাহরিয়ার, এক কাপ চা পেলে ভালো লাগবে। শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে আছে, এই আড়ষ্টতা কাটানো জরুরি, রাত এখনো অনেক বাকি।

রাস্তাঘাট ফাঁকা, অনেক খুঁজে চায়ের দোকান পেল না। হাঁটতে হাঁটতে তুষারদের বাড়ির পেছনের রাস্তায় চলে এলো শাহরিয়ার। একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার একপাশে, রাত-বিরেতে বিনা কারনে রাস্তার উপর মাইক্রোবাস পার্ক করে থাকার কথা নয়, ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এগিয়ে গেল সে।

অধ্যায় ৫৭

পুরো বাড়িটা শান্ত, নীরব, ড্রইং রুমে বসে টিভির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুষার। টিভির সাউন্ড অফ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে একদল কুমিরের কর্মকান্ড দেখানো হচ্ছে। গভীর মনোযোগে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখছে না তুষার, আজ রাতটা দীর্ঘ, এই রাত সহজে কাটবে না বলে মনে হচ্ছে কেন জানি এবং আজ রাতে কোনমতেই ঘুম আসবে না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে তার সাথে কোন বাক্য-বিনিময় করে নি ক্রিস্টিনা, এমনকি তাকায়ও নি, যেন পৃথিবী থেকে তুষারের অস্তিত্ব মুছে গেছে হঠাৎ করেই। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সুমনার দুই ছেলেকে নিয়ে, ওরা এখনো বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে, তাদের বাবা-মা দুজনেই বাইরে কেন। ওদের দুজনকে খাইয়ে-দাইয়ে আজ রাতটা ওদের সাথেই ঘুমাতে গেছে ক্রিস্টিনা, একজন আমেরিকান মেয়ের সাথে যেটা মোটেই যায় না। ওর রাগের কারনটা বোঝে তুষার, স্ত্রি হিসেবে স্বামির সব ইতিহাস জানতে চাওয়া মোটেও উচিত না, কিন্তু ভালোবাসা মাঝে মাঝে উচিত-অনুচিত বোঝে না, তার উপর একটার পর একটা খুনের ঘটনা সম্পর্কেও ক্রিস্টিনাকে কখনো খুলে বলে নি সে, এটাও ক্রিস্টিনার রাগের আরেকটা কারন।

বাবা বয়স্ক মানুষ, এগারোটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, দারোয়ান চাচা গেটের কাছে ছোট ঘরটায় থাকেন, আজ রাতে পুলিশ পাহারা দেবে শুনে একটু ভয় পেয়েছে বেচারা।

সিগারেট খেতে খেতে ড্রইং রুমে পায়চারি করল তুষার, সেটা কতোক্ষন ধরে তা সে জানে না এবং এই দীর্ঘ সময়ে তেমন কিছুই ভাবল না, অদ্ভুত একটা ঘোরের ভেতর চলে গেল। বহুদিন পর নিজেকে একা মনে হচ্ছিল এবং এই একাকীত্ব উপভোগের একাকীত্ব, বিষাদের নয়।

আমেরিকায় সবসময় টুকটাক বিয়ার খাওয়া হয়, মোটামুটি একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, ঢাকায় নামার পর বিয়ার জোগাড় করতে কোন সমস্যা হয়নি, সমস্যা হয়েছে রেফ্রিজারেটরে রাখা নিয়ে। বাবা-মা দুজনেই পুরানো ধাঁচের মানুষ, ছেলে বাসায় বসে ফ্রিজ থেকে বের করে বিয়ার খাবে এটা তাদের পক্ষে মানা কঠিন। তবে অবাক হয়ে দেখল তুষার, বয়স্ক দুজন মানুষই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন বরং এই জিনিসের জন্য বাইরে থাকার চেয়ে ছেলে ঘরে থাকবে এতেই তারা আনন্দিত।

ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ারের ক্যান বের করে সোফায় পা তুলে বসল তুষার। ক্যানটা হাতে নিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষন, তারপর ঘুমিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল, হঠাৎ করেই, যেভাবে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল এতোক্ষন

সে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে মাথা নীচু করে ঘুমাচ্ছিল, ঘুম ভেঙেছে টিফিন পিরিয়ডের ঘন্টার শব্দে। পাশের বেঞ্চ থেকে মশিউর হাসছে, ইশারা করছে কিছু একটা। ইশারা বুঝতে পারছে না তুষার। কী বলতে চাইছে মশিউর, কি?

শব্দটা টের পাচ্ছে তুষার, একটানা, পরিচিত একটা শব্দ, ড্রইং রুমে বাতি জ্বলছে, টিভি চলছে, তবে শব্দের উৎসটা অন্য কিছু। কী?

সংবিত ফিরে পেল, টেলিফোন বাজছে। দেয়ালে টানানো ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত দুটো চব্বিশ। এতো রাতে কে ফোন করবে? সুমনা? খারাপ কিছু ঘটেছে? হাতে বিয়ারের ক্যান ধরা আছে এখনো, ক্যানটা একপাশে রেখে সোফার পাশে ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলল তুষার।

কে জানি বলেছিল, রাত দুটোর পর ভালো খবর আসে না?

"হ্যালো, তুষার বলছি," বলল তুষার, গলাটা ভার হয়ে আছে, কথা বলতে গিয়ে টের পেল।

"কেমন আছিস?"

কণ্ঠস্বরটা পরিচিত, খুব কাছের, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, আহ, সব তাহলে ঠিক আছে, কোথাও খারাপ কিছু ঘটেনি।

"ভালো, তুই কেমন আছিস?" জিজ্ঞেস করল তুষার।

"ভালো।"

বেশ কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, ওপাশ থেকে কি বলে শোনার জন্য কান পেতে আছে তুষার।

"হ্যালো?"

"শুনছি," তুষার বলল।

"তোর বাসায় আমি অনেকবার গেছি, অনেকবার," পরিচিত কণ্ঠস্বরটা বলল, "পুরো বাড়িটা আমার চেনা। জানিস?"

"জানি।"

"পেছন দিকের দেয়ালে যে ছোট একটা গেট আছে, সেটাও কিন্তু আমি জানি।"

তুষারের মনে পড়ল, একতলা বাড়িটা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, বাসায় ঢোকার জন্য গেট একটাই, কিন্তু আরো একটা গেট আছে, বাড়ির পেছনের দিকের দেয়ালে, সেটা অনেক আগে থেকেই তালাবদ্ধ থাকে, কেউ সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করে না।

"আচ্ছা।"

"তুই চলে আয়, ঐ গেট দিয়ে বের হবি," কণ্ঠস্বরটা বলল, "তোর সাথে আমার অনেক কথা বাকি।"

"আমি এখন বেরুতে পারবো না," তুষার বলল, "সত্যিই পারবো না।"

"তুই হয়তো ভাবছিস, আমি খারাপ কিছু করবো," কণ্ঠস্বরটা বলল, "কিন্তু

সেরকম কোন উদ্দেশ্য এখন পর্যন্ত নেই।"

"আমি তা ভাবছি না।"

"তুই হয়তো ভাবছিস, একবার দেশ থেকে চলে যেতে পারলে হয়, তাই না? কারো কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না।"

"মোটেও না।"

"একবারও কি ভাবিস, তুই চলে যাবি, কিন্তু দেশে পড়ে থাকবে তোর বৃদ্ধ মা-বাবা, আর ছোট বোনটা।"

"হুমকি দিচ্ছিস?"

"না। একটা সম্ভাবনার কথা বলছি।"

নিজেকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে কোন আপত্তি নেই তুষারের, কিন্তু প্রশ্নটা যখন মা-বাবা আর ছোট বোনের, তখন ঝুঁকি নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া দেশে আসার পর থেকে একটার পর একটা ঝামেলা চলছেই, এসবের একটা বিহিত করা দরকার।

"আরেকটা কথা," ওপাশ থেকে বলল কণ্ঠস্বরটা, "উল্টাপাল্টা কিছু করিস না। পুলিশে জানিয়ে লাভ হবে না। ওরা আমাকে খুঁজে পাবে না। মাঝখান থেকে তুই আরো বেশি ঝামেলায় পড়ে যাবি।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"তুই গেট দিয়ে বের হবি, তোর জন্য সাদা একটা মাইক্রোবাস রেডি থাকবে, উঠে পড়বি, ব্যস।"

"তারপর?"

"বাকিটা না হয় সরাসরি কথা হোক।"

"ঠিক আছে, আমি আসছি।"

"আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, একটু ভুল হলে আমি কাউকে ছাড়বো না। পুলিশ তোকে কিংবা তোর পরিবারের কাউকে বাঁচাতে পারবে না।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রিসিভারটা রেখে দিল তুষার। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বাইরে পুলিশের কয়েকজন আছে পাহারায়, এছাড়া হোমিসাইড ব্রাঞ্চেরও কারো না কারো থাকার কথা। আবু জামশেদ কার্ড দিয়ে গেছেন, সরাসরি তাকে ফোন করা যায়, সাহায্য চাওয়া যায়। কিন্তু এসব কিছু করতে গেলে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। এমনিতেই ছোট বোনের স্বামি গুলি খেয়ে হাসপাতালে, বাকি কারো জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেয়ার কোন অধিকার তার নেই, নিজের ঝামেলা নিজেকেই মেটাতে হবে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল তুষার, আজ একদম অন্ধকার চারদিক, বাসার পেছনের দিকটা ঝোপ-ঝাড়, আগে সুমনা এখানে ফুলের বাগান করেছিল, সেইসব বাগান ধরে রাখার মতো আর কেউ নেই এই বাড়িতে। ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে কিছুটা গেলেই দেয়াল, সেই কবে ওখানে থাকা ছোট গেটটা ব্যবহার করেছিল মনে নেই। গেটের

চাবি কোথায় থাকে সেটাও জানা নেই। এখন চাবি খুঁজতে যাওয়া মানে অনেক সময় নষ্ট করা, এতো বড় বাসায় কোথায় গেটের চাবি আছে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব না।

জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরাই ছিল, একজোড়া উঁচু জুতো পরে নিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে হাঁটতে সুবিধা হবে। বাসার পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করল, মোবাইল ফোনটা পকেটে আছে, সাইলেন্ট মুড অন করে দিল।

এখানে সাপ-খোপ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না, মোবাইল ফোনে এখন টর্চের আলো ফেলার ব্যবস্থা আছে, অপশনটা চালু করল, সেই অল্প আলোতে হাঁটতে হাঁটতে অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে দেয়ালের কাছাকাছি চলে এলো তুষার। গেটের অবস্থানটা পরিষ্কার মনে নেই। আলো ফেলে দেয়াল দেখতে দেখতে ছোট গেটটা চোখে পড়ল। আসলে একে ছোট গেট না বলে শ্যাওলা ধরা ছোট একটা কাঠের দরজা বলা যায়। উপরে একটা তালা ঝুলছে, মরচে ধরে গেছে তালাটায়। এই তালার জন্য চাবি প্রয়োজন নেই, জোরে ধাক্কা দিলেই হয়তো দরজাটা খুলে যাবে, কিন্তু দরজাটা না ভেঙে কিছু একটা করতে হবে, চারপাশে তাকাল, ভারি কিছুর খোঁজে, একটা ইটের অর্ধেক অংশ চোখে পড়ল, দু'তিন ফুট দূরেই পড়ে আছে। এটা দিয়েই কাজ হবে।

এই রাতে ক্ষীন শব্দও অনেকদূর যাবে, তাই খুব জোরে বাড়ি দিল না, মেইন গেটে পুলিশের লোক আছে, কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ পেলে ওরা সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে যাবে। পরপর কয়েকবার বাড়ি দিতেই তালাটা ভেঙে গেল। কতোবছর ধরে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সহ্য করছে কে জানে, চোর-ডাকাত এই গেটটার কথা জানে না, জানলে অনেক আগেই কিছু একটা করে ফেলত। না জানার কারন হচ্ছে, দরজার ওপাশটায় এমনভাবে রঙ করা যে খুব কাছ থেকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এই জায়গাটায় কোন ইট নেই।

দরজাটা অল্প ফাঁক করে মাথা নীচু করে ওপাশে চলে আসল তুষার, এই রাস্তাটা বাসার পেছনের দিক, অনেক রাত হয়েছে বলে রাস্তায় মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। দরজাটা কোনমতে আটকাল তুষার, যাতে কিছু বোঝা না যায়। কাল সকালেই এর একটা স্থায়ি ব্যবস্থা করতে হবে, যদি সকাল বলে কোন কিছু দেখা পাওয়ার ভাগ্য হয় তো!

বুকটা ধুকধুক করছিল, জীবনে এমন অসহায়বোধ কখনো করে নি তুষার, যখন দূরে সত্যি সত্যি সাদা একটা মাইক্রোবাস চোখে পড়ল। এই যান তাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? আর কী ফেরা হবে? ক্রিস্টিনাকে কিছু বলে আসা হলো না। বুকের মাঝখানটায় কেমন ফাঁকা লাগছে। হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারল শরীরটাও যেন বশে নেই।

সাদা মাইক্রোবাসটার দিকে তাকিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস নিল তুষার। এখন ভয় পাবার সময় নয়, সাহসি হবার সময়।

ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল তুষার। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার নেমে এসেছে, মধ্য-বয়স্ক একজন মানুষ, হেসে তাকাল তার দিকে।

"স্যার, উঠেন," বলে স্লাইডিং দরজাটা টেনে খুলল।

গাড়িতে উঠে বসল তুষার, স্লাইডিং দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তেই, ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার এক গুহায় পরিনত হলো যেন সাথে সাথে। দমবন্ধ করা এক পরিবেশ, ড্রাইভার সিটে বসে স্টার্ট দিয়েছে। তুষারের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

তুষারও হাসল, নার্ভাসভাবে। লক্ষ্য করল ড্রাইভারের দৃষ্টি ঠিক তার দিকে না, বরং পেছনের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সময় পেল না তুষার। সাদা রুমাল ধরা একটা হাত চেপে ধরেছে তার মুখ, গন্ধটা অপরিচিত, তবে কিসের বুঝতে সমস্যা হলো না। ক্লোরফর্ম মেশানো আছে রুমালটায়।

চিৎকার করতে চাইল তুষার, পারল না, গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

অধ্যায় ৫৮

বাসায় ফিরেছেন রাত দশটার দিকে, খাওয়া-দাওয়া বাইরে থেকে কিনে আনেন সাধারনত, আজ কিনে আনেননি। রান্নাঘরে আধঘন্টা সময় কাটিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন ঘামে ভিজে গেছেন প্রায়, অল্প একটু ভাত রান্না করেছেন আর একটা ডিম ভাজি, আজকের রাতের জন্য যথেষ্ট।

খাওয়া শেষে ঘরের মধ্যেই একটু হাঁটাহাঁটি করলেন, স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য চেষ্টা বলা যায়। এর অনেকক্ষন পর সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে তানভীরের সাথে যখন কথা শেষ হলো তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। তানভীর বাসায় ফিরছে আর শাহরিয়ার ডিউটিতে গেছে, ছেলেটা নতুন হলেও ফাঁকিবাজ নয়।

টিভি ছেড়ে রিমোটের বাটন ঘোরাতে ঘোরাতে বিদেশি একটা ক্রাইম সিরিয়াল দেখলেন এবং দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে। দেখলেন, তিনি মাকড়সার জালে জড়িয়ে গেছেন, বেশ বড়সড় একটা মাকড়সা এগিয়ে আসছে তার দিকে, মাকড়সার মুখটা মানুষের, খুব পরিচিত একজন মানুষের মুখ। তিনি চিৎকার করছেন না, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সেই মুখটার দিকে। আটপায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মাকড়সাটা তার দিকে, কিছু বলতে গেলেন, পারলেন না, বুঝতে পারলেন মুখের ভেতর থেকে জিভ উধাও, জিভ ছাড়া কেউ কিভাবে কথা বলে!

ঘুম ভাঙতেই প্রথমে জিভ বের করে আঙুল দিয়ে স্পর্স করলেন তিনি। স্বপ্নটা এতো বাস্তব ছিল যে, মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি জিভ নেই হয়ে গেছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা, সোফায় ঘুমানো আজকেই প্রথম নয়, তবে আজ শরীরটা ব্যথা করছে, বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যই।

দু:স্বপ্ন তার জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, ফেলে আসা জীবনের কিছু অন্ধকারতম অধ্যায়কে চাইলেও ভুলে যাওয়া সম্ভব না।

মোবাইল ফোনটা হাতের কাছে রেখেছেন, যে কোন সময় দরকারি কল আসতে পারে। একপাশে ল্যাপটপের ব্যাগটা রাখা, খুলে ল্যাপটপ বের করলেন। এই জিনিসটা তার অপছন্দের, অফিসের কাজ সাধারনত অফিসেই সারেন, বিশেষ করে ফাইলপত্র-রিপোর্টের কাজ ফেলে রাখেন না, আজ কাজ শেষ করতে পারেননি। একটা বিশেষ তথ্যের জন্য সারা বিকেল আর সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে তথ্যটা পাননি। শেষে নিজের ই-মেইল আইডিটা দিয়ে এসেছেন, জরুরি কোন মেইল থাকলে যেন পাঠিয়ে দেয়। ল্যাপটপটা সেজন্যই খোলা। কোন জরুরি মেইল এসেছে কিনা দেখার জন্য।

রাত দুটোর বেশি বাজে, চারপাশে ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, বাইরে বেরুলে থোকা থোকা জোনাকি পোকার দল এখনো দেখা যায় এই এলাকায়। মেইলবক্স খুলে তাকিয়ে রইলেন। একটা মাত্র মেইল নামছে, বেশ বড় সাইজের। বাসায় মডেম ব্যবহার করেন, যার গতি শম্বুক গতির কাছাকাছি, যে হারে মেইল নামছে তাতে আরো মিনিট দশেক লাগার কথা। এতো সময় ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগবে না। তিনি ফ্রিজের দিকে এগুলেন।

এমনিতে তিনি অ্যালকোহল পছন্দ করেন না, তবে তার ফ্রিজে সবসময় গোটা দুই বোতল থাকে, যখন কোন কিছু করার থাকে না, নিজেকে খুব বেশি নিঃসঙ্গ মনে হতে থাকে, তখন বের করেন বোতল। অল্পকিছু পান করেন, তাতে নেশা ধরে, নানারকম কল্পনা মাথায় ঘোরে। আজকেও তাই করলেন।

মেইল ডাউনলোড হতে হতে দু'এক পেগ খাওয়া হয়ে যাবে সম্ভবত, কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে, আগামিকালই শেষ দিন, কেসগুলোর কোন কূল-কিনারা যেহেতু হচ্ছে না, সেহেতু কালকের পরের দিন থেকেই আর অফিসে যাবেন না বলে ঠিক করলেন। প্রয়োজনে আজকে রাতেই রেজিগনেশন লেটার টাইপ করে রাখবেন।

জ্যাক ড্যানিয়েলস হুইস্কি'র বোতলটা বের করে টেবিলের উপর রেখেছেন, ছোট একটা কাঁচের গ্লাসে অল্প কিছু ঢাললেন, কোন পানি মেশানো হবে না, একঢোকে খেয়ে ফেলতে হবে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকালেন, এতো বড় ফাইল কিসের হতে পারে!

একটা সিগারেট ধরালেন আবার, মাথাটা ঝিমঝিম করছিল একটু আগে, এখন পরিস্কার লাগছে, কাঁচের গ্লাসটা উঁচু করে তুলে ধরলেন, তারপর চিয়ার্স বললেন নিজেকে, এক ঢোকে গরলটা গলা বেয়ে নেমে গেল। শরীরটা গরম হয়ে গেছে মুহূর্তেই। পানির বোতল নিয়ে বসা দরকার ছিল, বেশ অনেকদিন পর অ্যালকোহল যাচ্ছে শরীরে, খুব তাড়াতাড়ি নেশা ধরবে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পেগটাও খুব তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। মেইল নামতে আর অল্প কিছু বাকি আছে। সিগারেট টানতে টানতে উঠে দাঁড়ালেন, ডানদিকের দেয়াল ঘিরে চমৎকার একটা বুক-সেলফ বানানো। দামি সব বইয়ে ভরা। সৌখিন মানুষজন এসব বই রাখে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য। তিনি সৌখিন মানুষ নন, বাসার সৌন্দর্য্যের দিকে তার কোন খেয়াল নেই। বাসায় বেশিরভাগ সময় কাটে বই পড়ে, এই মুহূর্তে তার সমস্ত মনোযোগ ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে।

গত কিছুদিন ধরে খুন হওয়া একটার পর একটা মৃতদেহের ছবি তার চোখের সামনে ভাসছে। আধুনিক টেকনোলজি কিংবা বেশ কয়েকজন লোকের সাহায্য নিয়েও সমাধান করা যাচ্ছে না এই খুনগুলোর। হার মানতে রাজি নন তিনি, কিন্তু এবার মনে হয় হার মানতেই হচ্ছে।

হতাশার সাথেই হাত বাড়ালেন বোতলটার দিকে, নিজের হারটা অন্তত উপভোগ করা যাক, নিজের সাথেই।

মেইল ডাউনলোড হওয়া যখন শেষ হলো তখন চোখ খুলে রাখতেও কষ্ট হচ্ছিল আবু জামশেদের, মেইলটা এসেছে একটা ব্যাংক থেকে। দুটো ফাইল আছে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে, ডক ফাইলটা খুললেন প্রথমে।

লেখক আরিফুল হকের একটাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। সেই অ্যাকাউন্টের লেনদেনের হিসেবটা এখন চোখের সামনে। বেশ বড় অংকের টাকা-পয়সা এই অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে, একজন লেখক এই পরিমান টাকার লেনদেন করেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। উপন্যাস ধরনের বইপত্রের সাথে যোগাযোগ কম ছিল বলে লেখকের জনপ্রিয়তার উপর পুরোপুরি ধারনা ছিল না।

একটা বিশেষ তারিখ মার্ক করলেন, লেখকের মৃত্যু দিবস হিসেবে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই দিনের পরও লেখকের অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন হয়েছে এবং সেইসব লেনদেন হয়েছে সব এটিএম বুথের মাধ্যমে। সাধারনত এটিএম বুথ থেকে দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি তোলা যায় না, ঠিক সেই পরিমান টাকাই তোলা হয়েছে, তিনি গুনলেন। ছয়দিন, তিন লাখ টাকা, এখনো অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স আছে উনিশ লাখ টাকা। এই অ্যাকাউন্ট লেখকের মৃত্যুর পর বন্ধ করে দেবার কথা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে নিশ্চয়ই কোন উত্তর আছে, কেন তারা বন্ধ করে দেয় নি, কিংবা হয়তো খেয়ালও করেনি। এছাড়া অ্যাকাউন্টের নমিনি থাকার কথা, এটাও জানতে হবে।

এবার দ্বিতীয় ফাইলটার দিকে মনোযোগ দিলেন। একটা ভিডিও ফাইল, এই ফাইলটার জন্যই মেইল নামতে দেরি হচ্ছিল। বেশ বড় আকারের ফাইল, ফাইলটা ওপেন করলেন।

কোন কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার স্বভাব নেই আবু জামশেদের, এই শব্দটাই তার অভিধান থেকে উঠে গিয়েছিল, ভিডিও ফাইলটা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষন, পরপর কয়েকবার রিওয়াইন্ড করে চালালেন। না, চোখে ভুল দেখছেন না।

মাত্র তিন পেগ খেয়েছেন, কিন্তু তাতেই যে মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেবে ধারনা ছিল না। আসলে মাথা কাজ করছে, কিন্তু শরীর তাতে সায় দিচ্ছে না। ল্যাপটপ বন্ধ করে কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মোবাইল ফোনটা তুলে শাহরিয়ারের নাম্বারে ডায়াল করলেন, সুইচড অফ। তানভীরের নাম্বারে ডায়াল করলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে, এতোক্ষনে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে কাদা, ভাবলেন। তিনটা রিং হওয়ার পর ওপাশে তানভীরের কণ্ঠস্বর পেলেন।

"তানভীর, স্যরি, বিরক্ত করলাম," বললেন তিনি।

"স্যার, বলেন, কোন সমস্যা?"

"আমাকে এখনই ধানমন্ডি যেতে হবে, তুমি আসলে খুব ভালো হতো," আবু জামশেদ বললেন, কথা বলতে বলতে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন, টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করলেন, শার্ট পড়াই ছিল, ট্রাউজারটা বদলে প্যান্ট পরতে হবে, আর জুতো জোড়া। বাসায় ঢুকে কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছেন এখন মনে পড়ছে না।

"জি, স্যার, আমি আসছি।"

"তোমার তো এতোক্ষনে ঘুমিয়ে পড়ার কথা," বললেন তিনি, প্যান্ট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখন।

"স্যার, বই পড়ছিলাম। খুব বদঅভ্যাস। ঘুমানোর আগে বই না পড়লে কিছুতেই ঘুম আসে না।"

"আচ্ছা, ঐ বই যেটা তুমি আমার টেবিলে রেখেছিলে, ওটা তুমি পড়েছ?"

"না, স্যার। শাহরিয়ার দিয়েছিল, পড়ার জন্য। ঐদিনই ভুল করে আপনার টেবিলে রেখে আসি।"

কিছু একটা ভাবলেন তিনি, "ঠিক আছে, আমার যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। আধঘন্টার মধ্যে পৌছাতে পারবে না?"

"জি, স্যার। পারবো।"

"গুড। রাখি তাহলে।"

জুতোজোড়া খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। সোফার তলায় থেকে বের করাটা সহজ ছিল না।

কোনমতে দরজা লাগিয়ে বের হয়ে এলেন যখন, বুঝতে পারছিলেন, আজকে রাতে অ্যালকোহলটা না খেলেই পারতেন। মাথার ভেতর কেমন ভোঁতা শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে একটানা পেটাচ্ছে মগজের ভেতরে।

গাড়ি স্টার্ট দিলেন, এতো রাতে রাস্তা ফাঁকা থাকবে, যদিও তিনি অনেক দূরে থাকেন, তারপরও খুব বেশি সময় লাগবে না।

রিভলবারটা শোল্ডার হোলস্টারে রাখা, দীর্ঘদিন পর অস্ত্র সাথে নিয়ে বের হচ্ছেন। অতীতে যতোবার অস্ত্র নিয়ে বের হয়েছেন, কোন না কোন দূর্ঘটনা ঘটেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেকে সামলাতে পারেন নি, এসব নিয়ে ডিপার্টমেন্টে অনেক ঝামেলা হয়েছে, ক্যারিয়ারটাই হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল, এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসেবে তকমা জুটে গিয়েছিল। সেখান থেকে বের হয়ে আসতে অনেক সময় লেগেছে। তবে আজ কারো প্রান বাঁচানোর জন্য রিভলবারটা সাথে রাখা দরকার। মোবাইল ফোন তুলে নিলেন, বেশ কয়েকটা নাম্বারে ডায়াল করা দরকার, এতো রাতে ওরা সাহায্য করবে কি না জানেন না, এমনকি ফোন রিসিভ নাও করতে পারে, তবু চেষ্টা করতে হবে, খুব জরুরি কিছু তথ্য এখনই দরকার। সকাল হতে অনেক দেরি।

ততোক্ষনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

ভাগ্যভালো প্রথম নাম্বারেই কল রিসিভ হলো, নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন অল্প কথায়, তারপর সাহায্য চাইলেন। মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিলেন। আমি বড্ড বোকা, ভাবলেন তিনি। গাড়ি চলছে, ঢাকার রাস্তা এই মুহূর্তে যানবাহনহীন হলেও এই ফাঁকা রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন লোকজনের উল্টাপাল্টা হাঁটাচলার পরিমান খুব বেশি। কাউকে চাপা না দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছানোই এখন আসল ব্যাপার।

* * *

তানভীর বের হয়েছে রুম থেকে। ঘুমিয়ে পড়লেই হয়তো ভালো হতো, নইলে এই রাত-বিরেতের ঝামেলা করতে হতো না। এমনিতে সব কাজে সাহস থাকলেও মাঝে মাঝে বেশি সাহস দেখাতে যাওয়া ঠিক নয়। সেদিন রাতের এসএমএস'এর কথা মনে পড়ল, তাকে বেশি সাহস দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে। আগে নিজের জান বাঁচানো ফরজ, তারপর অন্যকিছু।

বাসার দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে ডেকে তুলে গেট খুলতে কোন সমস্যা হলো না। মোটরবাইক বের করে শাহরিয়ারের মোবাইলে ডায়াল করল একবার। মোবাইল বন্ধ। চার্জ শেষ সম্ভবত, ধারনা করল তানভীর, স্মার্ট ফোনগুলো অতিরিক্ত চার্জ খায়, কাজের সময়ে বেঈমানি করতে ওদের জুড়ি নেই।

তার বাসা থেকে ধানমন্ডি খুবে বেশি দূরে নয়, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। হেলমেট পরে এতো রাতে এতো জরুরি তলবের মানে কী হতে পারে ধারনা করার চেষ্টা করল তানভীর, পারল না। বসের সম্ভবত মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে এতো রাতে পাগলের মতো বেরিয়ে পড়তো না।

অধ্যায় ৫৯

চোখ খুলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল, হলদেটে আলোটা সরাসরি চোখের উপর এসে পড়ছে। তারপরও সামনে চেয়ারে বসে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল তুষার। মাথা নীচু করে বসে আছে মানুষটা, মুখটা কালো কাপড়ে ঢাকা, এতো নাটকীয়তার কী আছে! যেন নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত একজন মানুষ, মুখ দেখাতেও লজ্জা পাচ্ছে।

নিজেকে একটা কাঠের চেয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করেও আতংক কিংবা বিস্ময় কোনটাই তাকে নাড়া দিল না। মনে হলো, এটাই তো স্বাভাবিক, এরকম কিছুই অপেক্ষা করছিল তার জন্য। চারজন বন্ধু যে পথে গেছে, তার জন্য পথটা অন্যরকম হবে, সেটা আশা করাটা বোকামি। কথা বলার মতো অবস্থা নেই, মুখটা একধরনের টেপ দিয়ে আটকান, এখন কথা বললে সেটা গোঙানির মতো শোনা যাবে নির্ঘাত।

রুমটার দিকে তাকাল এবার। এই রুম তার অতি পরিচিত। গত কয়েকদিন আগেই এই রুমে বসেছিল সে, খুব ঘনিষ্ট এক বন্ধুর সাথে। হ্যা, এই রুমেই মশিউরের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল।

অধ্যায় ৬০

চল্লিশ ওয়াটের বাতির আলোয় মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্তকে কালো দেখাচ্ছে, এখনও চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সিগারেটের শেষাংশ, অ্যাষট্রে, বিভিন্ন ধরনের বোতল, রুমের একপাশে পুরানো টিভিটাও আছে।

বাতিটা নিভে গেল হঠাৎ করেই। সম্ভবত কারেন্ট চলে গেছে, ধারনা করল তুষার। অন্ধকার আশপাশেই ছিল, এখন গ্রাস করে নিয়েছে পুরো রুমটা।

স্থির হয়ে বসে আছে তুষার, শক্ত করে বাঁধা হয়েছে চেয়ারের সাথে, রক্তচলাচল বন্ধ হবার জোগাড়, এখন নড়াচড়া করে শক্তিক্ষয় করার মানে নেই। এরচেয়ে ধীরে ধীরে পরিনতির দিকে এগিয়ে যাওয়া ভালো।

চেয়ারের ক্যাচক্যাচ শব্দ শোনা যাচ্ছে, রুমের মধ্যে হাঁটাচলার শব্দ পেল তুষার, বেশ কিছুক্ষন পায়চারি করে আবার চেয়ারে বসল লোকটা।

পরিচিত কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেল তুষার। যদিও খুব কাছেই আছে মানুষটা, কণ্ঠস্বরটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

"সেদিন রাতের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই তোর," কণ্ঠস্বরটা বলল, "একটা সাধারন লোককে বিনাকারনে মেরে ফেললাম আমরা, শাস্তি কেউ পেল না, শুধু আমি পেলাম, কেন?"

প্রশ্ন করা হয়েছে কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই তুষারের।

"আচ্ছা, আমরা কি কখনো ভেবেছি, লোকটা কে ছিল? কেন এতো রাতে বাইরে গিয়েছিল? তার হাতে যে প্যাকেট ছিল, সেগুলো কিসের ছিল? লোকটার বৌ ছিল? কিংবা ছেলে-মেয়ে?"

বুঝতে পারছে তুষার, মানুষটা তার আশপাশে হাঁটছে, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কাজ হলো না।

"না। আমরা কেউ তা ভাবিনি।"

একটা হাত এসে তার মুখ থেকে টেপটা একটানে তুলে নিল, ব্যথায় ককিয়ে উঠল তুষার, অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও মনে হলো রুমের দ্বিতীয় কেউ আছে।

"সেজন্য এক এক করে আমাদের সবাইকে খুন করতে হবে?" চেঁচাল তুষার।

"খুন করার আগে সবাইকে সুযোগ দেয়া হয়েছে, পাপ স্বীকারের," হাঁটতে হাঁটতে বলল কণ্ঠস্বরটা, "নাকি সুযোগ দেয়া হয়নি?"

"চৌদ্দ বছর আগের একটা ভুলকে পাপ বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না!" নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারছে না তুষার।

"মোটেও না। যখন জেনে শুনে কোন নিরপরাধ মানুষের বুকে গুলি চালানো হয়, তখন সেটা আর ভুল থাকে না।"

"গুলি আমি চালাই নি, তুই চালিয়েছিলি।"

"আমি?"

"হ্যা, তুই।"

"আমাকে নিশ্চয়ই বাধ্য করা হয়েছিল।"

"আমরা পরিস্থিতির শিকার ছিলাম, ঐ পরিস্থিতিতে এরচেয়ে ভালো কোন পথ খোলা ছিল না আমাদের সামনে।"

"পরিস্থিতির শিকার? কি অদ্ভুত!"

পুরো রুমে নীরবতা নেমে এসেছে, হাঁটাহাঁটি চলছে, প্লাস্টিকের বোতল কিংবা আষট্রেতে পায়ের গুতো লাগল কয়েকবার, সিগারেট ধরানো হয়েছে, দেয়াশলাইয়ের আলোয় একটা পরিচিত মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল যেন, সিগারেটের লাল আলো অন্ধকারের মাঝে জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে নিভছে যেন, মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কথা শুনতে পাচ্ছে তুষার। এবার পরিস্কার বুঝতে পারছে রুমে দ্বিতীয় আরেকজনের উপস্থিতি।

কে এই দ্বিতীয় জন! কে!

অধ্যায় ৬১

ধানমন্ডি পৌছাতে বেশি সময় লাগল না। গাড়িটা রাস্তার একপাশে পার্ক করতে করতেই দেখলেন তানভীর চলে এসেছে মোটরবাইক নিয়ে।

গেটের কাছে তিনজন কন্সটেবল থাকার কথা, সেই সাথে শাহরিয়ারেরও। কন্সটেবল তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল তাকে দেখে, এগিয়ে এলো একজন।

"সব ঠিকঠাক তো?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"জি, স্যার।"

"শাহরিয়ার কোথায়?"

"স্যার, উনি চা খাইতে গেছেন অনেকক্ষন হইল," বলল কন্সটেবল, "এখনো আসে নাই।"

"অনেকক্ষন মানে কতোক্ষন?"

"এই ধরেন স্যার, ঘন্টাখানেক," আন্দাজে বলল কন্সটেবল।

"আচ্ছা।"

তানভীর পাশেই দাঁড়ানো, গেটের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন।

"তানভীর, কোথাও একটা ঘাপলা আছে," আবু জামশেদ বললেন, "বাসায় ঢুকতে হবে।"

"আপনি কী সন্দেহ করছেন?"

"আমি সন্দেহ করছি তুষার আহমেদ কোন বিপদে পড়েছে," আবু জামশেদ বললেন, "আমি ভেতরে ঢুকছি, তুমি চারপাশে একটু নজর রাখো।"

"জি, স্যার।"

রাত তিনটার উপর বাজে, গেটের পাশে ছোট রুমটায় বুড়ো দারোয়ান থাকে, ওর ঘুম পাতলা, গেটে কয়েকবার টোকা দিতেই জেগে উঠে আবু জামশেদকে দেখে গেট খুলে দিল।

"এতো রাইতে? ঘটনা কি?"

"আমি ভেতরে যাবো, তুষারকে দরকার।"

"চলেন।"

বাসার দরজার কাছাকাছি এসে যা বোঝার বুঝে ফেললেন আবু জামশেদ। দরজা খোলা। ড্রইং রুমের বাতি জ্বলছে।

দারোয়ানের দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি।

"এই বাড়ি থেকে বের হওয়ার আর কোন পথ আছে নাকি?"

"না, নাই তো, কেন?"

"ভেবে বলেন, আমাদের হাতে সময় খুব কম।"

"পেছনের দিকে ছোট একটা দরজা আছে, ঐটা তো বন্ধ থাকে।"

"তুষার কি ঐ দরজা চেনে?"

"চিনবে না ক্যান? সে তো এই বাড়িরই পোলা।"

"আমাকে নিয়ে চলেন," বললেন আবু জামশেদ।

বুড়ো দারোয়ানের পেছন পেছনে এগিয়ে গেলেন তিনি। বাসার পেছনের দিকটা ঝোপ-ঝাড়ে ভরা, সাপ-খোপ থাকাটাও বিচিত্র নয়। সাবধানে পা ফেলে কিছুক্ষনের মধ্যে পুরানো দরজাটার সামনে দাঁড়ালেন। একটা তালা লাগানো ছিল, সেটা নীচে পড়ে আছে, পাশে একটা ইটের টুকরো। দরজাটা খুললেন তিনি। শুনশান একটা রাস্তা চোখে পড়ল। এখান দিয়েই পালিয়েছে তুষার, কোন সন্দেহ নেই।

এই মুহূর্তে শাহরিয়ারের খোঁজ দরকার। ও কি কোনভাবে তুষারের উদ্দেশ্য টের পেয়েছিল? টের পেলে কেন বাকি তিনজন কন্সটেবলকে সাথে নেয় নি? কিংবা তাকেও তো একটা কল দিতে পারতো। উল্টো ওর মোবাইল এখন সুইচড অফ আসছে।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এই সময়। এতো তাড়াতাড়ি ফোন আসবে আশা করেননি। রিসিভ করলেন।

"হ্যা, বলো?"

"স্যার, যে নাম্বারটা দিয়েছিলেন, সেটা রাত দুটোর একটু পর বন্ধ হয়েছে," ওপাশ থেকে বলল একজন।

"লোকেশন?"

"ধানমন্ডি।"

"আচ্ছা। শেষ কোন কোন নাম্বারে যোগাযোগ হয়েছে?"

"রাত দুটোর দিকে শেষ কলটা এসেছিল। সেই নাম্বারটা আমরা ট্র্যাক করতে পেরেছি।"

"লোকেশন?"

"সোবহানবাগ, ওখানে..."

"আর বলতে হবে না, থ্যাঙ্কস," বললেন আবু জামশেদ, "আমি সত্যিই আশা করি নি এতো দ্রুত রেজাল্ট পাবো।"

"ওয়েলকাম, স্যার!"

ফোন রেখে দিলেন পকেটে। সোবহানবাগের লোকশন তিনি চেনেন, শেষ খুনটা ওখানেই হয়েছিল। মশিউরের বাসা।

দৌড়ে মেইন গেটের কাছে চলে এলেন। ইশারায় তানভীরকে মোটরবাইক স্টার্ট দিতে বললেন।

"কোথায় যাবো, স্যার?" জিজ্ঞেস করল তানভীর।

"মশিউরের বাসায়, এক্ষুনি," হাঁপাচ্ছিলেন তিনি, অ্যালকোহলের প্রভাব এখনো কাটেনি, শরীরটা এখনো নিজের নিয়ন্ত্রনে নেই।

ফাঁকা রাস্তা। বেশি সময় লাগার কথা নয়। তানভীর গাড়ি চালাচ্ছে দ্রুত গতিতে। আরেকটা খুন হতে চলেছে। সময়মতো পৌছালে হয়তো বাঁচানো যাবে তুষারকে।

অধ্যায় ৬২

রুমের বাতি জ্বলছে এখন, আসলে কারেন্ট যায়নি, রুমের বাতিটা নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল কিছুক্ষনের জন্য। সুইচ অন করেছে যে তাকে দেখে কিছুক্ষনের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলল তুষার। এই সেই দ্বিতীয় জন!

এই ছেলের নাম শাহরিয়ার, হোমিসাইডের ডিটেকটিভ!

তাকিয়ে আছে তার দিকে, সরু দৃষ্টিতে, যেন নর্দমার কোন প্রাণী দেখছে অনুবীক্ষন যন্ত্রে।

শাহরিয়ারের পাশে যে মানুষটা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল এতোক্ষন, যার সাথে অনেক কথা হয়েছে, কালো কাপড়টা সরিয়ে নিল ধীরে ধীরে। রাতে বাসায় টেলিফোনে কথা হয়েছিল এর সাথে, পরিচিত কণ্ঠস্বরটার অপরিচিত মালিককে দেখে রীতিমতো চমকে উঠল তুষার।

একটু আগের কথোপকথনটা মনে করল তুষার। টেলিফোন নাম্বারে কল আসার পর থেকেই নিশ্চিত ছিল, আরিফের সাথে কথা হচ্ছে তার। কিন্তু এতো আরিফ নয়। অথচ হুবহু আরিফের কণ্ঠ। আর চেহারা? হ্যা, এই চেহারাও সে দেখেছে, আজকেই দেখেছে। অথচ...

"কী, ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?" আরিফের মতো কণ্ঠস্বরের ছেলেটা বলল।

"তুমি কে?"

"আমি কে? আমরা কে? এসব কেন হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বাকি কেউ পায় নি, তবে আপনি পাবেন।"

"আমি কী স্পেশাল?"

"অবশ্যই না। তবে কথা হচ্ছে, শেষ কাজটা আমরা একটু সময় নিয়ে করতে চাই। সেজন্যই এই প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়েছে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।"

"তোমার নাম শাহরিয়ার না? তুমি হোমিসাইড ডিটেকটিভ না? তার মানে এর সাথে সরকারি সংস্থা জড়িত?"

এগিয়ে এলো শাহরিয়ার, তুষারের ঠিক মুখের সামনে নিজের মুখ রাখল।

"হ্যা, আমার নাম শাহরিয়ার। শাহরিয়ার জামিল। আমি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ। কিন্তু এর সাথে সরকারি সংস্থা জড়িত নয়, এটা হচ্ছে পুরোপুরি বেসরকারি তদারকিতে," বলে হাসল শাহরিয়ার, "সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার কারনে কোন কাজ আমি নিজ হাতে করতে পারিনি। কিন্তু এই কাজটা আমি নিজ হাতে করবো।"

"কোন কাজ?"

এবার ঘর ফাটিয়ে হাসল দুজন। দুলে দুলে হাসছে, যেন খুব মজার কোন কৌতুক বলে ফেলেছে তুষার।

ওদের দুজনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তুষার। দুজন দেখতে প্রায় একই রকম, চেহারা, আকৃতি, চুলের ধরন, এমনকি কণ্ঠস্বরও। তবে কোথাও একটু পার্থক্য আছে। সেটা কী ধরতে পারছিল না।

"তোমরা কি চাও?"

নিজেদের মধ্যে কোন একটা পরামর্শ করে নিল দুজন। তারপর তুষারের দিকে ফিরল শাহরিয়ার।

"পুরোটা আমি বলবো না, ও বলবে, ঠিক আছে?"

উত্তর দিলো না তুষার। শাহরিয়ারকে এর আগেও দেখেছে, কখনো অস্বাভাবিক মনে হয়নি, অথচ এখন মনে হচ্ছে ছেলেটা মানসিক রোগী।

"ঘটনার শুরু অনেক অনেক বছর আগে," আরিফের মতো কণ্ঠস্বরের ছেলেটা বলল, "শুরুতেই আমাদের পরিচয় দিয়ে নিই। আমি তাহের, তাহের জামিল, কাগজপত্রে আমার নাম তাহেরুল ইসলাম, আর ও আমার ভাই, শাহরিয়ার জামিল। আমরা দুজন যমজ নই, বয়সের তফাৎ মাত্র এক বছরের, দেখতে আমরা খুব কাছাকাছি। আমাদের দুজনের তফাৎ খুব সামান্য। আপনি জানেন, তফাৎটা কোথায়?"

"না, জানি না।"

"তফাত হচ্ছে, আমাদের চোখে। ওর চোখ কালো, আমার চোখ নীল। এই দিয়েই আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারতো সবাই।"

"আচ্ছা।"

"যাক, এবার কাহিনীতে আসি," বলল তাহের, "আমার বাবা ছিলেন সামান্য স্কুল শিক্ষক, পাশাপাশি তিনি ছিলেন কবি মানুষ, জীবনানন্দ ধরনের কবি, ফুল পাখি, চাঁদ, নদী এসবে তার খুব আগ্রহ ছিল, সংসারের উপর বেশি আগ্রহ ছিল না, উনি বেশ দেরি করে বিয়ে করেন, আমাদের মায়ের বয়স কম ছিল।"

"আচ্ছা।"

"কথার মাঝখানে আচ্ছা আচ্ছা বলে বিরক্ত করবেন না," বলে একটু থামল তাহের, "তো, ঘটনা হলো, সেই বিশেষ রাতের কথা আপনার মনে আছে তো?"

"কোন রাতের কথা বলছো?"

চুপচাপ কিছুক্ষন তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল তাহের, তারপর চেয়ার থেকে উঠে এসে একটা চড় বসাল।

"এবার মনে পড়েছে?"

উত্তর দিলো না তুষার, মাথা ব্যথা করছে। রাগে গা কাঁপতে শুরু করেছে, এতো ছোট একটা ছেলের হাতে চড় হজম করা কঠিন।

"সেই রাতে, আমার বাবা, যিনি কিনা সব কিছু ভুলে যান, বেশ রাত করে ফিরলেন বাসায়, ফিরেই দেখলেন আমার মায়ের খুব খারাপ অবস্থা, বুকের ব্যথা বেড়েছে, বাসায় কোন ওষুধ-পথ্য নেই। অল্প কিছু টাকা নিয়ে সাথে সাথেই বেরিয়ে

যান তিনি, বৃষ্টির মধ্যে। আমরা দুই ভাই তখন ছোট, নয়-দশ বছরের। আমরা সারারাত মা'র কাছে রইলাম। ভোরে মারা গেলেন মা। তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল সে রাতে। আমাদের বাবা আর ফিরলেন না।"

এই পর্যায়ে থামল তাহের, শাহরিয়ারকে ইশারা করল।

"আমরা দুই ভাই, গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে আমাদের ছোট বাড়ি," শাহরিয়ার শুরু করল, "কাউকে খবর দিতে পারলাম না, তাহের ছোট ছিল, ওর কোন হুঁশ ছিল না। আমি বড় ছিলাম, কী করবো ভাবতে ভাবতে সারাদিন চলে গেল। আমরা দু'ভাই সারাদিন মায়ের লাশ নিয়ে পড়ে রইলাম আর বাবার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলাম।"

"সন্ধ্যার আগে আগে পাশের বাড়ি থেকে রহিমা'র মা এলো, আমাদের খবর নিতে," শাহরিয়ার বলছিল, "এসে দেখলে বিছানায় লাশ নিয়ে বসে আছি আমরা, বাবার অপেক্ষায়। বাবা আসেনি। সেই রাতেই কোনমতে লাশ দাফনের ব্যবস্থা হলো। আমরা বাসায় ফিরলাম, অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন মায়ের মৃত্যুর খবর জানতো না, জানলেও আসতো কি না সন্দেহ। কোন এক কারনে আমার বাবা আর মা'কে তাদের পরিবার থেকে বয়কট করেছিল। কাজেই আমরা দুইভাই একা হয়ে পড়েছিলাম।"

তুষার শাহরিয়ারকে দেখছিল, ছেলেটা কথা বলতে বলতে বেশ আবেগপ্রবন হয়ে পড়েছে। গলার স্বর ভারি লাগছে।

"টানা দশদিন আমরা ঐ বাসায় ছিলাম, বাসায় খুব বেশি কিছু ছিল না, এরপর থাকতে হলে না খেয়ে থাকতে হতো। দশ দিন পর আমাদের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেন, বাবা যে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তার এক সহকর্মি।"

"আমাদের দুজনের স্থান হয় এক সরকারি এতিমখানায়," শাহরিয়ার বলল, "আমি পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম তাহেরও যেন তাই করে। কিন্তু ও চলে গেল আমার নাগালের বাইরে। পুরো এতিমখানা আর তার আশপাশটা জ্বালিয়ে খেল।"

"তুমি যা বলছো, পুরোপুরি সত্যি না," তাহের প্রতিবাদ করলো পাশ থেকে।

"তুই ঐ বয়সেই গাঁজা খেতি, বিক্রি করতি, শেষে এক লোককে ছুরি মারলি, মনে নেই?" শাহরিয়ার বলল, এবার তাকাল তুষারের দিকে, "শেষে এতিমখানা থেকে ওকে পাঠানো হয় গাজীপুর কিশোর সংশোধানাগারে। ওখানেও একের পর এক ঝামেলা করে চলছিল। আমরা দুই ভাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।"

"এভাবেই চলছিল। আমরা দুজন দুদিকে বড় হলাম। মাঝে মাঝেই কল্পনা করতাম আমাদের বাবা ফিরে এসেছেন, আমাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন এতিমখানা থেকে। তা হয়নি," শাহরিয়ার বলল, "খুব কষ্টে একেকটা দিন কাটছিল। খাবারের অভাব ছিল প্রচন্ড, ছিল দূর্ব্যবহার, ছিল অসভ্য আচরন, মাঝে মাঝে মনে হতো কী হবে বেঁচে থেকে। সেই কম বয়সেই আত্মহত্যার কথা মনে হতো। কিন্তু আত্মহত্যা

মহাপাপ, তাই না তাহের?"

সায় দিল তাহের।

"আমি পড়াশোনা শুরু করলাম। ভালো রেজাল্ট নিয়ে স্কুলের পরীক্ষা শেষ করে কলেজে ভর্তি হলাম, টিউশনি শুরু করলাম, নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা চলল এই সময়ে, মাঝে মাঝে তাহেরের খোঁজ খবর নিতাম, দেখলাম ও পুরোপুরি অন্যরকম হয়ে গেছে, মাস্তানী, গুন্ডামি ছাড়া কিছু বোঝে না। কেড়ে খেতে শিখে গেছে, তাই ধীরে ধীরে যাওয়া-আসার পরিমান কমিয়ে দিলাম। কলেজ শেষ করে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে, টাকা-পয়সা রোজগার করা শুরু করেছিলাম টিউশনি থেকে, একটার পর একটা টিউশনি করাতাম, সেই টাকা দিয়েই যাবতীয় খরচ চলছিল আমার। ইউনিভার্সিটিও পাশ করবো এমন সময় হাতে এলো জিনিসটা। জিজ্ঞেস করুন, কি জিনিস?"

"কি জিনিস?"

"একটা বই। খুব উপন্যাস পড়তাম সেইসময়ে। অদ্ভুত নামের একটা উপন্যাস হাতে আসে। পড়ে ফেলি দ্রুত। বাবার জন্য মনে মনে একটা অপেক্ষা সবসময়ই ছিল, কিন্তু ঐ উপন্যাসটা পড়ার পর মনে হলো, অপেক্ষা শেষ হয়েছে, আমাদের বাবা আর কখনোই ফিরে আসবে না।"

"উপন্যাসের নাম কি? কে লিখেছে?"

""রক্তনীল সুখ" অদ্ভুত নাম, তাই না? লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে, কাজেই তাকে খুঁজে বের করার জন্য আলাদা মিশনে নামলাম আমরা দুই ভাই। কাজটা খুব কঠিন ছিল, কারন প্রকাশকও জানতেন না আসল লেখক কে।"

"তাহলে লেখককে খুঁজে বের করলে কি করে?"

"কাজটা খুব কঠিন ছিল," শাহরিয়ার বলল, "তবে খুব কঠিন কাজের সমাধান খুব সহজ। কোনমতে প্রকাশকের ফেসবুক আইডি জোগাড় করি আমি, তারপর প্রফেশনাল হ্যাকার দিয়ে ঐ আইডিতে ঢুকে ইনবক্সে অদ্ভুত একটা মেসেজ পাই। যে আইডি থেকে ম্যাসেজটা এসেছিল, সেটা খুঁজে বার করতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি। তবে আইডি'র পেছনের লোকটাকে চিনতে পেরে অবাক হয়েছিলাম।"

"কে সে?" জিজ্ঞেস করল তুষার।

"আপনার ঘনিষ্ট বন্ধু, আরিফুল হক। তিনি ছদ্মনামে বইটা লিখেছিলেন, ঘটনার বিবরনগুলো ছিল একদম বাস্তব। ঘটনায় যে লোকটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তার বর্ণনার সাথে আমার বাবার ছিল হুবহু মিল। আমরা তাকে খুঁজে বের করলাম। তিনি একা থাকতেন, ঢাকায়, বাসায় ছোট একটা কাজের লোককে নিয়ে। ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাহেরকে ঢোকালাম কাজে। ধীরে ধীরে তাহের তার আস্থা অর্জন করলো, একসময় তিনি প্ল্যান করলেন ঢাকার বাইরে চলে যাবেন, নিজের টাকা দিয়ে বাড়ি বানাবেন। বাড়ি তৈরির পুরো কাজটা তাহেরই করলো।"

"তারপর?"

"আমাদের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল। নিশ্চিত ছিলাম না, উপন্যাসের ঐ ঘটনার সাথে সত্যিই আমাদের কোন যোগসূত্র আছে কি না। মানে ঘটনাটা সত্যি কি না এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এক রাতে প্রমান পেয়ে গেলাম।"

"কিভাবে?"

"মদের নেশায় গড়গড় করে পুরো কাহিনী বলে দিলেন তিনি তাহেরকে। এই প্রথম আমরা নিশ্চিত হলাম, ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে। বইয়ের চরিত্র যেমন হামিদ, আজমত, রুমি আর তুর্য্য কে, জেনে গেলাম আমরা। আমাদের বাবার বুকে গুলি চালিয়েছিল কে সেটাও জানলাম।"

"আরিফ কার কথা বলেছে?"

"আপনার কথা বলেছে।"

"তারপর?"

"ততোদিনে আরো দু'বছর পার হয়ে গেছে। আমার পড়াশোনা শেষ হলো। তাহের থাকছে আরিফুল হকের সাথে। এবার আমাদের প্ল্যানিং শুরু হলো।"

"কিসের প্ল্যানিং?"

"আমাদের শৈশবটা যাদের কারনে হারিয়ে গেছে, যে কারনে অনাথ হিসেবে বড় হয়েছি আমরা, তাদের শাস্তি দেয়ার প্ল্যানিং।"

"ফোনকলগুলো করেছিল কে?"

"তাহের, এসব কাজে ও ওস্তাদ। আর আমি ততোদিনে হোমিসাইডে জয়েন করতে যাচ্ছি। চাইলেও এসব কাজে নামা সম্ভব না।"

"আচ্ছা, তাহলে আরিফকেও হুমকি দেয়া হলো কেন? সে তো নিজেকে নিরপরাধ দাবি করে।"

"শুরুতে লেখক সাহেবের উপর আমার রাগ ছিল না, তিনি ছিলেন পরিস্থিতির শিকার, কিন্তু তাহের অন্যরকম ভাবল, ও একটা চিঠি লিখল।"

"অন্যরকম ভাবার কারন?"

"সেটা তাহেরকেই জিজ্ঞেস করুন," শাহরিয়ার বলল।

"একটা ভুল তথ্য দিয়েছিলেন তিনি বইয়ে। বলেছিলেন, গুলি করেছিল তুর্য্য। কিন্তু আমার ধারনা বাবার বুকে গুলিটা উনি চালিয়েছিলেন, সবসময় একটা অপরাধবোধ দেখেছি তার মধ্যে। এছাড়া..." তাহের বলল।

"এছাড়া?"

"তিনি যদি এতোই নিরপরাধ হতেন, তাহলে পরবর্তিতে পুলিশের কাছে গেলেন না কেন? কেন চেপে গেলেন? কেন এটাকে একটা মুখরোচক থৃলার গল্প বানালেন?"

"গুলিটা কি আপনিই ছুঁড়েছিলেন? না আরিফুল হক? সত্যি কথা বলবেন," শাহরিয়ার বলল এবার, তুষারের উদ্দেশ্যে।

"গুলি যেই ছুঁড়ুক, তোমরা কাউকে ছাড় দাও নি, আমাকেও নিশ্চয়ই দেবে না," তুষার বলল।

দুই ভাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন তার দিকে, তারপর হেসে উঠল হো হো করে।

"আপনার বুদ্ধি আছে, ঠিক ধরেছেন," তাহের বলল, "চাইলে আরিফুল হককে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম, কিন্তু সেটা ঠিক হতো না। আর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই উঠে না।"

"আর কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা? আমি তো ভেবেছি আরিফ বেঁচে আছে, এসব কিছু সেই করাচ্ছে।"

হাসল তাহের, "আমি মিমিক্‌রিতে ওস্তাদ। দীর্ঘদিন একটা লোকের সাথে থেকেছি, সে কিভাবে কথা বলে, হাসে-কাঁদে সব হুবহু নকল করতে পারি, শুনবেন আরো?"

"না।"

"এনিওয়ে, আমাদের গল্প শেষ, আপনার আর কিছু বলার আছে?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

"শেষ প্রশ্ন, আমাকে শুরুতে সাতদিন সময় দেয়া হয়েছিল, রুবেল, আজমলকেও তাই। এই সাতদিনের আলাদা কোন মানে আছে?"

"কোন মানে নেই," শাহরিয়ার বলল, "আমরা একটা আতংক তৈরি করতে চেয়েছিলাম, সফল হয়েছি বলা যায়।"

"তুমি হোমিসাইডে কাজ করো, এতোক্ষনে নিশ্চয়ই পুলিশ সব জেনে গেছে, তোমার বস নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজছে। আমাকে মেরে খুব বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে হয় না।"

"সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আপনি নিজের চিন্তা করুন।"

শাহরিয়ার আর তাহের নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সম্ভবত, কাজটা কে করবে, ভাবল তুষার।

বাইরে কোথাও কোন একটা শব্দ হলো, দুই ভাই কান পাতল শব্দটা আবার হচ্ছে কি না শোনার জন্য। শাহরিয়ার দরজার দিকে এগুলো, খুব সাবধানে পা ফেলে। তাহের কালো চকচকে একটা ছুরি বের করে এনেছে, যেটা তার কোমরে গোঁজা ছিল এতোক্ষন। তুষারের গলা তাক করে আছে ছুরিটা। একটু এদিক-সেদিক হলেই বসিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।

নিজস্ব কোন চিন্তা মাথায় আসছে না তুষারের। সেই বৃষ্টি ভেজা রাতের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। সে এক ভয়ংকর রাত ছিল, আজকের রাতটাও ঠিক একই রকম ভয়ংকর। সে রাত তবু শেষ হয়েছিল, ভোর এসেছিল, কিন্তু এই রাতের শেষ হবে না। এটাই শেষ রাত।

অধ্যায় ৬৩

তানভীরের পেছনে বসে পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করছিলেন আবু জামশেদ। এসব ঘটনার সাথে শাহরিয়ারের যোগসূত্রটা কোথায় বুঝতে পারছিলেন না। তবে যোগসূত্র অবশ্যই আছে এবং এই খুনগুলোর প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শাহরিয়ার জড়িত।

ঠিকানাটা চেনে তানভীর, তিনিও চেনেন, এর আগে এসেছেন, তবে অন্য কাজে। মশিউরের লাশ পাওয়া গিয়েছিল এই বাড়িতেই। মোবাইল নাম্বার ট্র্যাকিং এ ভুল দেখায় নি এটা নিশ্চিত। শাহরিয়ারকে ফোন করা হয়েছে এই লোকেশন থেকে এবং তুষারকেও সম্ভবত এখানেই নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়িটা ফাঁকা, মশিউরের বড় ভাই বিদেশ থাকে, একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদেও সে আসেনি।

এই বাড়িতে ভবিষ্যতে কেউ থাকবে সে সম্ভাবনাও নেই। মশিউরের বড় ভাই হয়তো কোন এক সময় বিক্রি করে দেবে, ঢাকার বুকে এমন একটা জায়গায় একতলা একটা বাড়ির অবস্থান অপচয় ছাড়া আর কিছুই না। মশিউর কেন ডেভেলপারের হাতে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে গোটা কতেক ফ্ল্যাট নিয়ে আরামে দিন কাটায় নি সেটা একটা বিস্ময়।

বাইরের গেটটা যথারীতি তালা দেয়া। তানভীরকে মোটরবাইক একপাশে সরিয়ে রাখার জন্য ইশারা করলেন।

এই গেট দিয়ে ঢোকা যাবে না, দেয়াল টপকে ঢুকতে হবে। দেয়ালের চারপাশে হাঁটলেন, পাঁচ ফুটের মতো উঁচু দেয়াল, তানভীরকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

"আমি ভেতরে যাচ্ছি, তুমি বাইরেটা দেখবে," নীচু গলায় বললেন তিনি।

"আমরা পুলিশের সাহায্য নিচ্ছি না কেন? চাইলে ব্যাকআপ চলে আসবে," তানভীর বলল। তাকে কিছুটা ভীত মনে হচ্ছিল।

"জানি না ভেতরে আসলেই কিছু হচ্ছে কি না, শুধু শুধু ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি," বললেন তিনি, "একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে।"

কোন কষ্টের কথা বলছেন বুঝতে সমস্যা হলো না তানভীরের। তার কাঁধের উপর ভর করেই দেয়াল টপকাতে চাইছে বস, এতে আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। এমনিতে বস দেখতে শুকনো হলে কি হবে, ওজন কম নয়, ধারনা করল তানভীর।

দেয়ালের সামনে গিয়ে নীচু হয়ে বসল, তার দুই কাঁধে পা রেখে সহজেই দেয়ালের উপর উঠে পড়লেন আবু জামশেদ। তার এক হাতে একটা রিভলবার চলে এসেছে, নীচের দিকে তাকালেন, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু। যতোটা সম্ভব ধীরে

লাফ দিলেন তিনি, খুব একটা লাভ হলো না তাতে শব্দ হলো ধুপ করে। বেশ কিছুক্ষন জায়গাটায় স্থির হয়ে বসে রইলেন, দৃষ্টি উঠোন পেরিয়ে ড্রইং রুমের দরজার দিকে। ভেতরে আলো জ্বলছে, তার মৃদু রেখা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

কোন শব্দ যাতে না হয় সেভাবে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজার দিকে রিভলবার তাক করে রেখেছেন, উল্টোপাল্টা কিছু দেখলে গুলি করতে দ্বিধা করবেন না, এমনিতেই তার রেপুটেশন খারাপ, আরেকটু খারাপ হলে কিছু যায় আসে না।

অতি সন্তর্পনে হেঁটে বারান্দায় উঠে এলেন। ভেতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, কান পাতলেন তিনি, অস্পষ্ট শব্দ, বুঝতে পারলেন না কে কথা বলছে কিংবা কী নিয়ে কথা হচ্ছে। দরজার একপাশে নিজেকে আড়াল করলেন, ভেতরে খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই আঘাত হানতে হবে, কয়জন আছে ভেতরে তাও বোঝা যাচ্ছে না, মনে হলো, তানভীর ভুল বলে নি, কয়েকজন পুলিশ সদস্য সাথে করে নিয়ে আসার দরকার ছিল।

দরজাটা খুলে যাচ্ছে, কালো, লম্বা ছায়ার মতো একটা শরীর বেরিয়ে আসছে ড্রইং রুম থেকে। রিভলবারটা উঁচু করে ধরলেন তিনি।

শাহরিয়ার সতর্ক ছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি ঠিক দরজার পাশেই ওৎ পেতে বসে আছেন আবু জামশেদ, তার বস।

দুই হাত উঁচু করে ঘরের ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করলেন তিনি শাহরিয়ারকে। ওকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে অপরিচিত কেউ, এই ছেলের সাথে আগে কখনো তার দেখা হয়নি।

ঘরের ভেতর অল্প আলোয় যা দেখলেন তাতে খুব একটা অবাক হলেন না, তুষার আহমেদ চেয়ারে বন্দী, তার গলায় বেশ বড়সড় একটা ছুরি ধরে বসে আছে অন্য একজন শাহরিয়ার, দেখতে হুবহু শাহরিয়ারের মতোই, তবে শাহরিয়ার চুল কেটেছে আর এই ছেলের চুল বেশ বড়, কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

"শাহরিয়ার, আমি কোন সিন ক্রিয়েট করতে চাই না," নরম গলায় বললেন আবু জামশেদ, "ওকে ছুরিটা ফেলে দিতে বলো।"

"ও আমার কথা শোনে না," শাহরিয়ার বলল।

"যেমন?"

"আমি চাই নি আরিফুল হককে মেরে ফেলুক, এমনিতেই যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছিল লোকটা," শাহরিয়ার বলল।

"ঐ শাস্তিতে কাজ হয়নি," এবার তাহের বলল, "ব্যাটা খুব বিখ্যাত হয়ে গেল, লিখে, লাখ লাখ টাকা ইনকাম করল, বাড়ি বানালো। তাহলে এটাকে শাস্তি বলো কোন দিক দিয়ে? হু?"

"তুই যে আব্দুর রহমানকে মারলি? ওটার কী কোন দরকার ছিল?" শাহরিয়ার প্রশ্ন

করল এবার, তাহেরকে।

দৃশ্যটা অবাক হয়ে দেখছিলেন তিনি, একই মানুষ যেন নিজের সাথেই ঝগড়া করছে।

"ঐ বানচোদ গাজীপুরে থাকার সময় আমারে বহুত জ্বালাইছে, জায়গামতো পাইলাম, পুরান হিসাব মিটাই দিছি," তাহের বলল, তার হাতে এখনো ছুরিটা, তুষারের ঠিক গলায় বসানো, একটু এদিক-সেদিক হলেই গলা কেটে যাবে ধারাল জিনিসটায়।

"আর আজ দুপুরে? দিনে-দুপুরে রাস্তায় এতো লোকজনের মাঝখানে গুলি করে কেউ? তোর আসলেই কোন আক্কেল নাই।"

"সামনে পাইয়া কন্ট্রোল করতে পারি নাই, ভাই," তাহের বলল, "মাঝখানে ঐ বইন জামাই না পড়লে ঠিকই গুলি লাগতো।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন তিনি, কিছু একটা করতে চাইছে দু'জন মিলে, তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, যাতে যে কোন সময় উল্টাপাল্টা কিছু একটা করে ফেলতে পারে।

"ঐ পিস্তলটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন আবু জামশেদ।

"আছে, কোথাও," শাহরিয়ার বলল, "ও আসলে পিস্তলের বদলে ছুরি-চাপাতিতেই অভ্যস্ত। রক্তারক্তি আমার মোটেও ভালো লাগে না, কিন্তু সুযোগ পেয়ে ও ছাড়েনি। তিনজনের পায়ের গোড়ালি কেটেছে বসে বসে। চিন্তা করে দেখুন, একটা সাইকোপ্যাথ আমার এই ভাইটা।"

"তোমার ভাই?"

"হাসালেন, স্যার, চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমরা একই মায়ের পেটের ভাই!" শাহরিয়ার বলল, "আপনি তাহেরের খোঁজ করছিলেন না? এই হচ্ছে তাহের।"

"তোমরা যমজ?"

"না, আমি বড়, এক বছরের। আমরা দেখতে খুবই কাছাকাছি।"

"যাক, তোমাদের ফ্যামিলি স্টোরি শোনার সময় আমার নেই, ওকে বলে দাও ছুরি ফেলে দিতে," আবু জামশেদ বললেন।

"স্যার, আপনার হাত কাঁপছে কেন?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার।

রিভলবার ধরা হাতটার দিকে তাকালেন তিনি, সত্যি সত্যি হাত কাঁপছে, অ্যালকোহল জীবনে অনেক খেয়েছেন, এরকম প্রতিক্রিয়া কখনো হয়নি, নেশা কাটেনি এখনো, মাথা কাজ করলেও শরীর পুরোপুরি তার বশে নেই। তিনি রিভলবার তাক করে আছেন শাহরিয়ারের দিকে, তবে সেসবের তোয়াক্কা না করে লাফ দিল শাহরিয়ার, ট্রিগারে চাপ দেবার আগে চোখের কোনে তাহেরের নড়াচড়া ধরা পড়ল।

বুঝতে পারছেন তীরের মতো গতিতে ধারাল ছুরিটা এগিয়ে আসছে তার দিকে, সরে যাওয়ার সময় পেলেন না, ট্রিগারে চাপ পড়ল একই সময়ে। বদ্ধ ঘরে বুলেটের শব্দ বোমার আওয়াজের মতো ফাটল যেন।

বুকের ডানদিকে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলেন, গরম তরলে হাত ভিজে যাচ্ছে, ছুরিটা শক্ত হয়ে গেঁথে গেছে। চোখে অন্ধকার দেখা শুরু করলেন, বুঝতে পারলেন শাহরিয়ার দৌড়ে যাচ্ছে কোথাও, চিৎকার করে।

মেঝেতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছেন তিনি, ঝাপসা চোখে চেয়ারে বাঁধা তুষারকে দেখলেন, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শাহরিয়ার তাহেরকে ধরে বসে আছে।

কিছুক্ষনের মধ্যে উঠে এলো এবার শাহরিয়ার, ধীর পায়ে, শক্ত মেঝেতে প্রতিটি পদক্ষেপ পরিস্কার শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, ওর মুখটা পরিস্কার দেখতে পেলেন, কোমর থেকে অতি ধীরে একটা পিস্তল বের করে এনেছে, পিস্তলের কালো নলটায় গভীর অন্ধকার দেখতে পেলেন, ঐ অন্ধকার থেকে মৃত্যুদূত এসে নিয়ে যাবে তাকে অনেক দূরে কোথাও।

পিস্তলের শীতল নলটা কপালের ঠিক মাঝখানে অনুভব করলেন। এবার ট্রিগারে চাপ দেয়া বাকি। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। গভীর ঘুম প্রয়োজন ছিল তার অনেকদিন ধরে। সে প্রয়োজনটা এবার চিরদিনের মতো মিটতে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৬৪

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে যেতে দেখেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না তুষারের, শাহরিয়ার হঠাৎ করে লাফ দেয়ার সাথে সাথে দুই ভাইয়ের মধ্যে যে ইশারা হলো, সেটা খুব ভালো বোঝাপড়ার ফল। তাহেরের হাত একদম নিখুঁত, ঠিক বুক বরাবর গেঁথে ফেলেছে সে তার শিকারকে, কিন্তু বিনিময়ে সে নিজেও অক্ষত থাকল না। আবু জামশেদের রিভলবার থেকে ছুটে আসা বুলেট ঠিক তার কপাল ভেদ করে চলে গেল। এই বয়সেও ভদ্রলোকের রিফ্লেক্স এতো দ্রুতগতির তা কল্পনাও করা যায় না। তাহের মারা গেল সাথে সাথেই। ওর মাথার পেছনটায় বেশ বড়সড় গর্ত হয়ে গেছে, রক্ত ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিয়েছে তুষারের মুখ।

শাহরিয়ারকে একদৃষ্টিতে দেখছিল তুষার, ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে মাতম করার মতো সময় ছেলেটার হাতে নেই। কোমরের পিস্তল বের করে আবু জামশেদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরিত চোখে সব দেখছিল তুষার, জানে আবু জামশেদের কাজ শেষ করার পর তার দিকেই এগিয়ে আসবে শাহরিয়ার।

টানা মিনিট দুয়েক আবু জামশেদের কপালে পিস্তল ধরে রইল শাহরিয়ার, তারপর উঠে এলো। তুষারের সামনে এসে দাঁড়াল।

"ও খুব ভালো ছেলে ছিল," শাহরিয়ার বলল, "আমিও খুব ভালো ছেলে ছিলাম। খুব ছোট একটা পরিবার ছিল আমাদের। আপনারা কয়েকজন বন্ধু মিলে সব শেষ করে দিলেন।"

"আমি অপরাধি," তুষার বলল, "সে রাতে যা ঘটেছে অতিরিক্ত নেশার কারনে ঘটেছে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার আর কিছু বলার নেই।"

"আমার জীবনটা একদম বদলে গেল, সুস্থ সহজ স্বাভাবিক মানুষের জীবনে আর কখনোই ফিরতে পারবো না," শাহরিয়ার বলল, পিস্তলটা গুঁজে রাখল প্যান্টের পেছনে।

"আমি তোমাকে দেখি নি, শুধু তাহের ছিল," তুষার বলল।

হাসল শাহরিয়ার, ওকে দেখে এখন খুব নরম, ভদ্র, আর শান্ত ছেলে মনে হচ্ছিল, ঠিক প্রথমবার যেদিন বাসায় এসেছিল সেদিনকার মতো। একটু আগের শাহরিয়ার হারিয়ে গেছে যেন কোথায়।

বাইরে গেটে শব্দ শোনা যাচ্ছে, এতো রাতে গুলির আওয়াজে চারপাশে শোরগোল পড়ে গেছে।

"সবকিছুর ক্ষমা হয় না," শাহরিয়ার বলল, "আমি আসি।"

শাহরিয়ার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একা একা পড়ে রইল তুষার। খুব কান্না পাচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে, তবে সেই জীবনের দাম দিতে হয়েছে অন্য মানুষকে।

আবু জামশেদের পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকাল। সাহসি একজন মানুষ, এরকম মানুষকে সম্মান করা যায়।

* * *

রাত চারটার আগেই অ্যাম্বুলেন্স চলে এলো, তানভীর সব জায়গায় খবর পাঠিয়েছে, পুলিশের দুটো ভ্যানও এসেছে, শাহরিয়ার আর নিজের মোটরবাইকের বর্ণনা দিয়ে ঢাকার বিভিন্ন চেকপোস্টে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে সে। খুব সহজে ঢাকা ছাড়তে পারবে না শাহরিয়ার। এরকম ভুল করা তার মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষের শোভা পায় না। গুলির শব্দ পাওয়া মাত্র পড়িমড়ি করে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল তানভীর, কিন্তু মোটরবাইকের চাবিটা আনা হয়নি। শাহরিয়ার সেই সুযোগটা নিয়েছে। পালানোর জন্য মোটরবাইকের চেয়ে ভালো জিনিস আর হয় না।

তাহের আর আবু জামশেদের দেহ নিয়ে ঢাকা মেডিক্যালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সটা। তুষারকে আপাতত ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্তত আরো সাতদিন ঢাকা ছাড়তে নিষেধ করা হলো।

ভোরের মধ্যেই ধানমন্ডির বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া হলো তুষারকে। এরমধ্যে নিজেকে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, ক্রিস্টিনা এই ভোর বেলা গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তুষারকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। কিছু বলল না তুষার, রাতে যে ঘটনা ঘটে গেছে তা বাকি সবার না জানলেও চলবে। কিছু জিনিস নিজের মধ্যেই চাপা রাখতে হবে সারাজীবন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্রিস্টিনার হাত ধরে হাঁটতে থাকল তুষার। বাকি কয়দিন ঢাকায় থাকতে কোন আপত্তি নেই তার, এই কয়দিন থাকবে সে পুরো নির্ভার হয়ে, আর কেউ কোনদিন তাকে হুমকি দিতে আসবে না।

অধ্যায় ৬৫

হাঁটছিল শাহরিয়ার, ক্লান্ত পায়ে।

রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে এসেছে, এই শহর ছেড়ে আপাতত অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে।

চমৎকার একটা জীবনের আশা ছিল, সেই আশা আর কোনদিনই পূরন হবে না। ছোট থেকে বড় হতে হতে যে ঘৃনা, বিদ্বেষ আর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হয়েছিল, সেই প্রতিশোধ পর্ব শেষ।

হ্যা, তুষারকে সে মারে নি, মারতে পারেনি। তাহেরের মৃত্যুর সাথে সাথে নিজের মধ্য থাকা প্রতিশোধস্পৃহাটা হঠাৎ করেই যেন মরে গেল। আবু জামশেদকেও মারে নি, সাহসি একজন মানুষ, এই মানুষটার রক্ত দিয়ে নিজেকে কলংকিত করতে চায়নি। ভদ্রলোক হয়তো বেঁচে যাবেন। মোটরবাইকটা অনেক আগেই ফেলে এসেছে, মালিকের এটাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হবে না। নিজেকে সবধরনের বন্ধন থেকে একদম মুক্ত অনুভব করছে শাহরিয়ার।

হ্যা, কোন বন্ধনই তার নেই। বন্ধন ছিল একমাত্র ছোট ভাই, সেই পাগল ভাইটাও চোখের সামনে কেমন মরে গেল। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো নিজের অজান্তেই।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, তবে এই ভোর তার জীবনে নতুন কোন আলো নিয়ে আসছে না, তার যাত্রা শুরু হয়েছে অন্ধকারের দিকে, সে কেবলই একজন আঁধারের যাত্রী।